লাহোর
থেকে বুখারা
মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী

লাহোর থেকে বুখারা

মূল
মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মোজাদ্দেদী
মুহতামিম, দারুল উলূম জঙ্গ, পাকিস্তান

অনুবাদ
মাওলানা শাহ্ আবদুল হালীম হুসাইনী
শিক্ষক, জামেয়া মাদানিয়া, মিরপুর-১২, ঢাকা।

আল ইরফান পাবলিকেশন্স
১২/ধ, বাড়ী নং # ৮৯ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

লাহোর থেকে বুখারা

মূল ঃ মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মোজাদ্দেদী
মুহতামিম, দারুল উলূম জঙ্গ, পাকিস্তান

অনুবাদ ঃ মাওলানা শাহ্ আব্দুল হালীম হুসাইনী

প্রকাশকাল ঃ

মহররম ১৪২৯ হিঃ

জানুয়ারী ২০০৮ ইং

প্রকাশক

আল ইরফান পাবলিকেশন্স

১২/ধ, বাড়ী নং # ৮৯, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ঃ ০১৭১৬-৫৪৭৮৫৬

কম্পোজে

জাহান কম্পিউটার

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায়

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১২৫৪৮১

প্রচ্ছদ ঃ নাজমুল হায়দার; দি লাইট

মুদ্রণে

মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস

৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র।

Lahore Theke Bukhara : Written by Mawlana Julfiqer Ahmad, Naqshbandi translated by Shah Abdul Halim Hossainy, Published by Al-Irfan Publications, 12/Dha, House No # 89, Mirpur Dhaka-1216. Printed by M/S Tawakkal Press, 66/1 Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.

Price : 160.00 Taka Only

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী র.

এর পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক সাহিত্যিক

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ লিখিত

ভূমিকা

হৃদয়ের সফর

মধ্য এশিয়ায়

সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভুবন হচ্ছে ভ্রমণকাহিনী বা সফরনামা। ভ্রমণ মানেই অদেখা কিছু দৃশ্যকে, কিছু দেশকে, কিছু মানুষ, চরিত্র ও সংস্কৃতিকে নতুন চোখে দেখা। এ দেখায় যেমন অভ্যস্ততার জগত অতিক্রম করে যাওয়ার ব্যাপার থাকে তেমনি থাকে তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নানা স্বাদ। আর এসব ক্ষেত্রে ভ্রমণের স্থান বা ক্ষেত্রের বিশেষত্ব ভ্রমণকারী বা পর্যটকের দূরস্পর্শী আত্মা ও চোখের গভীরতা-দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। দীর্ঘকাল ধর্মবিমুখ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার করতলে থাকা এবং পরে স্বাধীন হয়ে যাওয়া কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম রাষ্ট্র হচ্ছে এ ভ্রমণের ক্ষেত্র, এ ভ্রমণকাহিনীর আঙ্গিক। ভ্রমণ করেছেন জাগতিক ও ইসলামী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত পাকিস্তানের বরেণ্য এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। এখানে ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবর্তন, পরিত্রাণ এবং দূরদৃষ্টির সঙ্গে অবলোকন ও বিশ্লেষণের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এ ভ্রমণকাহিনীটির এটি একটি বিশেষ আকর্ষক বৈশিষ্ট্য।

উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, গিরগিস্তান, তাতারিস্তান, রাশিয়া ও ইউক্রেনের বিভিন্ন জনপদে লেখক যা দেখেছেন, যা উপলব্ধি করেছেন সেসবের হৃদয়ছোঁয়া চিত্র সাফল্যের সঙ্গে তিনি এ ভ্রমণকাহিনীটিতে আঁকতে পেরেছেন। তাশখন্দ, বুখারা, সমরকন্দের মতো বহু ঐতিহাসিক নগর-শহরে-গ্রামে তাঁর যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, যে সবের সঙ্গে হাজার বছর ধরে ইসলামী উলূম, সংস্কৃতি ও জীবনাচারের যোগসূত্র ও বাস্তব সাক্ষ্য এখনো বলিষ্ঠভাবে বিদ্যমান। সেখানকার বহু ঐতিহাসিক মসজিদ, মাদরাসা, মাজারে উপস্থিতি এবং বিচিত্র মানুষ ও সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার এ সফরকে মূল্যবান করে তুলেছে। সেসব স্থান ও চরিত্রের ইতিহাসটানা আত্মস্পর্শী বর্ণনা এ ভ্রমণকাহিনীকে করেছে সমৃদ্ধ। পর্যটক ও লেখক হযরত মাওলানা পীর যুলফিকার আহমদ নশকবন্দী মুজাদ্দেদী মা. আ. কর্তৃক উর্দূ

ভাষায় রচিত 'লাহোর ছে তা খাকে বুখারা ও সমরকন্দ' নামক এ সমৃদ্ধ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন তরুণ আলেম লেখক শাহ্ আব্দুল হালীম হোসাইনী। বাংলা নাম 'লাহোর থেকে বুখারা'।

একজন তরুণ লেখকের যত্নশীল শ্রমের স্বাক্ষর অনূদিত গ্রন্থটিতে বিদ্যমান। গদ্যে কাঠিন্যের পরিবর্তে গল্প বলার ভঙ্গি জোরালো। অনুবাদকের এ প্রয়াস পাঠকের জন্য অনুকূল। ইতিহাসের চরিত্র, অপরিচিত স্থানের নাম এবং স্থানীয় পরিভাষার অনুবাদ উর্দূ থেকে করতে গেলে কোথাও কোথাও প্রচলিত উচ্চারণ ও বানানের সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটে যায়। এটি অবশ্য ধর্তব্য কোনো অস্বাভাবিকতা নয়। একজন তরুণ লেখকের প্রথম প্রয়াস হিসেবে উত্তীর্ণ এ অনুবাদকর্মের সঙ্গে পাঠকরা পরিচিত হতে পারলে নিকট ও দূর ইতিহাসের একটি অজানা ভূগোলের সন্ধান পেয়েই যাবেন–আশা করা যায়। সেখানে পাঠকের সঙ্গে থাকবে একটি অন্তদর্শী চোখ এবং আবেগমাখা হৃদয়। এমন দু'টি সঙ্গী নিয়ে এ দেশের যে কোনো প্রান্তে বসে একজন পাঠক খুব সহজেই মধ্য এশিয়ার মুসলিম ঐতিহ্যের পিঠস্থানগুলো ঘুরে আসতে পারেন। এ গ্রন্থটি নিয়ে আমরা আশা করতে পারি, এ ভ্রমণকাহিনীটির সাহায্যে পাঠক তার হৃদয়ের সফর শুরু করবেন।

শরীফ মুহাম্মদ

১০/০১/০৮ইং

প্রকাশকের কথা

২০০০ সাল। নিউইয়র্কের জামাইকাস্থ দারুল উলূম মাদরাসা লাইব্রেরীতে কিতাবরাশির ওপর চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ নজরে আসে 'লাহোর ছে তাখাকে বুখারা ওয়া সমরকন্দ' নামক বইখানি। উপরে লেখকের নাম লেখা আছে মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী। পড়া শুরু করি। চলে যাই মুহূর্তের মধ্যে রাশিয়ার মুসলিম ঐতিহ্যের চারণক্ষেত্র বুখারা, সমরকন্দ ও তাশখন্দে।

ভূমিকা পড়েই বুঝতে পারি লেখক তাঁর ৭৫ দিনের এ সফরনামায় সোভিয়েত রাশিয়ার স্বাধীন দেশগুলোর বিখ্যাত ইসলামী স্থানসমূহের একটি চমকপ্রদ চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ঐতিহাসিক স্থানসমূহের এমন হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন যেন পাঠক চোখের সামনেই ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযীসহ সকল মুসলিম মনীষীকে দেখছেন। ভ্রমণ করেছেন তাদের স্মৃতিধন্য স্থানসমূহে। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর এ গ্রন্থে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, মস্কো, ইউক্রেনসহ অন্যান্য বড় শহর ও প্রদেশের শিক্ষা-সভ্যতা ও শিল্প-সংস্কৃতির সরস বর্ণনা দিয়েছেন।

যা হোক, গ্রন্থখানি পড়ে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করি। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের অনেক তথ্য এবং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের উপর অত্যাচারের যে স্টীমরোলার বয়ে গেছে তা জানতে পারি। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও অবগত হই।

কয়েকদিনের মধ্যেই বইটি পড়ে ফেলি। গ্রন্থখানি যে ইসলাম প্রিয় উর্দূভাষী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা বুঝতে পারি তার ৫/৬ টা সংস্করণ বের হয়েছে দেখে। বাংলাভাষী মানুষের কাছে চমৎকার এ কিতাবখানির একটি সুপাঠ্য অনুবাদ তুলে দেওয়ার স্বপ্ন সেই সময় হতে দেখতে থাকি। ঢাকা এসে আবারও চলে যাই অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, সিডনী ও ব্রিজবেন শহরে। বইখানিও সবসময় সাথে থাকি। পড়তে থাকি। নিজে কিছু অনুবাদের চেষ্টাও করি।

একদিন লেখকের ভূমিকাটুকু মেলবোর্ন থেকে ফ্যাক্স করে মাদরাসায় পাঠিয়ে দেই, আর তা আমাদের শিক্ষাসচিব বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক মাওলানা লিয়াকত আলীকে অনুবাদ করে পত্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করি। আমার সফর চলাকালেই 'মুসলমানদের এখন জেগে ওঠা প্রয়োজন' শিরোনামে ২১-০৩-২০০১ এ অনুবাদটি ইনকিলাবের উপ-সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হলে পাঠকদের হৃদয়ে তা

রেখাপাত করে। বিদেশে ব্যস্ততার কারণে এবং দেশে এসেও বইখানি অনুবাদের কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় মনে করে একদিন আমার স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনীকে গ্রন্থখানি অনুবাদ করার অনুরোধ করি। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি কঠোর পরিশ্রম করে তিন চার মাসের মধ্যেই গ্রন্থখানি অনুবাদ করে পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে তুলে দেন। কিন্তু শত চেষ্টার পরেও বেশ কয়েক বছর ধরে বইখানি ছাপার মুখ দেখতে পারছিল না। কয়েকজন প্রকাশক বইখানি ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করে এগিয়ে আসলেও নানা কারণে বিলম্ব হতে থাকে। কয়েক বছর অপেক্ষা করার পর তাই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে 'আল-ইরফান পাবলিকেশন্স' থেকে গ্রন্থখানি ছেপে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করছি।

গ্রন্থের লেখক হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা হাক্কানী পীর ও লেখক। তিনি নব্বই দশকের সূচনাপর্বে মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যান মুফতী শহীদুল ইসলামের দাওয়াতে বাংলাদেশ সফরে এলে মাদরাসা দারুর রাশাদেও হাজির হয়েছিলেন এবং বয়ানও করেছিলেন। তাঁর বয়ানের প্রতিক্রিয়া আজও আমরা অনুভব করি। মাওলানা যুলফিকার সাহেব পাকিস্তানের নকশবন্দী সিলসিলার বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা খাজা গোলাম হাবীব সাহেবের বিখ্যাত খলীফা। এ পর্যন্ত তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি ইউরোপ আমেরিকাসহ সারা পৃথিবীতে দীনের দাওয়াত দিয়ে ফিরছেন। তাঁর সাথে অনেক চেষ্টার পরেও আর দেখা হয়নি। দু'আ করি আল্লাহ পাক লেখককে হায়াতে তাইয়্যিবা দান করুন। বেশি বেশি দীনের খেদমত করার তাওফীক নসীব করুন।

এ গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের মাদরাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান, বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক সাংবাদিক মাওলানা লিয়াকত আলী, মাসিক আর রাশাদের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা জহির উদ্দিন বাবর, মাওলানা ফয়জুল্লাহ, মাওলানা কামালুদ্দীন ফারুকী, বিশেষ করে সংস্কারমূলক গ্রন্থের প্রকাশক মুহাম্মদ ব্রাদার্স এর স্বত্বাধীকারী জনাব আব্দুর রউফ সাহেব যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা ভোলার নয়। তাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। দু'আ করি আল্লাহ পাক এ বই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং বইটিকে দেশবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে দিন। আমীন।

বিনীত

তারিখ ঃ ১৫/০১/২০০৮ইং

মুহাম্মদ সালমান

অনুবাদকের আরয

২০০৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। আসরের পর মাদরাসা দারুর রাশাদ মিরপুর, ঢাকা-এর হলরুমে ইসলাহী মজলিস চলছে। আলোচনা করছেন মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ সালমান দা.বা। দেখলাম মনোরম প্রচ্ছদে মোড়ানো একটি বই থেকে পাঠ করে শুনাচ্ছেন। আল্লাহর ইশক ও মারেফাতের বিভিন্ন উর্দূ, ফার্সী ও আরবী কবিতা খুব আবেগভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন। তিনি লেখক ও বইয়ের বেশ প্রশংসা করলেন।

বইটির নাম 'লাহোর ছে তা খাকে বুখারা ওয়া সমরকন্দ'। বইটি পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম হাফেজ মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নক্শবন্দী মুজাদ্দেদী দা. বা. এর একটি ভ্রমণ কাহিনী। তিনি ১৯৯২ইং সনে এক দাওয়াতী প্রোগ্রামে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়ায় সফর করেন। দীর্ঘ তিন মাসের সফরে তিনি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সফর করেন। সেখানে বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা, মাযার ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলো ঘুরে দেখেন। মিলিত হন সেখানকার উলামায়ে কেরামের সাথে। প্রত্যক্ষ করেন দাম্ভিক-অহংকারী শাসকদের পরিণতি।

বইটিতে উজবেকিস্তান, তাজকিস্তান, কাজাকিস্তান, তাতারিস্তান, বুখারা-সমরখন্দ ও তাশখন্দ ঘুরে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন সে সবের হৃদয়ছোঁয়া চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন।

বাদ মাগরিব হযরত মাওলানা সালমান সাহেব আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে বললেন, বইটি আমি আমেরিকার নিউইয়র্কের একটি লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করেছি। তুমি অনুবাদ করতে পারবে? আমি বইটি দেখে অনুবাদ করতে রাজী হলাম। বইটি নিয়ে সেদিন রাতেই পড়ে ফেলি। লেখকের সঙ্গে আমিও ইমাম বুখারী, তিরমিযী ও মারগেনানী রহ.-এর দেশে সারারাত ঘুরে বেড়ালাম। যেন মধ্য এশিয়ার নগরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে মুসলিম ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম।

আল্লাহর ওপর ভরসা করে অনুবাদ শুরু করি। প্রায় তিন মাসের মধ্যে

অনুবাদ শেষ হয়। সহজ সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বইটির বাংলা নাম দেয়া হয় 'লাহোর থেকে বুখারা'। অনুবাদের পর নানা কারণে পাঠকের হাতে বইটি তুলে দিতে দেরী হয়। আল ইরফান পাবলিকেশন্সের সত্ত্বাধিকারী মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাক তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। বইটির ওপর চমৎকার একটি ভূমিকা লিখে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করেছেন সুসাহিত্যিক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ। প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ ও জহির উদ্দিন বাবর এর কাছে আমি ঋণী। আক্ষরিক কোন স্তুতি বাক্য লিখে তাদের ছোট করতে চাই না। দু'আ করি আল্লাহ্ যেন তাদের বদলা প্রতিদান দিবসেই দেন।

সুপ্রিয় পাঠকের কাছে আমার অনুরোধ, অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি কোন অসঙ্গতি, তথ্য বিভ্রাট কিংবা পরিভাষাগত ভুল প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাকে অবহিত করবেন। আমার পক্ষ থেকে স্বকৃতজ্ঞ নয়নে সেসব ভুল শুধরে নেয়ার প্রতিশ্রুতি রইল।

বইটি পাঠ করে যদি কারো মনে ইসলাম ও ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সামান্য হলেও বৃদ্ধি পায় তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ পাক এ বইয়ের মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহ্যের বিবরণ জেনে আমাদের সবার প্রাণে নতুন ইতিহাস সৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়ে দিন। আমীন।

১২-১০-২০০৮ শাহ্ আব্দুল হালীম হুসাইনী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

সফরের প্রেক্ষাপট

১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারীর ঘটনা। করাচীর বাহাদুরাবাদের উসমানিয়া জামে মসজিদে জুমআর নামাযের খুতবার পূর্বে আলোচনায় মুসলিম উম্মাহর সংকট, বর্তমান অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার অবস্থা স্মরণ হয়ে যায়। সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললাম–

আজ তাগুতী শক্তি মুসলিম উম্মাহকে দস্তরখানে পড়ে থাকা খাদ্যের মতো গ্রাস করা সহজ ভাবছে। তাদের হাতে তারকা কর্মসূচী আর আমাদের হাতে শুধু প্রস্তাবাবলী। তারা উম্মাহকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র আঁটছে, পেট্রিয়ট, মিসাইল ও পারমানবিক অস্ত্রের হুংকার ছাড়ছে। পক্ষান্তরে আমরা শুধু মীমাংসা ও শান্তিচুক্তির বুলি আওড়াচ্ছি, তাদের তোষামোদ ও চাটুকারিতায় ব্যস্ত। চিন্তার বিষয় আমরা কীভাবে চরম লাঞ্ছনা, বেইজ্জতির গ্লানি পোহাচ্ছি। আমাদের দীনী চেতনা ও মূল্যবোধ কোথায়? আমরা কি মুসলিম মায়ের দুধ পান করিনি? আমরা খরগোশের ন্যায় অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর! আজ আমাদের বিবেককে প্রশ্ন করতে হবে। আত্মপরিচয় জানতে হবে। অনুধাবন করতে হবে কুফরী শক্তি কিভাবে দাঁত কড়মড় করছে।

প্রিয় সুধীমণ্ডলী! সময় আমাদের দ্বারে করাঘাত করছে। চিৎকার করে আহবান করছে– হে মুসলমান! জাগো, জাগো.....। যে আজ নিজে জাগবে না কুফরী শক্তি তাকে পদদলিত করে নিষ্পেষিত করে দিবে। শত্রুর পা আমাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের খুনকে পানির ন্যায় প্রবাহিত করে চেঙ্গিস খানের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেবে।

দুশমনদের বিমানগুলো আমাদের আকাশে উড়তে ও মহড়া দিতে থাকবে। তোপের ঘন ঘন ধ্বনি আর গর্জন আমাদের চিন্তাশক্তি অকেজো করে দিবে। আমাদের লাশগুলো ট্যাংকের নিচে ফেলে পেষা হবে। নারীদের মাথা থেকে ওড়না ছিনিয়ে নেয়া হবে। পিতামাতার সামনে কন্যার ইজ্জত লুণ্ঠন করা হবে। জীবিতদের গলায় লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার বেড়ি পড়িয়ে দেয়া হবে। পায়ে পরিয়ে দেয়া হবে লাঞ্ছনার জিঞ্জির।

আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! আমাদের কোমর পানিতে ডুবে মরতে হবে। যমীনের উপরে বসবাস না করে যমীনের নিচে বসবাস করতে হবে।

অতএব সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে অযথা কালক্ষেপন না করে ইসলামের পুনরুত্থান ও বিজয়ের জন্য নিজের জান মালের বাজি রাখতে হবে।

প্রিয় সুধীমণ্ডলী! আজ দুনিয়া দ্রুতবেগে তার অবস্থা পরিবর্তন করছে। একদিকে প্রাচ্যের জাপান, কোরিয়া থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সকল রাষ্ট্র পরস্পরে নিজেদের বাণিজ্যনীতি বজায় রাখছে এবং বৃহৎ প্রাচ্যের স্বপ্ন দেখছে। অপর দিকে পাশ্চাত্যের প্রতিটি রাষ্ট্র পরস্পর এমন সম্পর্ক বজায় রাখছে যার ফলে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র একই শহরের কয়েকটি মহল্লায় পরিণত হয়েছে।

ইউরো ডলার (EURO DOLLAR) এক জাতীয় মুদ্রা চালু করে তারা বৃহৎ পাশ্চাত্যের স্বপ্ন দেখছে।

হে মুসলমান! উঠো! কোমর বাঁধ। দেখ আল্লাহ্ কী সাহায্য করেন। উঠো! দাঁড়াও! কিসের ভয়! ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে গোটা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করে জানিয়ে দাও। (NEITHER EAST, NOR WEST, ISLAM IS THE BEST) নয় প্রাচ্য, নয় পাশ্চাত্য, ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রিয় সুধীমণ্ডলী! এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করেন তখন চড়ুই পাখি দ্বারা বাজপাখিকে খতম করেন, অল্প সংখ্যককে অধিক সংখ্যক এর উপর, দুর্বলকে সবলের উপর বিজয় দেন। আমরা যদি কুরআনকে বুকে ধারণ করে সামনে অগ্রসর হই তাহলে সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে, ইনশাল্লাহ।

قوت عشق سے ہر پست کوبالاکردے
دہرمیں اسم محمدسے اجالاکردے

এশকের শক্তি দিয়ে জাতির পতন ঠেকাও,
যুগ মুহাম্মদ সা. এর নামে আলোকিত করে দাও।

অতীতে রাশিয়াকে পৃথিবীর সুপার পাওয়ার বলা হতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রকৃত পরাশক্তি সুপার পাওয়ার রাশিয়াকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

আজ তাকিয়ে দেখুন, রাশিয়া সুপার পাওয়ার-এর পরিবর্তে জিরো পাওয়ারে পরিণত হয়েছে। একটি কাঁচের পাত্র ভেঙ্গে গেলে আওয়াজ হয়। অথচ এত বড় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল একটু আওয়াজও হয়নি। বিশ্বাস করুন, গোটা দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হয়ে রাশিয়াকে এতটুকু করতে সক্ষম হত না, যতটুকু সে নিজের হাতে হয়েছে। এর প্রমাণ কি আমরা নিজ চোখে দেখিনি? হতে পারে, মধ্য এশিয়ার নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মুসলমানরা ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিজয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমাদের উচিত একই সারিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

প্রিয় সুধীমণ্ডলী! আমরা মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, তাহলে তাগুতী শক্তির মাঝে এক বিরাট আতংকের সৃষ্টি হবে। তারা বুঝে নেবে মুসলমানরা তো শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। এদের দমানো সম্ভব নয়।”

জুমআর নামাযের পর মুহতারাম সাঈদুযযফর সাহেব আমাকে বললেন, হযরত! আপনি মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো সফর করুন, যেন মুসলমানদের মাঝে পরস্পরে দূরত্ব কমে আসে। আপনার সফর করা এখন সময়ের দাবী।

আমি সফর করতে রাজি হয়ে ইনশাল্লাহ বললাম। মুহতারাম আবদুশ শুকুর দাদা সাহেব বললেন, "আমার এক বন্ধু দীর্ঘদিন যাবত রাশিয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, আমি তার মাধ্যমে ভিসার ব্যবস্থা করে দেব। আমি বললাম, 'খুব ভাল কথা' আমি পাসপোর্ট তার হাতে দিয়ে বাসায় ফিরে আসি। ভিসার অপেক্ষায় কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। দীর্ঘ এক মাস অপেক্ষার পর জানতে পারলাম ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছে। এর পনের দিন পর যোগাযোগ করে জানতে পারলাম সমস্যা এখনও কাটেনি। আমি চিন্তিত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে সেজদায় অবনত হয়ে দু'আ করতে লাগলাম। সেই মুহূর্তে প্রিয় বন্ধু জনাব মুনির আহমদ সাহেবের নিম্নের চিঠি আমার হস্তগত হয়।

চিঠি

বখেদমতে শ্রদ্ধেয় পীর ও মুর্শিদ (দাঃবাঃ)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় ভাল ও সুস্থ আছেন। কামনাও করি তাই। পর সমাচার এই যে, সর্বপ্রথম আমার অলসতা ও ত্রুটির জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। চিঠি লিখে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাইনি। তবুও দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয়েছে বিধায় চিঠি লিখতে হয়েছে।

১০ মে রমযানুল মোবারক আমি তাহাজ্জুদের নামাযের পর মুরাকাবা করতে ছিলাম, অনুভব হচ্ছিল আপনি আমাকে মুরাকাবা করাচ্ছেন। কামরায় কেউ ছিল না। অদৃশ্য থেকে এক আওয়াজ আসল। কে যেন আমাকে বলছে, 'সে কে? আমি বললাম, তিনি আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমদ। আওয়াজ আসল, তাকে রাসূল সা. এর এই পয়গাম শুনিয়ে দাও–'৭৫ দিনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন চলে যাও'। জনাব অনুগ্রহ করে দিক নির্দেশনা প্রদান করুন এবং উত্তর লিখে কৃতজ্ঞ করুন। শোকরিয়া–

ইতি
আপনার মুরিদ
মুনির আহমদ

আমি এই চিঠি পাঠ করে বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, সে তো আমার সফরের কথা কখনও জানেনি, তাহলে সে এই সফরের কথা কিভাবে লিখে দিল। বুঝতে পারলাম, যখন আল্লাহ তাআলা কাজ নিতে চান তাহলে ল্যাংড়া মশা ও দুর্বল মাকড়সা দ্বারাও কাজ নেন। অসম্ভবের কিছু নয়, তিনি এভাবে আমার কম আমল ও স্বল্প-পূজি দ্বারা দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ নিচ্ছেন।

পরের দিন জানতে পারলাম, আমার পাসপোর্টে উজবেকিস্তানের ভিসা হয়ে গেছে। অতঃপর আমি আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলাম। তিনি বললেন, অনেক পূর্বে সিলসিলায়ে আলীয়া নকশেবন্দিয়ার নিসবাত শরীফ মধ্য এশিয়া থেকে হিন্দুস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। মনে হচ্ছে এখন সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকেই নির্বাচন করেছেন। সুতরাং এই বরকতময় কাজে বিলম্ব করার অবকাশ নেই। তার কথায় আমার সাহস সঞ্চার হল। দিলের প্রশান্তি অর্জনের জন্য আমার উস্তাদ শায়খ ওয়াজীহউদ্দীন দা. বা. এর নিকট এই অবস্থা জানানোর জন্য গেলাম। যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে উপস্থিত হয়ে শায়খের নিকট ঘটনার বৃত্তান্ত আলোচনা করলাম, তখন তিনি চিঠি পড়ে বললেন, "ভাই! এ তো বিরাট সুসংবাদ। আপনি দ্রুত চলে যান।"

মজলিসে উপস্থিত একজন বলল "শায়খ! তিনি তো ঋণ পরিশোধ করতে যাচ্ছেন।" হযরত শায়খ দা. বা. বললেন, 'মধ্য এশিয়া থেকে নকশেবন্দিয়া সিলাসিলা আমাদের অর্জিত হয়েছে। অতঃপর ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহ. এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু সবক সংযোজন করেছেন। তিনি তো মুজাদ্দেদী সবকের নিয়ামত নিয়ে সেখানে যাচ্ছেন। একথা শুনে আমার অন্তরে খুশী ও আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل

نسیم صبح تیری مہربانی

আমি অধম কী করে ফুলের সৌরভ পাই?

হে ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু! তোমারই অনুকম্পা।

অতঃপর আমি অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম।

جسی کے ناموں کی نہیں ہے انتہاء

ابتِدا کرتا ہوں اس کے نام سے

যার নামসমূহের অন্ত নেই
সফর শুরু করছি তার নামেই।

প্রথম অধ্যায়

উজবেকিস্তান সফর

আমি মধ্য এশিয়ার সফর ২২ এপ্রিল ১৯৯২ ইং বুধবার লাহোর থেকে শুরু করি। বড়দের থেকে শুনেছি, বুধবার যে কাজ শুরু করা হয় তা বরকতময় হয়। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তো এ সংক্রান্ত হাদীসও বর্ণনা করে থাকেন।

সম্ভবত এ কারণেই পাকিস্তানের মাদরাসাগুলোতে বুধবারে তা'লীম শুরু করা হয়।

লাহোর থেকে করাচীর ফ্লাইট সাধারণত আরামদায়ক হয়। আমি করাচীর ওসমানী জামে মসজিদে জুমআর খুতবা দেই। আমার সফরের কথা যারা অবগত হলেন তারা সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং খুব দু'আ করলেন। কয়েক সপ্তাহ পর এয়ারপোর্ট গিয়ে জানতে পারলাম যে, ফ্লাইট উজবেকিস্তান থেকে আসেইনি। সুতরাং যাওয়ার তো প্রশ্নেই আসে না।

এরপর অফিসে যোগাযোগ করে জানা গেল, আগামী ফ্লাইট ইসলামাবাদ থেকে তাশখন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। অতএব যারা তাশখন্দ যাবে তারা যেন ইসলামাবাদ চলে যায়। আমি PIA ফ্লাইট দ্বারা ইসলামাবাদ পৌঁছে গেলাম এবং প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করলাম। সোমবার সফরের জন্য তৈরি হয়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছলাম। মালামাল চেক করানোর পর বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ করে ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে লাউঞ্জে ঢুকলাম। প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষার পর যখন ফ্লাইট যাওয়ার কোন ঘোষণা হল না, তখন কিছুটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। তখনই ঘোষণা হল যে, আফগানিস্তানে দুটি বিদ্রোহী গ্রুপের মাঝে তুমুল লড়াই চলছে বিধায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ফ্লাইট যাবে না। কিছু যাত্রী PIA -এর অধীনে এক হোটেলে অবস্থান করার জন্য চলে গেল, কেউবা রাগ-গোস্বায় চেচাঁমেচি শুরু করে দিল। কিছু লোক দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছিল এবং কেউ সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

রুশ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

ইতোমধ্যে এক সুদর্শন যুবক আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল "আপনি কি তাবানী গ্রুপের কাউকে চেনেন?"

আমি ইয়াকুব তাবানী সাহেবের নাম বলতেই তিনি বুকের সাথে মিশে বলতে লাগলেন, আমি তাবানী গ্রুপের তাশখন্দস্থ অফিসে ম্যানেজার হিসেবে চাকুরী করি। আমাকে আব্বাস খান নামে ডাকা হয়। আপনার ব্যাপারে আমি সব কিছু অবগত আছি।

আসুন! মধ্য এশিয়া থেকে আগত কয়েকজন মেহমানের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিব। সাথে সাথে পাশেই দাঁড়ানো কয়েকজনের সাথে পরিচয় করালেন, যাদের মধ্যে উজবেকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হাবীবুল্লাহ এবং পর্যটনমন্ত্রী আনোয়ার সাঈদ ছিলেন। আমি আমার জাগতিক শিক্ষা এবং দীনী খেদমত সম্পর্কে জানালে জামাল কামাল সাহেব আমাকে 'ইনসানে কামেল' (পূর্ণ মানব) এবং "আদমে কামেল" উপাধিতে ভূষিত করলেন। হাবীবুল্লাহ সাহেব 'যুলফিকার জিন্দাবাদ' বলে তার মনের আনন্দ প্রকাশ করলেন। আব্বাস খান হোটেলে অবস্থান না করে তাবানী গ্রুপের মেহমানখানায় অবস্থান করার জন্য প্রস্তাব করলেন, এখানে পানাহার এবং অবস্থান করা অধিক আরামদায়ক ও সহজতর হবে। উপরন্তু শোরগোল থেকে মুক্ত থাকা যাবে। সকলেই মুচকি হেসে তার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তখনই আমরা ইসলামাবাদের মনোরম এক এলাকার একটি সুন্দর মেহমানখানায় পৌঁছে গেলাম। মেহমানদের থেকে মধ্য এশিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

মধ্য এশিয়ার সীমান্ত পূর্বে রুশ সাইবেরিয়া বালুকাময় প্রান্তর স্পর্শ করেছে এবং দক্ষিণে আফগানিস্তান ও ইরানের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এই প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল এক দিকে চীন সীমান্তের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং অপরদিকে কাস্পিয়ানের তীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার মাঝে "দরিয়ায়ে জিহু" প্রবাহিত। তাই পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা এটাকে 'দারিয়া পাড়' অর্থাৎ আরবী ভাষায় মা ওয়ারাউন্নাহার বলে থাকে।

এই অঞ্চল সাইর, কারা, যারাফশা, আমুদরিয়ার সবুজ-শ্যামল এবং উর্বর জমির অন্তর্ভূক্ত। যার গর্ভে সোনা, রূপা, ইউরিনিয়াম, গ্যাস, এবং তেলের খনিতে ভরপুর। এ ভূমিতে তুলা উৎপন্ন হয় এবং সড়কের দু'পাশের গাছগুলো ফলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এর এক প্রান্তে 'পামীর'এর বরফ আচ্ছাদিত পাহাড়, অপর প্রান্তে তুর্কিমিনিস্তানের প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ বালুময় প্রান্তর। অতীতে মধ্য এশিয়ার এই ঊর্বর ভূমিতে যেহেতু শাহেরাহে রেশম অতিক্রম করত সেহেতু এ অঞ্চল শক্তিশালী সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। সে কারণেই এই এলাকাটি তৎকালীন উচ্চভিলাষী ও সম্প্রসারণবাদীদের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনশত খৃষ্টপূর্বে এই ভূমি আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর অধীনে ছিল। অতঃপর ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে আরবদের এখানে ইসলামের বসন্ত আসে। তের শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়া থেকে চেঙ্গিস খানের অমানবিকতা ও রক্তের হোলি খেলার ঝড় উঠে। তখন সে এ অঞ্চলের জীবন-সভ্যতা নস্যাৎ করে দেয়।

অবশেষে তৈমুর লং ও জহিরুদ্দীন বাবর উপমহাদেশের ইতিহাস ও কৃষ্টি কালচারে নতুনত্ব দান করেন। নিয়তির অমোঘ রীতিতে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ধর্মীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির এই স্থানে পুনরায় রুশ সম্রাটের আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে কাফেরের হস্তগত হয়ে যায়। এরপর ৭০ বছর পর্যন্ত লাল বিপ্লব অব্যাহত থাকে।

আল্লাহ তাআলা ১৯৯১ ইং এ অঞ্চলের লোকদের স্বাধীনতার নিয়ামত দান করেন। কমিউনিজমের সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়।

আমার জন্য এ আলোচনা শুধু চিত্তাকর্ষকই নয়, বরং এতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহনের উপকরণ বিদ্যমান ছিল। জাতির উত্থান-পতনের উপাখ্যান বন্ধ হয়ে যাওয়া কান ও চোখ খোলার এক বিরাট মাধ্যম। দুপুর ও রাতের খাবারের সময় যখন সবাই একত্রে বসি তখন সুস্বাদু খাবারের পরিবর্তে মধ্য এশিয়ার অবস্থা ও ঘটনাবলীর মধ্যেই বেশী স্বাদ অনুভব হচ্ছিল। গভীর রাত পর্যন্ত এই আলোচনা চলছিল।

পরের দিন সকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে, আজ ফ্লাইট যাবে না। মধ্য এশিয়ার লোকজন এ সংবাদ শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তাদের অনেকেরই সরকারী অফিসে উপস্থিত হওয়ার কথা, তখন তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তাদের পায়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য শিকল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাবীবুল্লাহ খান প্রস্তাব দিল যে, আমরা করাচী থেকে মস্কো চলে যাই। তারপর সেখান থেকে তাশখন্দ ফিরে আসব। এই প্রস্তাব সবাই খুব পছন্দ করল। তারা আমার অভিমত জানতে চাইল, আমি বললাম, আপনারা যান, উত্তম প্রস্তাব। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি যাবেন না? আমি বললাম, আমার কাছে মস্কোর ভিসা নেই।

উজবেকিস্তানের হাইকমিশনার 'তাশ মির্যা' মুচকি হেসে বলল, পাসপোর্ট নিয়ে আসুন, এখনই আপনার ভিসা লাগিয়ে দিচ্ছি। আব্বাস খান তার ড্রাইভারকে ডেকে আমার পাসপোর্ট দিয়ে হাই কমিশনারের পয়গামসহ ভিসা কাউন্সিলারের কাছে পাঠিয়ে দিল, এখনই এর উপর ভিসা লাগিয়ে দাও। কেননা তিনি হাই কমিশনারের সাথে সফর করবেন। ড্রাইভার ফিরে এসে সবার সামনে বলতে লাগল যে, কাউন্সিল পাসপোর্ট দেখে হতভম্ব হয়ে বলল, এই লোক না কোন দেশের প্রেসিডেন্ট, না কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী অথচ আমাকে ছুটির দিন ডাকা হয়েছে ভিসা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য।

আমি পাসপোর্ট খুলে দেখি এর মধ্যে তিন মাসের ভিসা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এবং রাশিয়ার অন্যান্য অংশেও সফর করার অনুমতি ছিল। আমি আলহামদুলিল্লাহ বলে প্রশান্তির শ্বাস নিলাম যে, স্বপ্নে দেখা বিষয়টি

পুরো হতে যাচ্ছে “৭৫ দিনের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে চলে যাও” (PIA) –এর ফ্লাইটের দেরী হওয়াটা আমার জন্য বিরাট রহমত ও অনুগ্রহ হয়ে গেল। আমি শোকরিয়া হিসাবে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করি। সাধারণত রাশিয়ার তিন মাসের ভিসা সংগ্রহ করা যতটুকু দুঃসাধ্য ছিল আল্লাহ তাআলা আমার জন্য ততটুকু সহজ করে দিলেন।

প্রথম যাত্রা

১৯৯২ ইং ২মে শনিবার। আমি ইসলামাবাদ থেকে করাচী রওয়ানা হই। মধ্য এশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমিও (VIP) ক্লাসে সফর করি। আমি রাতে হোটেলে অবস্থান করার চেয়ে শায়খ মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের ঘরে অবস্থান করাকেই ভাল মনে করি। জামাতের বন্ধুরা একত্রিত হল। রাতের অধিক সময় মাশায়েখে নকশবন্দীয়ার অবস্থা ও ঘটনাবলী শুনিয়ে কেটে গেল। আল্লাহ তাআলার নামের মাঝে এত স্বাধ ও মিষ্টতা রয়েছে যে, তার নামের যিকিরকারীদের অবস্থা আলোচনা করলেও স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব হয় এবং অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়। হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রহ) কে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহওয়ালাদের আলোচনা করলে অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়– এর কোন কুরআনী দলীল আছে কি? তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

(আর আমি রাসুলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করেছি।) (হূদ-১২০)

১৯৯২ ইং ৩ মে ভোর সকালে করাচী বিমানবন্দরে পৌছে যাই। উজবেকিস্তান এয়ারলাইনের ফ্লাইট তাশখন্দ থেকে করাচী পৌছেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হই।

এই ফ্লাইট যাত্রীদের করাচী থেকে তাশখন্দ নিয়ে যাবে। যখন কাউন্টারে পৌছলাম তখন সেখানে (VIRGIN FLIGHT) প্রথম উড্ডয়নের বেইজ লাগানো হলো। শায়খে ইরানী এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا

(আমি জান্নাতী রমনীদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাদেরকে করেছি চির কুমারী।) (ওয়াকেয়াহ ৩৫-৩৬)

এবং বললেন “আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার প্রিয় বান্দাদের কুমারী রমনী দান করবেন। আপনার তো দুনিয়াতে করাচী থেকে তাশখন্দের যাত্রা প্রথম নসীব হল। আলহামদুলিল্লাহ! পাকিস্তানের পক্ষ থেকে দীনী উদ্দেশ্যে সফরকারী সর্বপ্রথম পাকিস্তানী হওয়ার মর্যাদা আপনার অর্জন হল। পুরো যাত্রাকালীন সময়ে দীনী

বেশভূষার দ্বিতীয় কোন যাত্রী দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমাদের বিমানে অর্ধেকের চেয়ে বেশী আসন শূন্য ছিল।

বিমান আকাশে উড়ার আধ ঘন্টা যেতেই এক পাকিস্তানী আমার পাশের সিটে বসে এভাবে কথা বলতে শুরু করল। 'কয়েক বছর পূর্বে আমি রাশিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য এসেছিলাম। যখন ডারউইনের থিওরী পড়লাম তখন সত্য উদঘাটিত হল যে, এই মতবাদের কোন বাস্তবতা নেই। মানুষ নিজেদের চিন্তা ও মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছে। অথচ উলামায়ে কেরাম শুধু দীনী কিতাবাদি অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত, দুনিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে। মাওলানা! আপনি সায়েন্স (বিজ্ঞান) অধ্যয়ন করুন। তাহলে আপনার সামনে তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি মধ্য এশিয়াতে কী জন্য যাচ্ছেন? আমি বললাম, 'আমাদের মুসলমান ভাইদের সাথে মোলাকাত করার জন্য যাচ্ছি'।

সে বলতে লাগল যে, ওরা তো সায়েন্স (বিজ্ঞান) সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখে। আর আপনিতো সায়েন্সের (বিজ্ঞানের) আলিফ, বাও জানেন না, আপনি তাদের সাথে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন কী করবেন? তখন আমি সায়েন্স (বিজ্ঞান) বিষয়ক কিছু বিষয় নিয়ে তার সাথে আলোচনা করলাম, আলোচনা শুনে সে অবাক হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, আমার জানাই ছিল না যে, আপনার মত লোক সায়েন্স (বিজ্ঞান) সম্পর্কে অবগত আছেন, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার একটি প্রশ্ন, দয়া করে উত্তর দিবেন কি? প্রশ্ন হল, যে ব্যক্তি না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করে, সে কীভাবে সওয়াব পাবে? আমি বললাম, হাদীস শরীফে রয়েছে কুরআন বুঝে পাঠ করলে বা না বুঝে পাঠ করলে উভয় অবস্থায় সওয়াব পাওয়া যায়। সে বলল, না বুঝে পাঠ করলে সওয়াব পাওয়া যায়, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। শক্তিশালী কোন প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন। আমি বললাম, বলুন তো কেউ যদি কাফ, হা, ইয়া, আইন, সোয়াদ, (كٓهٰيٰعٓصٓ) পাঠ করে তাহলে সে সওয়াব পাবে কি না?

সে বলল, হ্যাঁ পাবে। যেহেতু এগুলো কুরআনের শব্দ। আমি বললাম, এর অর্থ কি? সে বলল, এতো হরফে মোকাত্তায়াত, এর অর্থ বলা হয়নি'। আমি বললাম, এই শব্দ না বুঝে পাঠ করলে যদি সওয়াব পাওয়া যায় তাহলে অন্যান্য শব্দ পাঠ করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না কেন?

পুনরায় সে বলল, বলুন তো নামায আরবী ভাষায় পড়ার কী প্রয়োজন আছে? স্বীয় মাতৃভাষায় পড়লে কেন সহীহ হবে না?

আমি বললাম, প্রত্যেক আমলেরই পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে। যেমন– দু'আ করা সুন্নত। যার যার মাতৃভাষায় দু'আ করার অনুমোদন রয়েছে। পক্ষান্তরে নামায ফরয, রাসূল সা. যেভাবে যে ভাষায় নামায আদায় করেছেন ঠিক সেভাবেই আদায় করাকে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদি যার যার মাতৃভাষায় নামায পড়ার অনুমোদন দেয়া হত তাহলে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বর্তমান নামাযের অবস্থা সম্পূর্ণ উলট পালট হয়ে যেত। উম্মত নামায আদায় করার পরিবর্তে তবলা, বাজনা, বাঁশি ইত্যাদি বাজাত। ইবাদতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পুরোটাই পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে যেত। সে বলতে লাগল, মাওলানা! আমার দৃষ্টিতে আপনি বড় জ্ঞানী ও মেধাবী। আমি বললাম, আমার দৃষ্টিতে আপনি সবচেয়ে বড় বেওকুফ। আপনার মা আপনাকে জন্ম দেয়নি। আমার তাওয়াজ্জুহ এবং এ ধরনের কথা তার অন্তরে বিরাট রেখাপাত করল। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং বলতে লাগল, আমি তওবা করে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করব। তার কথা শুনে আমি আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

(এবং আমরা হেদায়েত পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত নসীব না করতেন।)

একটু পরেই ঘোষণা হল যে, আমরা তাশখন্দ বিমানবন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি। আমি সাথে সাথে আল্লাহর যিকির শুরু করে দিলাম।

আল্লাহর এক ওলীর নসিহত

হযরত সাইয়েদ যাওয়ার হুসাইন রহ. বলতেন,বিমানের দুর্ঘটনা সাধারণত উঠা নামার সময় হয়ে থাকে। সুতরাং উপরে উঠার সময় এবং নিচে নামার সময় যাত্রীর উচিৎ কালিমা তাইয়্যিবার যিকির করা। কারণ কার জানা আছে যে, হতে পারে এটাই তার জীবনের শেষ যাত্রা। যখন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন কালেমা পড়ার সুযোগ হয় না।

তাই তখন কয়েক মিনিট আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার দ্বারা প্রথমতঃ আল্লাহর যিকিরের সওয়াব অর্জন হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে হাদীস মোতাবেক ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য অর্জন হয়ে যায়।

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه فَدَخَلَ الْجَنَّةَ

(যার শেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।)

সিয়াহত হোটেলে অবস্থান

তাশখন্দ বিমানবন্দর থেকে বের হতেই ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি আব্বাস খানের সঙ্গে তাশখন্দের সিয়াহত হোটেলে

পৌঁছলাম। জনাব আনোয়ার সাঈদের নির্দেশে হোটেল ম্যানেজার আমার জন্য একটি খাস কামরা বরাদ্দ করে দিল। যার মধ্যে ড্রইং রুমও ছিল। রাতের খাবার তাবানী গ্রুপের স্টাফ তৈরি করেছিল। আব্বাস খানের এক বন্ধু দাদা খান নূরীর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক ও কবি এবং উর্দূ ভাষায় ভাল করেই কথা বলতে পারতেন। তিনি তার ঘর থেকে পোলাও রান্না করে নিয়ে আসেন। কিছু কথাবার্তা বলার পর দাদা খান নূরী বলতে লাগলেন, আপনি এখানকার মুফতিয়ে আযমের সাথে মোলাকাত করবেন কি? আমি হ্যাঁ বলে মাথা নাড়ালাম। তিনি বললেন, আমি সকালে আপনাকে হোটেল থেকে নিয়ে যাব। আমি খাবার খাওয়ার পর এশার নামায আদায় করে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলাম 'হে আল্লাহ এখানে আমি একা। আমার কোন বন্ধু ও সফরসঙ্গী নেই। তবে আপনি কুরআন মজীদে বলেছেন (وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ) (তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন।)

আপনি যেহেতু আমার সাথে আছেন সুতরাং আমাকে নফস ও শয়তানের অনুগামী বানাবেন না এবং পদে পদে আমাকে সাহায্য করুন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে মশা ও মাকড়সা থেকেও কাজ নেন। যেমন আমার মত ইলম, আমল ও পূজিবিহীন ব্যক্তি থেকে সিলসিলায়ে আলীয়ার প্রচার-প্রসারের কাজ নিচ্ছেন। আপনি যা ইচ্ছা করেন, তাই সংঘটিত হয়। আপনার কাছে যোগ্যতা নয় বরং গ্রহণযোগ্যতার মোয়ামালা।

অনেকটা সময় এভাবে দু'আ করছিলাম। ফলে অন্তরে প্রশান্তি আসল যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবশ্যই আমাকে সাহায্য করা হবে।

আমি মাসনূন দু'আ পড়া অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাই।

মুফতিয়ে আযমের সাথে মোলাকাত

১৯৯২ইং ৪মে, সকাল দশটায় দাদা খান নূরীর সঙ্গে তাবানী গ্রুপের হেড অফিসে চলে যাই। অফিস থেকে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর একটি বড় মানচিত্র সংগ্রহ করি। যে এলাকায় যাব সেখানকার মানুষকে যেন অদৃশ্যভাবে তাওয়াজ্জুহ দেয়া সহজ হয়। দাদা খান নূরী জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? আপনি দীর্ঘ সময় মানচিত্রের দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছেন কেন? আপনাকে কোন সাহায্য করতে হবে? আমি বললাম, 'শোকরিয়া! আমাকে মুফতিয়ে আযমের সাথে মোলাকাত করিয়ে দিন। দাদা খান নূরী বললেন, মুফতিয়ে আযমের সম্মান একজন মন্ত্রীর সমপর্যায়ের। তিনি তার মন্ত্রণালয়ে বসেন। তার সাথে মোলাকাত করা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে ইদানিং আমি তার একটি কিতাব দেখে দিচ্ছি বিধায় আমি যখনই যাব তখনই মোলাকাত করা যাবে। আমি বললাম, ঠিক এমনিভাবে কিয়ামতের দিন গোনাহগাররা নেককারদের সাথে মহব্বত রাখার ফলে দ্রুত আল্লাহর সাথে

মোলাকাত করার সুযোগ পাবে এবং ক্ষমাও পাবে। দাদা খান নূরী হেসে বললেন, আপনার প্রতিটি কথায় "দীনী" আলোচনা চলে আসে। আমি বললাম, কোন এক ব্যক্তি এক ক্ষুধার্ত লোককে জিজ্ঞেস করল, দুই-দুই কত হয়? ক্ষুধার্ত লোকটি বলল, 'দুই-দুই চার রুটি হয়'। এমনিভাবে আমি পরকালের সফলতার আশা করি বিধায় আমার প্রতিটি কথায় পরকালের আলোচনা এসে যায়। দাদা খান নূরী একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন।

রাস্তায় এসে তিনি বললেন, লোকজন পাকিস্তানে আপনাকে কী বলে সম্বোধন করে? আমি বললাম, অধিকাংশ লোক 'হযরত' শব্দ ব্যবহার করে। তিনি বললেন হযরত! আপনি অনুমতি দিলে হালিমা খানকে সাথে নিয়ে আসি। আমি বললাম, সে কে? তিনি বললেন, নূরজাহান যেমন পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শিল্পী, ছোট বড় সবাই তাকে চিনে, অনুরূপ উজবেকিস্তানের টিভির জনপ্রিয় শিল্পী হালীমা খান। এখানকার প্রতিটি বাচ্চাই তার ভক্ত। সে মুফতিয়ে আযমের হজ্জ সংক্রান্ত এক টি.ভি প্রোগ্রাম করছে। মুফতিয়ে আযম তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখানকার মসজিদগুলোতে বয়ান করা আপনার জন্য অত্যন্ত সহজ হবে। হালীমা খানের কারণে মুফতী সাহেব আপনাকে বয়ান করার জন্য সহজেই অনুমতি দিবেন। আমি বললাম ঠিক আছে। আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন। সে যদি আমাদের পিছনের সিটে বসে, তাহলে কোন আপত্তি নেই।

পরক্ষণেই আমরা একটি বড় ও প্রশস্ত বাংলোর গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। হর্নের শব্দ শুনতেই হালীমা খান নিচে নেমে এল। পরে দাদা খান নূরীর ইঙ্গিতে গাড়ীর পিছনের সিটে বসে পড়ল। কিছু সময় তারা পরস্পরে উজবেকি ভাষায় কথা বলতে লাগল। হঠাৎ হালীমা খান পিছন থেকে আমার কাঁধে তার হাত লাগাল। আমি ইতঃস্ততবোধ করে একটু সামনে ঝুঁকে পড়লাম। দাদা খান নূরী বললেন, হযরত! আমি তার কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছি। সে অতি ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে আপনার কাপড়ে হাত লাগিয়ে বরকত অর্জন করছে। আমার অনুভব হল হালীমা খান আমার কাপড়ে হাত লাগিয়ে হাতে চুমু খাচ্ছে এবং উভয় হাত তার চেহারায় মুছছে।

আমি একথা ভেবে পেরেশান হয়ে গেলাম যে, গোনাহে ভরপুর জীবন কাটানো সত্ত্বেও এই মহিলার অন্তরে একজন আলেমের কত সম্মান ও মর্যাদা। এই সম্মান প্রদর্শনের ফলে তার জন্য তা হেদায়াতের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় গাড়ী একটি বিশাল ও প্রশস্ত ভবনের সামনে এসে থামল। দাদা খান নূরী বললেন, হযরত! এটা শায়খ তালহার মসজিদ। আমি গাড়ী থেকে বের হলাম। ঠাণ্ডার কারণে জুব্বা পরিধান করেছিলাম এবং হাতেও লাঠি ছিল। দাদা খান নূরী আমাকে বললেন, হযরত! হালীমা খান জিজ্ঞাসা করছে আপনার হাতে লাঠি কেন? বাতের সমস্যা আছে কি না?

আমি বললাম, না, বরং লাঠি রাখা সুন্নত বিধায় সাথে রাখি।

দাদা খান নূরী অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আমাকে সামনে চলতে বললেন। ভবনে প্রবেশ করে বুঝতে পারলাম এটা একটা অফিস বা কার্যালয়, যাতে পদে পদে অফিসারদের অনুমতি নিতে হয়। কয়েকজন অফিসার নিরীক্ষণের পর যদি সমীচীন মনে করে তাহলে অনুমতি প্রদান করে। হালীমা খান কামরায় প্রবেশ করেই ফোন করে মুফতী সাহেবকে বলল, আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি এবং আমার সাথে এক আলেম মেহমান এসেছে। তিনি আপনার সাথে মোলাকাত করতে আগ্রহী। মুফতী সাহেব তার কর্মচারীকে বললেন, এই মেহমানদেরকে শীঘ্রই আমার অফিসে পৌঁছিয়ে দাও। অতঃপর এক লোক আমাদেরকে কয়েকটি কামরা অতিক্রম করিয়ে এক আলীশান অফিসে নিয়ে গেল। এক ব্যক্তি দরজার সামনে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। দাদা খান নূরী বললেন, হযরত! তিনি আমাদের মুফতিয়ে আযম মুহাম্মদ সাদেক মুহাম্মদ ইউসুফ। মুফতী সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলেন।

এরপর আমরা চেয়ারে বসে গরম গরম চা পান করলাম। প্রথমে তিনি হালীমা খানের সাথে হজ্জের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। পরিশেষে আমার সাথে আরবী ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কী জন্য এসেছেন?

আমি ভাঙ্গাচুরা আরবী বললাম আমাদের আকাবিরীনের নিসবতের নূর প্রচার-প্রসারের জন্য এসেছি। মুফতী সাহেব আমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন, 'শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী! এই নিয়ামত আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনি মধ্য এশিয়ার যেখানে ইচ্ছা সেখানে বয়ান করুন, নসীহত করুন, মুরাকাবা করুন এবং আমাদের ওলামায়ে কেরামকে নিসবতের নূর দ্বারা আলোকিত করুন। তা আমাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ (এহসান) হবে। এখন আমি এক মিটিংয়ে যাচ্ছি। মিটিংয়ে আমি উজবেকিস্তানের বিভিন্ন জেলার প্রায় চল্লিশজন মুফতীকে আহবান করেছি। আমি তাদেরকে আপনাকে নিয়ে তাদের এলাকায় প্রোগ্রাম করানোর কথা বলব। মুফতিয়ে আযমের সাথে মোলাকাতের পর রাহবার আমাদেরকে এক চলমান কনফারেন্সে নিয়ে গেল, যাতে ৪০টি জেলার মুফতিয়ানে কেরাম তাশরীফ এনেছেন। তারাও আমাকে দেখে আনন্দের সাথে মোলাকাত করলেন।

দাদা খান নূরী আমাকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং মুফতিয়ে আযমের পয়গাম শুনালেন। তারা বললেন, আমাদের এলাকায় প্রোগ্রাম দিন, আমরা প্রস্তুত আছি। আমি দাদা খান নূরীকে বললাম, এটা গনীমতের মওকা, এখনই প্রোগ্রামসূচী তৈরি করুন। আমি বিশ দিনে এই সমস্ত স্থানে সফর করব। দাদা খান

নূরী ম্যাডাম হালীমা খানকে বললেন, আপনি হযরতকে মাসহাফে উসমানী দেখিয়ে নিয়ে আসুন, আর এদিকে আমি প্রোগ্রামের তাশকিল এবং সূচী তৈরি করি। ম্যাডাম হালীমা খান আমাকে বলল, 'আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে মাসহাফে উসমানী দেখাতে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, আপনি সামনে না চলে পিছনে পিছনে আসুন এবং রাস্তা বলে দিন। সে প্রশ্ন করল, কেন? আমি বললাম 'আমি কুরআন থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি। হযরত মূসা আ. যখন শুয়াইব আ. এর মেয়ের সাথে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন তখন হযরত মূসা আ. বলেছিলেন, তুমি পিছনে চল। কেননা সামনে চললে গায়রে মাহরামের দেহে দৃষ্টি পড়ার আশংকা রয়েছে। পিছনে চললে এর আশংকা নেই। হালীমা খান এ কথায় আশ্চর্য হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, "শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী! এ রকম লোক বর্তমান দুনিয়ায় আছে? আমি বললাম, ম্যাডাম! এসব কিছু আমার শায়খের মেহনত।

তখন আমরা এক বড় গেটের সামনে পৌঁছে গেলাম। গেট তালাবদ্ধ ছিল। হালীমা খান বলল, হযরত! আমি কাউকে পাঠিয়ে এখানের দারোয়ানকে ডেকে আনি। সে এসে গেইট খুলে দেবে। পাশের বিল্ডিং থেকে এক ছেলে একটি চেয়ার নিয়ে এল। হালীমা খান বলল, হযরত! আপনি দাঁড়িয়ে কষ্ট না করে এই চেয়ারে বসুন। আমি চেয়ারে বসলাম। হালীমা খান আমার পিছনে দাঁড়াল।

যে ছেলেটি চেয়ার এনে দিয়েছিল, সে বাড়ীতে গিয়ে জানাল যে হালীমা খান এসেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ৪০/৫০ জন ছেলে বাড়ী থেকে বের হয়ে আসল এবং হালীমা খানের নামে শ্লোগান দিতে লাগল। তারা আমাদের দু'জনকে ঘরে নিয়ে গেল ছেলেরা হালীমা খানের সাথে টিভি প্রোগ্রামের কথা আলোচনা করছিল। একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল, হালীমা খান এই লোক কি আপনার পিতা? হালীমা খান বলল, হ্যাঁ, তিনি আমার রূহানী পিতা। একটি ছোট ছেলে বলল, হালীমা খান! সে ইঙ্গিতে হালীমা খানকে বলতে লাগল হালীমা খান তার দিকে তাকিয়ে আমাকে বলল, শায়খ! গেইট খোলা হয়েছে।

আপানি মাসহাফে উসমানী দেখুন। আমি এখানে বাচ্চাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি।

মাসহাফে উসমানীর যিয়ারত

আমি যখন ভবনের ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন এক যুবক আমাকে বলল, এখানে কুরআনের অনেক দুর্লভ নুসখা (কপি) রয়েছে। সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য নুসখা হল 'মাসহাফে উসমানী'।

চামড়ার উপর লিখিত কুরআন মজীদের নুসখা, যা হযরত উসমান রা. তার খেলাফতের সময়ে তৈরি করেছিলেন এবং এটাই তেলাওয়াত করতেন। প্রথমে

এই নুসখা অন্য রাষ্ট্রে ছিল। যখন আমীরে তৈমুর বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজয় করলেন তখন তিনি তা সমরকন্দ নিয়ে আসেন। রুশ বিপ্লবের পর এই নুসখা লেনিনগ্রাদ এর এক ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হওয়ার পর উজবেকিস্তানের সরকার জোর দাবী জানালো যে, মাসহাফে উসমানী আমাদের কাছে ফেরত দেয়া হোক। এরপর অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে এই নুসখাকে তাশখন্দ এনে এই ভবনের এক কামরায় রাখা হয়েছে। এই কামরায় গরম-ঠাণ্ডা নিয়মিত চেক করার জন্য দুজন বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত আছে। এই নুসখা যাতে নষ্ট বা ধ্বংস না হয় সে জন্য বিভিন্ন কেমিক্যাল দেয়া হয়।

আমি যখন মাসহাফে উসমানী দেখলাম (খত্তে কুফী) কুফী লেটারে লিখিত হওয়ার ফলে পাঠ করতে অসুবিধা হচ্ছিল, কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার পর দুটি শব্দ জিব্রাইল ও মিকাইল বুঝে আসল।

অতঃপর আমি মুখস্ত পাঠ করতে লাগলাম। ফলে শব্দ বুঝে আসতে লাগল, পাঠ করতে করতে فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ পর্যন্ত পৌঁছে এর উপর একটি চিহ্ন দেখতে পেলাম। বলা হয়, হযরত উসমান রা. কে শহীদ করার সময় তার শরীর থেকে প্রবাহিত রক্তের কারণে এই চিহ্ন লেগে আছে। সুবহানাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কারো শাহাদাতের সাক্ষী হবে জমিনের মাটি, কারো শাহাদতের সাক্ষী হবে পাথর। পক্ষান্তরে হযরত উসমান গনী রা.-এর শাহাদতের সাক্ষী হবে আল্লাহ তা'আলার কুরআন। অত্যন্ত আগ্রহ ও মহব্বত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কুরআন শরীফের এই নুসখা প্রত্যক্ষ করলাম। এমনকি দাদা খান নূরী এসে বলতে লাগল, হযরত! আপনার অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে (ফারগানায়ে ওয়াদী) ফারগানা উপত্যকার প্রোগ্রাম হয়ে গেছে। এখনই ঘরে ফিরে যাওয়া উচিৎ। আমি দাদা খান নূরীর সঙ্গে সামনে সিটে বসি।

হালীমা খান পথিমধ্যে এসে তার বাসায় শরবৎ পান করার জন্য জোর আবেদন করল। কিন্তু নামাযের সময় ঘনিয়ে এসেছিল এবং তার পরে কিছু পানাহার করার ইচ্ছাও আমার ছিল না। ফলে ওযর পেশ করে অনুমতি নিয়ে নিলাম এবং সিয়াহত হোটেলে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। পরের দিন হালীমা খান আমার কাছে টিভির প্রোগ্রাম চেয়ে প্রস্তাব পাঠাল। আমি বললাম, আমাদের মুরুব্বি আমাদেরকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আত্মগোপন করার শিক্ষা দিয়েছেন বিধায় আমার দ্বারা টিভির প্রোগ্রাম করা সম্ভব নয়।

তাশখন্দ শহর

মুফতিয়ে আযমের সাথে মোলাকাত করে ফিরে আসার সময় দাদা খান নূরী তাশখন্দের কিছু প্রসিদ্ধ ইমারত দেখিয়েছেন এবং উজবেকিস্তান সম্পর্কে কিছু বিষয় অবগত করিয়েছেন-

"উজবেকিস্তান মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের গুরুত্ব বহন করে। এর জনসংখ্যা দুই কোটি। আয়তন এক লাখ আটান্ন হাজার বর্গমাইল। উজবুকীদের বংশ পরম্পরা মঙ্গোলীয়দের সাথে মিলিত হয়।

যারা এক সময় রুশ এবং কায়ফ পর্যন্ত বাদশাহী করেছে। আমীরে তৈমুর তার যুগে কৃষ্টি কালচার ও সভ্যতার নির্দশন বিস্তার করেন, যার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য আজও বুখারা– সমরকন্দের মসজিদ-মাদরাসা ও জৌলুসপূর্ণ প্রাসাদে পরিলক্ষিত হয়। উজবেকিস্তান তৈমুর ও বাবরের জন্মস্থান– শুধু এটাই সেখানকার অধিবাসীদের গর্বের বিষয় নয়, বরং এখানে ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদী রহ. এর ন্যায় আলেম, শায়খ বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী রহ. এর ন্যায় বুযুর্গ, আলী শিরওয়ানীর ন্যায় কবি, ইবনে সীনার ন্যায় বিজ্ঞানী এবং আল বিরুনী ও ফারাবীর ন্যায় দার্শনিকদের জন্ম হয়েছে।এটাও তাদের জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয় বটে।

১৯৬৫ ইং যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় আইয়ুব খান ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যকার "তাশখন্দ" চুক্তি যে প্রাসাদে সম্পাদিত হয়েছিল দাদা খান নূরী আমাকে সে প্রাসাদটি দেখালেন। তাশখন্দের দু' হাজার বছরের পুরাতন শহর 'তাইন-শাইন' যা পাহাড় ও ছারছিক সমুদ্রের সন্নিকটে অবস্থিত। এক সময় একে এক হাজার কিল্লার শহর বলা হত। সম্ভবত এ কারণেই এর নাম তাশখন্দ। অর্থাৎ পাথরের শহর। উজবেক ভাষায় তাশ অর্থ পাথর এবং কন্দ অর্থ শহর। শিরি-ফরহাদের প্রেমের উপাখ্যান এ এলাকা থেকেই রচিত হয়েছে। বর্তমান শহরের সৌন্দর্য, আলীশান প্রাসাদ, সুউচ্চ বিল্ডিং ও পার্কসমূহ দেখে এত পুরাতন শহর বলে বিশ্বাস হয় না। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনটি শহর মস্কো, লেনিনগ্রাদ এবং কাইফ। এরপর চতুর্থ শহর হলো তাশখন্দ। তাশখন্দ এশিয়ার সর্বপ্রথম শহর যার ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে লাইনের কাজ শুরু হয়েছে। ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে স্টেশন মর্মর পাথর দিয়ে এমন মজবুত করে বানানো হয়েছে, যেন ভূমিকম্প এর কোন ক্ষতি করতে না পারে।"

ফারগানা উপত্যকায় কিছুদিন

দাদা খান নূরী বললেন, "ফারগানা উপত্যকা তার পৈতৃক নিবাস। এটা উজবেকিস্তানের একটি মনোরম ও স্মৃতিবিজড়িত স্থান। যা বাবরের জন্মস্থান। এছাড়াও হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগেনানী রহ. ও এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন। মারগেনান, নামগান, ইনদাজান ও কাওকান এখানকার প্রসিদ্ধ শহর। দাদা খান নূরী যখন শুনলেন আমি সেখানে সফর করতে আগ্রহী, তখন তারও তার প্রিয় মাতৃভূমি সফর করতে প্রবল ইচ্ছা হল। দাদা খান নূরী আমাকে বললেন, আমি আপনাকে ফারগানা উপত্যকায় নিয়ে যাব।

৭ই মে ১৯৯২ বৃহঃবার ১১টায় ফারগানা উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এক স্থানে গাড়ী থামিয়ে বের হয়ে দেখলাম, চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য! ঠাণ্ডা এত অধিক ছিল যে, বরফ হাতে নিলে হাত অবশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হত। মৃদুমন্দ বাতাস বইতেছিল, আমি অনেকক্ষণ বরফের উপর দিয়ে চলার প্রশিক্ষণ নিলাম। দ্বিতীয়বার সফর শুরু করে দাদা খান নূরীর এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে সেখানে যোহরের নামায আদায় করে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম এবং মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে ফারগানা উপত্যকায় পৌঁছলাম। চারদিকে সবুজের সমারোহ। ফুল আর ফুল, গাছগুলো ফুলে ভরপুর ছিল। আমার মুখ থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই আয়াতে কারীমা বের হয়ে আসল—

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

(নিশ্চয়ই কওমে সাবার জন্য ডানে-বামে দু'টি বাগান নিদর্শনস্বরূপ ছিল।)

শহরে প্রবেশ করে সোজা মসজিদে গেলাম। মুয়াযযিন আমাকে দেখে নামায পড়ানোর জন্য ইশারা করলেন। নামাযের পর মুসল্লীরা মাহফিলের মত সমবেত হয়ে বসল। মসজিদের ইমাম ও খতীব মুফতী আবদুর রহমান আমাকে বললেন, মহল্লাবাসী আপনার কিছু নসীহত শুনতে চাইছে। আমি উর্দু ভাষায় বয়ান করলাম, আর দাদা খান নূরী উজবেকী ভাষায় তরজমা করলেন। সমবেত লোকজন আলহামদুলিল্লাহ-সুবহানাল্লাহ বলে আমার বয়ানে গতি সঞ্চার করছিল।

বয়ান শেষে মুফতী আবদুর রহমান সাহেব আমাকে তাঁর বাসায় যেতে দাওয়াত করলেন। মহল্লার কিছু নামাযী ব্যক্তিও আমাদের সাথে আসল। খানার সময়ও আলোচনা চলছিল। রাতে এখানেই অবস্থান করলাম। ফজরের নামাযের পর আমি আরবী ভাষায় বয়ান করলাম আর মুফতী আবদুর রহমান সাহেব খুব সুন্দরভাবে উজবেকী ভাষায় তরজমা করলেন। লোকজন খুব গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে বয়ান শুনল। বয়ান শেষে মুরাকাবা করলাম। নফল ও এশরাকের পর এক লোকের বাসায় নাস্তার দাওয়াত ছিল। সে এলাকার সকল উলামায়ে কেরাম ও বুযর্গদেরও দাওয়াত করেছিল। ফলে সকলের সাথে মোলাকাত করার সৌভাগ্য হয়।

উজবেকিস্তানে খাওয়ার পূর্বে খুব গুরুত্ব দিয়ে হাত ধোয়ানো হয়। প্রত্যেক মাহফিলে উঠতে বসতে হাত উঠিয়ে দু'আ করা হয়। আগত মেহমান যখন দু'আ করে তখন মেজবান দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে 'রহমত-রহমত' শব্দ বলতে থাকেন। মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ করতে নিজের বাম হাত বুকের উপর রাখেন। অতঃপর দস্তরখানা বিছিয়ে এর উপর রুটি টুকরা টুকরা করে রাখেন। অনেক ফল-ফলাদি রাখা হয়। পাতলা চা অল্প অল্প করে কাপে ঢেলে পানির পরিবর্তে পান করা হয়। পোলাও এখানকার খুব জনপ্রিয় খাবার। বড় বড় পেয়ালায় খাওয়ার জন্য

গোশতের শুরবা (ঝোল) রাখা হয়। সাধারণত লোকজন শুরবাতে রুটির টুকরা ভিজিয়ে সারীদ তৈরী করে। খাবারের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেরূপ আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর মর্যাদা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে। খাবার শেষে গোশতের তৈরী খাবার আনা হয়। এখানকার নিয়ম হলো খাবার ধীরে ধীরে আরামের সাথে খাওয়া। যে মেহমান এখানকার নিয়ম সম্পর্কে পূর্বে থেকে অবহিত নন তিনি দ্রুত খাবার খেলে তার অবস্থা নাজেহাল হয়ে যায়।

নামগান শহর

নামগান তাশখন্দ থেকে পাঁচশত মাইল দূরে উজবেকিস্তানের শেষ সীমান্তে অবস্থিত এক বড় শহর। শহরটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ শহরটি এমন স্থানে অবস্থিত, যার পূর্বদিকটি কাজাকিস্তানের সীমান্ত ঘেষে রয়েছে। দক্ষিণ দিকটি কিরগিস্তানের নিকটবর্তী এবং পশ্চিম দিকে তাজাকিস্তানের সাথে মিলিত হয়েছে। এখানকার ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব পাশের তিন শহরে নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করে। দীনী জ্ঞান অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা এখানে এসে আলেমদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে তাদের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। দ্বিতীয় কারণ, এখানে দীনদার ও পরহেজগার মুত্তাকী আলেমরা বসবাস করে। একে শহরে কয়েকটি দীনী মাদরাসা রয়েছে। চারপাশে এর নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। নামগানের অধিকাংশ মহিলা পর্দার সাথে বাজারে যায়। অথচ এই দৃশ্য মধ্য এশিয়ার কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং মহিলারা মাথা ঢাকে তবে চেহারা খোলা রাখে। শহরটি খুবই সুন্দর, শহরের উপকণ্ঠে জনবসতি রয়েছে। শহরের ভিতরে পুরাতন বসতি ও সংকীর্ণ রাস্তা রয়েছে। তাছাড়াও প্রশস্ত রাস্তা ও উঁচু উঁচু প্রাসাদ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রাস্তার উভয় পাশে ফুলের গাছ লাগানো রয়েছে। নামগান শহর দরিয়ায়ে সায়র-এর তীরে অবস্থিত, দরিয়ার অপর তীরে মোঘল সম্রাট বাবরের পিতা ওমর শেখ মীর্যার দূর্গ অবস্থিত। যার ঐতিহ্য ও নিদর্শন আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান। জহিরুদ্দিন বাবর এই ঐতিহাসিক দূর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাত বৎসর পর্যন্ত এই দূর্গে পালিত হয়েছেন। কিন্তু তার পিতা যখন এই দূর্গের ফটক থেকে পড়ে দরিয়ায়ে সায়রে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি তার মার সাথে নানহিয়াল চলে আসেন। যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তার বীরত্বের মনোভাব ও সুপ্রসন্ন ভাগ্য হিন্দুস্তানে নিয়ে আসে। সায়র ও কারা দুই নদী নামগানের নিকট একটি অপরটি ঘেঁষে প্রবাহিত।

বলা হয়ে থাকে সায়র ও কারা উপত্যকায় লালিত পালিত মোঘল সন্তান গঙ্গা ও যমুনা উপত্যকাসমূহের অধিকারী হয়েছেন। নামগানের অদূরেই তেলের এক বিরাট খনির সন্ধান পাওয়া যায়। যখন কূপ খনন করা হল তখন তেল এত প্রবল

বেগে প্রবাহিত হতে লাগল যে, তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অতঃপর এর চারপাশে কালো তেলের এক হ্রদ সৃষ্টি হয়ে যায়। বর্তমানে এখান থেকে বড় বড় গাড়ীতে করে তেল রিফাইনিং করতে নিয়ে যাওয়া হয়। দাদা খান নূরীর চোখ এই হ্রদ প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়ে যায়। তিনি একে তরল সোনার হ্রদ বলে মনে করেন।

নামগানে 'আদালত' নামে এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যার প্রতিটি সদস্য ঈমানদীপ্ত নওজোয়ান। এই আন্দোলন মানুষের কল্যাণ কামনা ও চারিত্রিক সংশোধনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। "আদালত" পথভ্রষ্ট নওজোয়ান ও অপরাধী লোকদের মসজিদে নিয়ে আসে। কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। দীনী শিক্ষা অর্জন করে এই সমস্ত নওজোয়ান তওবা করে অপরাধজগত থেকে ফিরে এসে খাঁটি মুসলমানে পরিণত হয়।

নিসবতের বরকত

আমি যখন দাদা খান নূরীর সাথে নামগান শহরে প্রবেশ করলাম ততক্ষণে মাওলানা রুস্তম জান অভ্যর্থনার জন্য চার স্থানে জামাত পাঠিয়েছিলেন। বিমানবন্দরে, গাড়ী দাঁড়াবার স্থানে, মাদরাসায়ে আরাবিয়াতে, জামে মসজিদের গেইটে। আমাদের কাছে মাদরাসার ঠিকানা ছিল। সেখানে পৌছার সাথে সাথে ছাত্ররা এক অভিনব পন্থায় অভ্যর্থনা জানাল। সে দিন ছিল জুমআর দিন এবং নামাযের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। আমরা দ্রুত অযু করে নামাযের জন্য মসজিদে এসে গেলাম। মাখদুম ঈশাঁ জামে মসজিদে আমি বয়ান করলাম এবং মাওলানা রুস্তম জান তরজমা করলেন। দাদা খান নূরীর অনুমানে পাঁচ হাজার মুসল্লী সমবেত হয়েছিল। আমি আত্মশুদ্ধির উপর তথা বাতেনী পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আহলুল্লাহদের ঘটনা শোনার ফলে সমবেত সবার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তাদের অন্তরে জোশ ও জযবা সৃষ্টি হয়।

আমি যখন জুমআর আরবী খুৎবা পাঠ করছিলাম তখন নিসবত শরীফের বরকত অবতীর্ণ হচ্ছিল। লোকদের চোখ থেকে মুক্তার ন্যায় অশ্রু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। নামাযের ইমামতিও আমি করলাম। নামাযের পর মাওলানা রুস্তম জানের অনুরোধে আমি মসজিদে সমবেত সবাইকে বায়আতের কালেমাসমূহ পাঠ করালাম এবং মুরাকারা করলাম। নামাযের পর মুসল্লীরা মুসাফাহা করার জন্য এমন ভীড় করল যে, যদি কিছু নওজোয়ান আমাকে তাদের বেষ্টনীতে না নিত তাহলে প্রাণ বাঁচানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতদসত্ত্বেও কিছু লোক মুসাফাহা করছিল। কিছু লোক বাহু, কাপড়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হাত লাগিয়ে বরকত অর্জনের জন্য নিজের চেহারায় মিলাতে লাগল। তখন আমি আমার আত্মাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলাম, হে লাঞ্ছিত? তুমি তোমার অন্যায়, অপরাধ ও

পাপসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর এবং তোমার পরওয়ারদেগারের গোনাহ্ ও পাপসমূহ ঢাকার প্রতি লক্ষ্য কর। লোকেরা তোমার প্রশংসা করছে না, বরং তোমার পরওয়ারদেগারের গোনাহ্ ঢাকার বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করছে।

এলাকার বড় বড় শায়খগণ দেখা করার জন্য দলবদ্ধ হয়ে আসতে লাগলেন। তখন যুবকরা বেষ্টনী দিয়ে তাদের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিল। যখন তারা আমার কপালে চুমো দিল, তখন আমি তাদের নূরানী চেহারা অবলোকন করে তাদের হাতে চুমো দিলাম। সমবেত লোকেরা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ! আল্লাহ! আওয়াজ দিতে লাগল। দাদা খান নূরীর গর্ববোধ হতে লাগল যে, আমি এমন এক মেহমান নিয়ে আগমন করেছি, যার সাথে এলাকার আলেম ওলামা সকলেই তার সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হয়। পুলক অনুভব করে।

অনেকক্ষণ পর যখন লোকদের ভীড় কমে গেল, তখন যুবকরা আমাকে নিকটবর্তী এক কামরায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ কামরায় তাশরীফ আনলেন, তাদের অনেকেই আমাকে দেখে উচ্চস্বরে বললেন–

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِالسُّجُوْدِ

"তাদের নিদর্শন হলো তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান।"

অনেকেই আমাকে দু'আ করার অনুরোধ করলেন, আমি তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে দু'আ করলাম। মুহূর্তে পাতলা কোট পরিহিত এক ব্যক্তি কামরায় প্রবেশ করল এবং আমার পাশেই এমনভাবে বসল যেন কোন শায়খুল মাশায়েখ বসেছেন। যখন কোন ব্যক্তি আমাকে দু'আ করতে বলত, তখনই সে দ্রুত হাত উঠিয়ে উচ্চস্বরে দু'আ করতে থাকত এবং তাকে বলত যে, আপনার জন্য দু'আ করা হয়েছে।

এরপর হঠাৎ করে সে বয়ান শুরু করে দিল। আমি আমার পাশের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? সে আমার কানে কানে বলল, তিনি তুর্কীর আলেম। দাড়িবিহীন, মহিলাদের সাথে উঠা-বসা করে, হারাম-হালালের কোন বালাই নেই। তা সত্ত্বেও সরকার তাকে তাবলীগের কাজে পাঠিয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের স্বাধীন হওয়ার পর ভাবল যে, এখানকার মুসলমানরা যেন কখনও পাকিস্তানী অথবা সউদী আরবের ইসলামী জিন্দেগীর ন্যায় জিন্দেগী শুরু না করে। এ জন্যই তারা এক ফান্ড তৈরি করে মোটা অংকের অর্থ সংগ্রহ করেছে এবং তুর্কীস্তানকে বলেছে, তোমরা এই অর্থ আলেমদেরকে দিয়ে মধ্য এশিয়ায় পাঠিয়ে দাও। তারা গিয়ে মসজিদ-মাদরাসা তৈরি করবে এবং সেখানকার লোকদেরকে তাদের ন্যায় মুসলমান বানাবে। এরকম কয়েকশত আলেমকে উজবেকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়েছে। আমরা মেহমানের সম্মানার্থে তাদের কথা কিছু শুনি। কিন্তু আমরা আমাদের মতই জীবন-যাপন করি।

কিছু সময় এই ব্যক্তি বয়ান করার পর সমবেত লোকদের থেকে এক লোক বলে উঠল, আমরা তো প্রতিদিন আপনার কথা শুনি, অনুগ্রহপূর্বক পাকিস্তানী মেহমানের কথা শুনতে দিন। কিন্তু সে সমবেত লোকদের দাবী উপেক্ষা করে তার নিজ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, ফলে প্রত্যেক শ্রোতার মধ্যে বিরক্তিভাব প্রকাশ হচ্ছিল।

আমি দেখলাম, সে মাহফিলের সুন্দর মনোরম পরিবেশটা নষ্ট করে দিচ্ছে তাই আমি তার ক্বলবে তাওয়াজ্জুহ দিলাম। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে উক্ত মাহফিল থেকে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর মাহফিলে সমবেত সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

আলহামদুলিল্লাহ্! কিছুদিনের পরিশ্রমে নিসবতে আলিয়ার নূর দ্বারা গোটা এলাকা আলোকিত হয়ে গেল।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ

“এবং আল্লাহ তাআলা স্বীয় হুকুমের উপরে বিজয়ী থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।’

আন্‌তা হাযা, ওয়া নাহনু হাযা (আপনি এমন, আমরা এমন)

পরের দিন স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের একটি জামাত সাক্ষাৎ করার জন্য এল। এদের অনেকেই নাজিম, মুহতামিম, ইমাম ও খতীব ছিল। তারা এমন সাবলীলভাবে আরবী ভাষা বলতে পারে, যেন আরবী তাদের মাতৃভাষা। আমি তাদের সামনে আমার স্বল্প জ্ঞানের কথা স্বীকার করে ফেললাম। আমি তাদের সব কথাই বুঝি, কিন্তু জওয়াব দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই। তদুপরি ভাঙ্গাচুরা আরবী ভাষায় জওয়াব দিতে লাগলাম।

এদিকে দাদা খান নূরী তার ভাই-বোনদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বাড়ীতে চলে গেছে, বিধায় কথা বলা ও শোনার দ্বিতীয় কোন মাধ্যম ছিল না। মেজবান শুকনো ফলমূল দস্তরখানে রেখে দিয়েছিল। সবাই ফল খাচ্ছিল এবং কথাবার্তাও চলছিল। মাওলানা দাউদ খান স্থানীয় আলেমদের মধ্যে বয়স্ক ও বিজ্ঞ আলেম। তিনি আমাকে পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। এক প্রশ্নে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, পাকিস্তানের জনসাধারণ নিজেদের রাষ্ট্র কালেমার আওয়াজ দিয়ে স্বাধীন করেছিল। আজ ৪৫ বৎসর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ইসলামী শরীয়ত কার্যকরী হচ্ছে না কেন? সেখানকার ওলামায়ে কেরামের কী হয়েছে? তারা কি অলস নিদ্রায় বিভোর হয়ে আছে? আমি বললাম, ওলামায়ে কেরাম ইসলামী শরীয়ত কার্যকরী করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তিনি আমার এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

পুনরায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে কেন এসেছেন? আমি বললাম, আমি নিসবতে শরীফার প্রচার-প্রসারের জন্য এসেছি। তিনি একটু রাগতস্বরে বললেন, পাকিস্তানের কাজ কি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যে, আপনি এখানে এসেছেন? আমি আরজ করলাম, চাকর ও ডাকপিয়নের নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। সে হুকুমের তাবেদার হয়। আমি স্বপ্নে ইঙ্গিত পেয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনার আপত্তি থাকলে আমি ফিরে যাব। অল্প সময়ের জন্য মাহফিলে নীরবতা ও নিস্তবদ্ধতার পরিবেশ নেমে এল।

মাওলানা রুস্তম খান আমাকে বললেন, হযরত! কিছু নসীহত করুন। আমি হুকুম পালনার্থে তাকওয়া বিষয়ক কিছু বয়ান করলাম। সাথে সাথে উপস্থিত সকলের উপর বাতেনী তাওয়াজ্জুহও দিলাম।

অনেকের উপর এর প্রভাব পড়ল, মাওলানা দাউদ খান চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। বয়ান শেষে তিনি উঠে সামনে আসলেন এবং আমার কাছে ওযর পেশ করতে লাগলেনযে, আমি আপনার সাথে উচ্চ আওয়াজে কথা বলেছি। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, আমাকে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন।

এরপর তিনি শিশুদের ন্যায় উচ্চ আওয়াজে কান্না জুড়ে দিলেন। আমার পায়ের সাথে লেগে বসলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি তার মাথা আমার কোলে রেখে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। ফলে প্রতিবেশী লোকজন কী ব্যাপার, তা জানারর জন্য একত্রিত হয়ে গেল। উপস্থিত সকলের উপর এর এমন প্রভাব পড়ল যেন, মনে হচ্ছে কারো মৃত্যুশোকে কাঁদছে। আমি সবাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। মাওলানা ওমর খাঁন বারবার উচ্চ আওয়াজে আল্লাহ! আল্লাহ! বলতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। যথেষ্ট সময় পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল ছিল। আমি সবাইকে সান্ত্বনা দিলাম। মাওলানা ওমর খান বললেন, হযরত! আমরা আপনার তরীকতের ছাত্র হতে চাই। আমি সবাইকে বায়আত করলাম, আর তখনই আল্লাহ তাআলা নিসবতে শরীফার প্রচার-প্রসারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। বায়আত করার পর সমস্ত ওলামায়ে কেরামের কলবের উপর আঙ্গুল রেখে ইসমে জাতের জরব লাগালাম আর মুরাকাবা করার পন্থা বলে দিলাম।

এরপর যখন সবাইকে বললাম। কিছুক্ষণের জন্য আপনারা মুরাকাবা করুন। তখন তারা হেচঁকী দিয়ে কান্না জুড়ে দিলেন। মুরাকাবা শেষ করে সবাই তাদের মাদ্‌রাসায় যাওয়ার দাওয়াত দিল।

আলহামদুলিল্লাহ্! আমি সবার দাওয়াত কবুল করলাম এবং সাতদিনের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই শহরের বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় গমন করলাম। প্রত্যেক স্থানেই আমি আরবী ভাষায় বয়ান করি। সমস্ত ছাত্র বায়আত হয়ে সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

মাওলানা ওমর খান বললেন, হযরত! আপনি এখানকার ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতে তাদের পীর ও মুর্শিদ। ওলামায়ে কিরাম এই প্রথম কোন এক

ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা সুলূকে তথা আল্লাহ পাওয়ার রাস্তা শেখার জন্য পাকিস্তান আপনার কাছে যাব। আমি বললাম, আমাদের চোখ অন্তর আলোকিত হোক।

কমিউনিস্টদের বিপ্লবের পূর্বে নামগান শহরে প্রায় এক হাজার মসজিদ ছিল। কিন্তু তাদের বিপ্লবের পর দুটি বড় মসজিদ ব্যতীত সবকটি মসজিদ তালাবদ্ধ করে দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্! বর্তমানে এগুলোর সংস্কার হচ্ছে প্রায় বাইশটি মসজিদে জুমআর নামায শুরু হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলোর সংস্কারের কাজ অব্যাহত রয়েছে। আমাকে নিয়ে কিছু স্থানে দু'আ করিয়েছে। আল্লাহ্র প্রশংসা প্রথম দিনেই তিনি তার পরিপূর্ণ রহমতের দ্বারা আল্লাহ্! আল্লাহ্! করার একটি জামাত তৈরী করে দিয়েছেন। এখন আমাকে পরিচয় করানোর জন্য দাদা খান নূরীরও কোন প্রয়োজন নেই। কোথাও আসা-যাওয়ার জন্য গাড়ীরও প্রয়োজন নেই।

দাদা খান নূরী যখন এই অবস্থা দেখলেন, তখন আমাকে বললেন, হযরত! আজ রাত আমাদের বাসায় দাওয়াত কবুল করুন। তারপর ওলামায়ে কেরাম যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যাক, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। রাত্রের খাবার তার বাসায় হয়। উজবেকী খাবারের সব রকমের আইটেম দস্তরখানে ছিল। বিশেষত ভুনা গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। খুব খেয়েছি। যখন শুতে গেলাম তখন দেখলাম, দাদা খান নূরী দস্তরখান বিছিয়ে খানা রেখে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম এগুলো কী? বলতে লাগল এ খাবারগুলো যখন ঘুম ভাঙবে তখন খেয়ে নিবেন।

ইন্দাজান এর মাদরাসাগুলো

ইনদাজানের এক প্রসিদ্ধ শায়খে তরীকত হযরত আদেল খান (দাঃ বাঃ) যখন নামগানের ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে শুনলেন যে, তারা তরীকতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে তার আনন্দের আর সীমা রইল না। তিনি আমার কাছে এক বিশেষ দূত প্রেরণ করলেন ইনদাজান তাশরীফ নেয়ার জন্য। আমি তার হুকুম পালনার্থে পরের দিন ইনদাজান এসে হাজির হই। যোহরের নামায এক মাদরাসার মসজিদে আদায় করি। মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নামায শেষে এক নওজোয়ান আলেম কুরআনের দরস দিতে লাগলেন। প্রায় কয়েক হাজার মুসল্লী তার দরসে কুরআনে অংশগ্রহণ করলেন। নওজোয়ান আলেম মাওলানা আব্দুল কাহহার সাহেবের চেহারায় সৌভাগ্যের আলো উদ্ভাসিত হচ্ছিল। অতঃপর যখন দরসে কুরআন শেষ হয়ে গেল, তখন দু'আর পরে এক লোক ঘোষণা করল, পাকিস্তান থেকে শায়খে তরীকত আগমন করেছেন। তিনি বয়ান করবেন। ঘোষণা শেষে যখন আমি মিম্বর ও মিহরাবের নিকটবর্তী হই তখন আব্দুল কাহহার সাহেব নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল আমার ব্যাপারে তার কোন কিছু বোধগম্য হচ্ছে না।

এরপর আমি দরসে কুরআন করলাম, তিনি ভাষান্তর করলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! নিসবতে শরীফার নূর মাহফিলকে খুব নূরান্বিত করেছিল, এমন কি দরসে কুরআনের শেষে সর্বপ্রথম আব্দুল কাহহার সাহেব বায়আত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সাধারণ মানুষের কথা আর কী বলব, বয়ান থেকে অবসর হওয়ার পর আব্দুল কাহহার সাহেব আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন এবং খানার আয়োজন করলেন। খানা শেষে তিনি আমাকে বললেন, হযরত! আপনি বিশ্রাম করবেন; না কি এখানে একটি নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সেখানে গিয়ে দু'আ করবেন? এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কিছুক্ষণ পূর্বে মসজিদে আপনার হাতে বায়আত হয়েছে। আমি বললাম, এই অধম এখানে বিশ্রাম করতে আসেনি, বরং কাজ করার জন্য এসেছে।

আমার পীর ও মুর্শিদ বলতেন– কাজ, কাজ আর কাজ। অল্প বিশ্রামই যথেষ্ট, বিধায় এই অধমের কাজ এটাই।

আমরা সবাই গাড়ীতে বসে এক প্রশস্ত ও বিশাল বিল্ডিংয়ে এসে পৌঁছলাম, যার নাম মাদরাসা ইমাম আসেম রহ. এবং এর বিল্ডিংয়ের কাজ খুব দ্রুত হচ্ছিল।

পুরো মাদরাসা পরিদর্শন করা দুঃসাধ্য হয়ে গেল। মাদরাসাটিকে একটি ইউনিভার্সিটির মত মনে হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতে কতজন ছাত্র অবস্থান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে? বলা হল প্রতি কক্ষে চারজন ছাত্র অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ পাকিস্তানের হিসাবে এতে আটজন ছাত্র অবস্থান করতে পারবে।

মাদরাসার মুতাওয়াল্লীর ছেলে হাফেজ আব্দুল জলীল সাহেবের কাছে আমার বয়ান এত বেশি পছন্দ হয়েছিল যে, তার হাতে সর্বদাই একটি টেপ-রেকর্ডার থাকত। সে আমার সমস্ত কথা-বার্তা রেকর্ড করত। আমি তাকে বললাম, বয়ানসমূহ রেকর্ড কর। ভালো কথা, তবে সমস্ত কথা বার্তা রেকর্ড করার উদ্দেশ্য কি? সে কেঁদে বলল, হযরত! আমরা এই কথা-বার্তা শুনব এবং স্মরণ করব, আপনি কোন মুহূর্তে বা কোন প্রেক্ষিতে কী বলেছিলেন?

মাদরাসায় দু'আ করার পর আমরা সবাই হাজী আব্দুস সালাম সাহেবের বাসায় খাবার খাওয়ার জন্য পৌঁছলাম। তিনি ইনদাজানের সকল জ্ঞানী-গুণীদের দাওয়াত করেছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! খাবার খাওয়ার পর অল্প সময় বয়ান হয়। এতেই অধিকাংশ লোক বায়আত হয়ে সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত হয়।

মাওলানা আব্দুল কাহহার সাহেব বলতে লাগলেন, হযরত! আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা আপনাকে এক যাদুময়ী ক্ষমতার অধিকারী করেছেন, এমন এমন

লোক বায়আত হচ্ছে, যাদের ব্যাপারে আমাদের কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। যাদের বায়আত হওয়া ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। আমি বললাম, এর মধ্যে আমার কোন কামালাত নেই। কামালাত তো কামালওয়ালা পরওয়ারদিগার রাব্বুল আলামীনের যিনি তার গোনাহগার বান্দাদেরকে দীনের জন্য কবুল করেন।

এই কথোপকথনের সময় এক আলেমে দীন আমাদেরকে দাওয়াত দিলেন। হযরত! আপনি এশার নামায আসাকা'র নিকটবর্তী জনপদের এক মসজিদে পড়াবেন। আমি মাওলানা আব্দুল কাহহার সাহেবকে বললাম, আমি তো নতুন মুসাফির, আপনিই বলুন কী করতে পারি? তিনি বললেন, হযরত! আমি নিজে আপনার সাথে সেখানে যাব। আপনি প্রোগ্রাম দিয়ে দিন।

দুই হীরকের দর্শন লাভ

মাগরিবের নামাযের পর মাওলানা আব্দুল কাহহার সাহেবের সাথে 'আসাকা' যাই। মহল্লাবাসীর অনুরোধে এশার নামায কসর পড়াই। অতঃপর তারা তাদের বাকী দু'রাকাআত নামায পুরা করলেন। নামায শেষে বয়ান করি।

মাওলানা আব্দুল কাহহার সাহেব বললেন, এখানে হযরতের আগমন আমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। পূর্ব থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল কোন শায়খের কাছে বায়আত হব। কিন্তু কোথাও মুরিদ হতে আশ্বস্তবোধ করিনি। হযরতের তাওয়াজ্জুহ আমাকে তার গোলাম বানিয়ে দিয়েছে, আমি তার বায়আত হব– একথা বলে তিনি পাগড়ী বিছিয়ে দিলেন। আমি বললাম, উপস্থিত যারা বায়আত হতে ইচ্ছুক তারা পাগড়ী ধরুন। অতঃপর সবাই পাগড়ী ধরলেন। মাহফিলের যে পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল সবাই বায়আতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। বায়আত করার পর সিলসিলায়ে নকশে বন্দীয়ার আমল ও অজীফাসমূহ বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলাম এবং কিছু সময় মুরাকাবা করালাম। এই মুরাকাবার মধ্যে আমি নিম্নের ফার্সী শে'র পড়লাম–

مومنا ذکر خدا بسیار گو
تابیابی در دو عالم آبرو

হে মুমিন! তুমি আল্লাহর যিকির কর। তাহলে উভয় জগতে সম্মান পাবে।

ذکر کن ذکرتا ترا جان است
پاکی دل ز ذکر رحمان است

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাক, যিকির কর। কেননা অন্তরের পবিত্রতা আল্লাহর যিকির দ্বারা অর্জিত হয়।

یک چشم زدن غافل از آں شہاہ نہ با شی

شاید کہ نگاہ کند آگاہ نہ باشی

চোখের এক পলক পড়ার সময় পর্যন্ত বাদশাহর স্মরণ থেকে গাফেল থেকো না। এমন যেন না হয় যে, তোমার উপর অনুগ্রহ করা হচ্ছে, অথচ এ সময় তুমি গাফেল হয়ে আছ।

ما ہرچہ خوانده ایم فراموش کرده ایم

الا حدیث یارکہ تکرار می کنیم

আমি যা কিছু পড়েছিলাম, সবকিছু ভুলে গিয়েছি। তবে ঐ বন্ধুর কথা আমি বারবার আলোচনা করছি।

এই শে'রগুলো শুনে মাহফিলের সবাই গলাকাটা মুরগীর ন্যায় ছটফট করতে লাগল। তারা এত হায়-হুতাশ করছিল যে, যে কেউ দেখলে অবাক হয়ে যেত।

মাহফিল শেষ হওয়ার পর মাওলানা আব্দুল কাহহার সাহেব আমাকে বললেন, হযরত! আপনি এখন আমার বন্ধু হাকিম জানের বাসায় অবস্থান করবেন। পাশেই দাঁড়ানো মাওলানা হাকীম জান ও মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা উভয়ে বলল, হযরত! আমরা পরামর্শ করেছি যে, আপনার মধ্য এশিয়ার সফরে আমরা আপনার সাথে থাকব।

আমি দাদা খান নূরীর দিকে তাকালাম, তিনি বললেন, খুব ভাল হবে। প্রথমে আমরা দু'জন ছিলাম, এখন আমরা চারজন হয়ে যাব। অন্যান্য লোকেরা তো এই এলাকারই ছিল। তারা আসা যাওয়া করতে লাগলেন। আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের মধ্যে সৌভাগ্যের লক্ষণ উদ্ভাসিত দেখতে পাই।

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتاہے پیش ذی شعور

হক্কানী লোকের কপালের নূর, জ্ঞানীদের সামনে কতক্ষণ পর্যন্ত গোপন থাকতে পারে? পরবর্তী সময়ে এই দুই বন্ধু দুই হীরক সাব্যস্ত হয়েছেন। যাদের সম্পর্কের কারণে কিয়ামতের দিনে আমি নাজাতের আশা রাখি।

شنیدم کہ در روز امید و بیم

بداں را بہ نیکاں بہ ببخشد کریم.

আমি শুনেছি যে, ভয় ও আশা তথা কিয়ামতের দিন বদকারদেরকে নেককারদের সাথে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা

যখন মাওলানা হাকীম জানের ঘরে পৌঁছলাম, তখন রাস্তা থেকে নিয়ে ঘরের ভিতর পর্যন্ত এক নতুন সাদা রেশমী কাপড় বিছানো ছিল। আমি বললাম, এটা কেন বিছানো হয়েছে? তিনি বললেন, আপনি এর উপর দিয়ে আসবেন বলে বিছানো হয়েছে। আমি জুতা খুলতে চাইলাম। মাওলানা হাকীম জান বললেন, হযরত আপনি জুতা পরেই চলে আসুন। আমাদের এখানে এমন ব্যক্তিত্ব আগমন করেছেন যে আমরা চায়ের পাতা বিছাতে হলেও কৃপণতা করব না।

আমি তাদের জোরাজুরিতে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই রেশমী কাপড়ের উপর দিয়ে ঘরের এক কামরায় পৌঁছলাম। ঘর অনেক সুন্দর ও প্রশস্ত ছিল। ফুল গাছ আঙ্গুরের চারা দিয়ে বাগান পূর্ণ ছিল। ফুলের ঘ্রাণ চারিদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। মনের প্রশান্তি ও আরামদায়ক কামরায় মনোরম পরিবেশ বিরাজ করছিল।

খাবারের সময় বকরীর ভুনা গোশত দেওয়া হয়েছিল। রাত হওয়ার সাথে সাথে সবাই চলে গেল। তখন মাওলানা হাকীম জান ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত আমরা আপনার হাত-পা দাবাতে চাই। অনুমতি দিয়ে ধন্য করুন। তাদের ইচ্ছা দেখে আমি অনুমতি দিলাম। কিছুক্ষণ সময় এভাবে কাটল। আমি হাকীম জানের কাছে একটি প্রশ্ন করলাম। আমি আজকে দু'তিনটি মাহফিলে শরীক হয়ে দেখলাম, এখানকার লোকেরা অধিক মাত্রায় সিলসিলায়ে আ'লীয়ায় প্রবেশ করছে। এর কারণ কি?

মাওলানা বললেন, হযরত! এক বছর আগে উজবেকিস্তানে দু'তিনজন বড় বড় মাশায়েখ সিলসিলায়ে আ'লীয়া নকশেবন্দিয়ার কাজ করতেন। কিন্তু চার মাস আগে একজন ইন্তেকাল করেন। আর এই চার মাস যাবত বড় বড় আলেমরা নিয়মিত দু'আ করছেন, যেন একজন কামেল শায়েখ মিলে যায় আর আমরা ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। হঠাৎ এই সময় আপনার আগমনকে এখানকার উলামায়ে কেরাম আল্লাহর অপূর্ব নেয়ামত মনে করছে। এই জন্য তারা আগ্রহ নিয়ে সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। আমি মনে মনে লজ্জিত হই যে, তাদের ধারণা কতইনা উত্তম! অথচ আমি কত বড় পাপী। অন্তর বলল, 'আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব-মহত্ব দেখে নাও। তার দানের ও অনুগ্রহের উপর কুরবান হয়ে যাও, যিনি দীনহীন অসহায় পাপী বান্দাকে এত সম্মান দান করেছেন।

হাকীমে কাওকানের দাওয়াত

১১ই মে ১৯৯২ ইনদাজান থেকে রওয়ানা হয়ে দিনের বারটায় 'কাওকান' পৌঁছি। আমার জন্য রাষ্ট্রীয় গেস্ট হাউজে আরাম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এত সুন্দর ব্যবস্থা ছিল যে, তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। আমার মত লোকের সাথে এত

আজীমুশ্শান ব্যবস্থার কী সম্পর্ক? কিন্তু সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার প্রচার প্রসারের জন্য হযরত খাজা সাইফুদ্দীন মুজাদ্দেদী রহ.-এর দৃষ্টান্ত সামনে ছিল। তাই চুপ থেকে সবকিছু প্রত্যক্ষ করি। নওকর ও চাকরের খেদমত, চারপাশে আরাম-আয়েশের উপকরণ। আমি এই অবস্থাকে আমার পরীক্ষা মনে করে দু'আ করতে থাকি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কোন পরীক্ষায় ফেল না। এই দিনের অস্থিরতার মত দ্বিতীয় কোন দিন জীবনে আসেনি। মানুষের সামনে কাঁদিনি, কিন্তু অন্তর যথেষ্ট কাঁদছিল। মুখে এই শে'র অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যায়–

دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں
بازارسے گزارا ہوں خریدار نہیں ہوں

দুনিয়াতে অবস্থান কর, দুনিয়ার প্রত্যাশী হয়ো না, বাজার দিয়ে অতিক্রম কর, বাজারের ক্রেতা হয়ো না।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এক প্রতিনিধি দল আসল। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে কিছু নসীহত করি। যখন তারা আমার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার কথা জানতে পারল তখন তারা খুবই প্রভাবিত হল। আমি তাদেরকে বায়আত করে লতীফায়ে কলব জারী করে দেই।

কমিউনিস্টদের কেন্দ্রীয় অফিসে

কাউকান শহরে এক আলীশান প্রাসাদ রয়েছে। যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস। হাকিমে কাওকান এই প্রাসাদে মহিলাদের প্রোগ্রাম রাখেন। তাই দাদা খান নূরী ও মাওলানা আব্দুল্লাহকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছি। সিকিউরিটির ব্যবস্থা এমন ছিল যে, যেন আমরা কোন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রবেশ করছি। স্থানীয় এক আলেম বললেন, গত সত্তর বছরের মধ্যে আপনিই প্রথম মুসলমান যিনি এই প্রাসাদে প্রবেশ করছেন। এটা কুফরী বিস্তার করার কেন্দ্রীয় অফিস ছিল। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ! এই স্থান ইসলাম প্রচার করার কেন্দ্রে পরিণত হবে। আমার জন্য বড় সমস্যা ছিল যে, এই মহিলারা ইংরেজী ভাষা বুঝে না, আর আমি তো রুশ ভাষা বুঝি না। এরপর কিছু সময় বয়ান করি, এবং দাদা খান নূরী আমার দোভাষীর কাজ করেন। বয়ান শেষে প্রায় এক ঘন্টা প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। অধিকাংশ মহিলা যেহেতু কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণার ছিল সেহেতু তাদের প্রশ্নও সেই অনুযায়ী হয়। অনেকে প্রশ্ন করল যে, ইসলামে মহিলাদেরকে সমান অধিকার দেওয়া হল না কেন?

আমি সহজ ভাবে তাদের প্রশ্নের জওয়াব দেই। সাথে সাথে তাওয়াজ্জুহ এর ধারাবাহিকতাও চলতে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ! মহিলা বলল, এখন বলুন আমরা উত্তম জীবন-যাপন কীভাবে করতে পারি? আমি সবাইকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করি। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে বায়আত হয়ে যায়। তখন এমন অবস্থা বিরাজ করছিল যে, স্থানীয় আলেমরা তা দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

যে স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস ছিল, আজ সেখানে আমি অমুসলিম লোকদেরকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে ফেলি। কোন কমিউনিস্ট কোনদিন তা কল্পনাও করে নি। এক আজিব দৃশ্য। স্থানীয় আলেমগণ বললেন, যদি সকল কমিউনিস্টরা এই অবস্থা অবলোকন করত!

تو نیز بر سر بام آکه خوش تماشائیست

তুমিও প্রাসাদে ফিরে এসে দেখ, কী উত্তম তামাশা!

মাহফিল শেষে মহিলাদের খুব উত্তম প্রতিক্রিয়া ছিল। অধিকাংশই বলল, আমাদের জানাই ছিল না যে, দীন ও দুনিয়ার জ্ঞানের অধিকারী এমন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি আমাদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হবেন।

اگر بڑھیا در پر آئے سلطان
تو اے واعظ نہ ہو ہر گز پریشان

মিম্বারের আওয়াজ মাহফিল পর্যন্ত

এশার নামাযের পর শাহী মসজিদে প্রোগ্রাম রাখা হয়। এটা উজবেকিস্তানের এমন এক মসজিদ, যার মিনার খুব উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছে। গোটা মসজিদ লোকজনে ভরপুর ছিল। ইমাম সাহেব আমাকে বললেন, আজ আপনার বোন মহিলারাও শুনবে। আমি বললাম, এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি বললেন "আমরা রেডিও স্টেশনের কর্মচারীকে দাওয়াত করে নিয়ে এসেছি। তিনি এই প্রোগ্রাম রেকর্ড করবেন। ফলে শহরে প্রায় দশ হাজার ঘরে এই প্রোগ্রাম শোনা যাবে।"

ইমাম সাহেব কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মাহফিল শুরু করলেন। আমি বয়ান করলাম। এদিকে দাদা খান নূরীর আমার বয়ান অনুবাদ করার যোগ্যতা অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনিই অত্যন্ত জোশ ও আনন্দের সাথে আমার বয়ান অনুবাদ করলেন। বয়ান শেষে এত লোক বায়আত হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেল যে, কাপড় বিছানোর অবকাশটুকু পর্যন্ত ছিল না।

আমি লাউড স্পিকারেই বায়আতের কালেমাহ পাঠ করি এবং উপস্থিত লোকজন তা পাঠ করল। মাহফিল সমাপ্তির পর লোকজন মুসাফাহ করার জন্য এত ভীড় করল যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। মসজিদ ও মাদরাসার সব বিল্ডিং লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। যখন বাইরে বের হলাম, তখন

বুঝতে পারলাম যে, ভিতরের চেয়ে বাইরে লোকজন বেশী ছিল। রোডের উপর জ্যাম সৃষ্টি হয়েছিল। আমাকে কয়েকজন আলেম বেষ্টনী দিয়ে মাহফিল থেকে বের করে নিয়ে এল। কতক লোক দূর থেকে তাদের কাপড়ের এক অংশ আমার দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল এই উদ্দেশ্যে যে, আমার শরীরে তা স্পর্শ করবে এবং তারা তাতে চুমু খাবে।

মুফতিয়ে আযম খাঁন সাহেব বললেন, হযরত! এখানে প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্যও এত মানুষকে কোনদিন আসতে দেখিনি, একথা শুনে আমি অন্তর থেকে মহান আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করলাম।

তাশখন্দে প্রত্যাবর্তন

পরের দিন তাশখন্দে ফিরে এলাম। তাবানী অফিসের সেক্রেটারী আযীযা দাদা খান নূরীর কাছে সফরের অবস্থা শুনে জিজ্ঞেস করল, এই সফরে ক'জন লোক মুরীদ হয়েছে? দাদা খান নূরী বললেন, আনুমানিক পঁচিশ হাজার লোক সিলসিলায়ে আলীয়ার অন্তভূর্ক্ত হয়েছে, তথা মুরীদ হয়েছে। এরপর যখন তাবানী গ্রুপের পরিচালক (ডাইরেক্টর) মুহাম্মদ ইয়াকুব তাবানী এই অবস্থার কথা শুনলেন, তখন তিনিও বায়আত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তিনি ১৫ মে ১৯৯২ শুক্রবার মুরীদ হয়ে সিলসিলায়ে আলীয়ার অন্তভূর্ক্ত হলেন। আমার ইচ্ছা ছিল তাশখন্দে কয়েকদিন অবস্থান করে কিছু কাজ করব। জনাব আব্বাস খানের মাধ্যমে উজবেকিস্তানের রেডিওতে আমার তেলাওয়াত ও কিছু বয়ান প্রচার করা হলো। স্থানীয় পত্রিকার কিছু সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আসল। তারা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় খুব আকর্ষণীয় করে আমার সফরের বিস্তারিত বিবরণ ছাপিয়ে দিল। আমার ধারণা সফরের এই বিস্তারিত বিবরণ তারা দাদা খান নূরী থেকে সংগ্রহ করেছে।

তাশখন্দের উর্দূ স্কুল

তাশখন্দে এক উর্দূ স্কুল রয়েছে যার নাম্বার ১৫৬ N। এখানে বাচ্চাদের উর্দূ শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের প্রিন্সিপাল আমার খোঁজে একদিন সিয়াহত হোটেলে এসে হাজির হলেন। তিনি আমাকে বললেন, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আপনার ব্যাপারে পড়েছি এবং আপনার বয়ানও পড়েছি। আপনি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করুন এবং স্কুলের ছাত্রদেরকে কিছু নসীহত করে বাধিত করুন। আমি বললাম, যে সময় আপনাদের সুবিধা হবে আমি সেই সময় গিয়ে উপস্থিত হব। অতঃপর ১৬ মে দাদা খান নূরীর সাথে স্কুলে এসে উপস্থিত হলাম।

স্কুলের প্রিন্সিপালসহ অন্যান্য স্টাফদেরকে স্কুলের গেইটে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। স্কুলের ছাত্ররা আমাদেরকে লক্ষ্য করে অভ্যর্থনামূলক কবিতা আবৃত্তি করল। উত্তরে আমি কৃতজ্ঞতা জানালাম। ছাত্ররা প্রায় আধা ঘন্টা

সময় আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করল। এরপর তারা দু'ঘন্টাব্যাপী গল্প, কবিতা, তারানা ইত্যাদি শোনাল। আমি আমার বক্তৃতায় পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা, ইসলাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলাম। বিশেষত ইসলামী ইতিহাসের ছোটদের কিছু ঘটনাবলি শুনালাম, যেগুলো শুনে তারা খুবই আনন্দ পেল ও প্রভাবিত হল। স্টাফগণ মন্তব্য পেশ করল যে, বাচ্চাদের বিষয়ে এত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা জীবনে প্রথম শুনলাম। ইতোপূর্বে কোনদিন শোনার সুযোগ হয়নি। তারা আমাদের সামনে রকমারী খাবার পরিবেশন করল। খানা শেষে প্রিন্সিপাল আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক পরামর্শ দিলেন যে, আপনি পাকিস্তানের কোন একটি স্কুলের কথা বলুন আমরা তাদের সাথে আমাদের তা'লীমি সম্পর্ক স্থাপন করব। প্রতি বৎসর তারা আমাদের স্কুলে দু'জন ছাত্র পাঠাবে এবং আমরা তাদের স্কুলে দু'জন ছাত্র পাঠাব। ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। পরিশেষে ছাত্ররা আমাকে একটি ফুলের মালা হাদিয়া দিল। আমি দাদা খান নূরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? সে বলল, ফুলের মালা। আমি বললাম। কশ্মিনকালেও নয়। এতো বিজয়ের মালা। দাদা খান নূরী তা শুনে এত উৎফুল্ল হলেন যে, তিনি আমাকে বললেন, হযরত! এখনই আমার ঘরে তাশরীফ নিন। পোলাও তৈরি হয়েছে। খাবারের পর হোটেলে নিয়ে যাব। আমি বললাম, যদি আপনি প্রথম থেকেই খাবার খাওয়ানোর ইচ্ছা করে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে কষ্ট দিব না।

আযান দেওয়ার নির্দেশ

তাশখন্দের এক মহল্লার নাম মির্যা গালিব মহল্লা। মহল্লায় যাওয়ার পথে একটি সড়ক রয়েছে। সড়কের নাম "মির্যা আসাদুল্লাহ খান গালিব সড়ক।" সড়কের সাথেই দু'টি মহল্লা একটির নাম আল বিরুনী মহল্লা, অপরটির নাম ইব্রাহিম মহল্লা। মীর্যা গালিব যেহেতু উজবেকী ছিলেন, সেহেতু লোকজন তার স্মরণার্থে তার নামে মসজিদ মহল্লার নাম রেখেছে। মির্যা গালিব কবিতার জগতে এক অনন্য নাম। তিনি যোগ্যতা ও পারদর্শিতায় যে অবদান রেখেছেন, তা যদি ধর্মের রঙ্গে রঙ্গীন হতো তাহলে আরও অধিক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করত। তিনি নিজেই বলেন–

یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب

تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

মির্যা গালিবের দু'টি কবিতার দু'টি পংক্তি আমার খুবই পছন্দ। আমি আমার কথোপকথন ও বিভিন্ন বয়ানে পংক্তি দু'টি প্রায়ই আবৃত্তি করে থাকি। একটি পংক্তি আল্লাহর ইশক ও মহব্বত সংক্রান্ত। যেমন-

نہ تو ھجر ھے اچھا نہ وصال اچھا ھے
یار جس حال میں رکھے وھی حال اچھاھے

দ্বিতীয় পংক্তিটি মুরাকাবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, যা নকশবন্দীয়া তরীকার মাশায়েখদের খুবই প্রিয়। যেমন–

جی ڈھونڈتاھے پھر وھی فرصت کے رات دن
بیٹھے رھیں تصور جاناں کئے ھوئے

মির্যা গালিব মহল্লা তাশখন্দ ইউনিভার্সিটির অদূরেই একটি প্রশস্ত ও মনোরম পরিবেশে অবস্থিত।

দাদা খান নূরী আমাকে এই এলাকা সম্পর্কে অবগত করলেন। সাথে একথাও বললেন যে, এই মহল্লার সর্দার আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, সে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করছে। এবং মসজিদের নাম রেখেছে মির্যা গালিব মসজিদ। আব্বাস পাশেই বসে এই আলোচনা শুনছিল, সে মহল্লার সর্দার উবায়দুল্লাহ জানকে ফোন করল। মহল্লার সর্দার তাকে বলল মসজিদের ইমারতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা মসজিদে নামায শুরু করতে যাচ্ছি। কিন্তু মহল্লার লোকদের জোর দাবী হচ্ছে এই মসজিদের সর্বপ্রথম জুমআর নামাযের খুতবা কোন কামেল বুযুর্গ লোক দ্বারা দেওয়াতে হবে। আব্বাস খান বলল, তাহলে তো খুবই ভালো হয়েছে আমাদের কাছে পাকিস্তান থেকে এক কামেল বুযুর্গ ব্যক্তি তাশরীফ এনেছেন। তার দ্বারাই এ কাজ সমাধা করা যাবে। সুতরাং জুমআর নামাযের প্রোগ্রাম এভাবেই করা হল। অতঃপর জুমআর দিন দাদা খান নূরী ও আব্বাস খানের সাথে মির্যা গালিব মহল্লায় গেলাম। মসজিদ খুবই প্রশস্ত ও আলীশান করে তৈরি করা হয়েছিল।

মহল্লার সর্দার উবায়দুল্লাহ জানের সাথে সাক্ষাৎ হল। তাকে খুবই আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল। কারণ তাদের মহল্লায় আজ আযান দেওয়া হবে এবং প্রথমবার আল্লাহ তাআলার নাম বুলন্দ করা হবে। তারা আমাকে দেখেই বলতে লাগলেন আজ আমাদের মহল্লার মসজিদের প্রথম আযান আপনি দিবেন। জুমআর প্রথম খুতবা ও নামাযের প্রথম ইমামতি আপনিই করবেন। শুধু তাই নয় নামায শেষে আমাদের ঘরে খাবারের পর মহল্লাবাসীর সাথে একত্রিত হবেন।

ওযু করে মসজিদে প্রবেশ করে আমি আযান দিতে শুরু করলাম। দেখা গেল আযান শুনে পাশের ঘরগুলো থেকে ছোট ছোট বাচ্চা, মহিলা ও পুরুষেরা দৌড়ে মসজিদের দিকে আসছে। পুরুষেরা মসজিদে প্রবেশ করল আর মহিলারা মসজিদের দরজা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল।

কেউ হাত উঠিয়ে দু'আ করছে, কেউবা আকাশের পানে মুখ উঠিয়ে নিজের হাত বুকে রাখছে। উবায়দুল্লাহ জান বললেন, এ সমস্ত মহিলা নিজেদের জান উৎসর্গ করে বলছে যে, আমরা জীবনে এই মহল্লায় এই সর্বপ্রথম সুমধুর কণ্ঠের আযান শুনতে পাচ্ছি। আমি জুমআর বয়ান উর্দূ ভাষায় করলাম, আর দাদা খান নূরী অনুবাদ করলেন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় আযানের পর জুমআর খুতবা আরম্ভ করলাম তখন মুসল্লীদের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের প্রভাব পড়ল। অনেকে তো আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে শুরু করে দিল। জুমআর নামাযের পর যখন মসজিদ থেকে বের হলাম তখন মহিলাদের বিরাট ভীড় দেখতে পেলাম। মহল্লার সর্দার বললেন, এসব মহিলা আপনার দু'আ নেয়ার জন্য একত্রিত হয়েছে। আমি হাত উঠিয়ে তাদের জন্য দু'আ করলাম। উপস্থিত লোকদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে চোখ থেকে ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরছিল।

আমি একথা চিন্তা করে আনন্দিত হলাম যে, যতদিন পর্যন্ত এই মসজিদে নামায হবে ততদিন পর্যন্ত আমার আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে।

ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

এই সৌভাগ্য চেষ্টা তদবীর বা বাহুবলের দ্বারা অর্জিত হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে দান করেন।

দু'আ থেকে ফারেগ হওয়ার পর মহল্লার সর্দার সকল মেহমানকে নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে নিয়ে গেল। বাড়ীটি দেখতে মহল্লার অপরাপর বাড়ীর মতই মনে হচ্ছিল, তবে দেওয়ালগুলো কিছুটা উঁচু ছিল, যার মধ্যে আঙ্গুরের গাছ ঝুলছে। ভিতরে প্রবেশ করেই বাড়ীর সামনে বিরাট বাগান দেখতে পেলাম, যাতে আপেল, নাশপাতি, বাদাম, লুবান ইত্যাদির গাছ ছিল। বাগানের তিন দিকে একটি সুরম্য বিল্ডিং ছিল, যার মধ্যে বড় বড় আরামদায়ক কামরা ছিল, ওবায়দুল্লাহ জান দরজার পাশেই এক সুন্দর আলীশ্যান কামরায় নিয়ে গেল। কামরার দেওয়ালের মধ্যে কারুকার্যপূর্ণ অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস রাখা ছিল এবং নিচে খুব দামী কার্পেট বিছানো ছিল। এই ধরনের কাজের মধ্যে উজবেকী লোকজন এত বেশী যোগ্যতা রাখে যে, ইতোপূর্বে আমি কোথাও এত সুন্দর কারুকাজ দেখিনি। মেহমানখানায় এক লম্বা দস্তরখানা বিছানো ছিল, যার উপর শুকনো ফল রাখা ছিল।

যখন আমরা দস্তরখানায় খেতে বসলাম, তখন উবায়দুল্লাহ জান রুটি টুকরো করে দস্তরখানার উপর রাখল। সাথে শুরবা ভর্তি কয়েকটি পিয়ালাও রাখল, যাতে গোশতও ছিল, তা মূলত এক জাতীয় তরকারী। রুটি, শরবত খেতে না খেতেই পোলাও এসে গেল। খাওয়ার সাথে উজবেকী লোকজন সবুজ চা এমনভাবে পান

করে যেমনভাবে আমরা ঠাণ্ডা পানি পান করি। খানা শেষে যখন উঠার অনুমতি চাইলাম, তখন উবায়দুল্লাহ জান আমাকে খুব সুন্দর একটি উজবেকী কোট পরিধান করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমাদের এখানে মেহমানের সম্মান প্রদর্শন এভাবেই করা হয়। আমি অন্তর থেকে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এ রকম সম্মান প্রদর্শন করল। তুমি তাকে ইনসানিয়াতের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। আর তা তো আপনি কুরআন মাজিদে স্বয়ং বর্ণনা করেছেন (وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ) (আর পরহেজগারীর পোশাক সবচেয়ে উত্তম পোশাক।)

আংগিরীনে সফর

১৬ই মে শনিবার ওয়াদা অনুযায়ী মাওলানা আব্দুল্লাহ সিয়াহত হোটেলে এলেন, তার সাথে তার এক বন্ধু উম্মত আলীও ছিলেন। উম্মত আলী এক শায়খের ছেলে, যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা লাভ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি চেহারাকে সুন্নত দ্বারা সুশোভিত করেছেন। সুন্দর চেহারায় সুন্নতী দাড়ি খুব ভালো দেখা যাচ্ছিল। পরস্পরে পরিচয় শেষে কিছু কথাবার্তা হলো। আমি বললাম, আমি এখানে তিনদিন অবস্থান করব। তারপর বুখারা-সমরকন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। উম্মত আলী ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, যদি আমি তার বাসায় অবস্থান করি তাহলে অদূরেই পাহাড়ী এলাকা সফর করাবে, যা দেখার জন্য মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসে।

মাওলানা আব্দুল্লাহ আমাকে বললেন 'হে সাইয়্যিদী! আপনি তার দাওয়াত কবুল করুন। আমি রাজী হয়ে গেলাম। সাথে সাথে নিজেদের মালামাল গুছিয়ে আংগিরীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। অর্ধেক সফর রেলগাড়ীতে করলাম এবং বাকী সফর করলাম বাসে। বাসের সফর অত্যন্ত আরামদায়ক ছিল। যখন বাসের সিটে বসলাম তখন আমার সামনের সিটে এক উজবেকী মেয়ে বসা ছিল। বাস চলার পর সে আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। মাওলানা আব্দুল্লাহ খান তাকে বলল, আপনি বসে যান। প্রায় আধাঘন্টা যাবত দাঁড়িয়ে আছেন। এখনও এক ঘন্টার সফর বাকী রয়েছে। মেয়েটি বলল, আমি এই সম্মানিত মেহমানের চেহারা দেখছি। ফলে আমার আল্লাহর কথা বারবার স্মরণ হচ্ছে। আমি এক ঘন্টার চেয়েও বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারব। আমি শুনে মনে মনে দু'আ করতে লাগলাম, হে আল্লাহ! আমার বাহ্যিক চেহারা দেখে লোকদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। অতএব আপনি হাশরের মাঠে ঐ সমস্ত লোকদের দলে আমার হাশর করাবেন। আংগিরীন শহর থেকে তাশখন্দ পর্যন্ত ষোল কিঃমিঃ দূরত্ব। তার পাশেই কয়লার খনি রয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় বড় কারখানাও রয়েছে। এগুলো দেখলে মনে হয়, প্রত্যেকটা কারখানাই এক একটি জনবসতি। এই শহরের অধিকাংশ জনগন কমিউনিস্ট। শহরের রাস্তাগুলো প্রত্যেকটা রানওয়ের মত প্রশস্ত ও সমতল। চারদিকে সবুজের সমারোহ। ফুল

আর ফুল। অট্টালিকাগুলো খুবই মনোরম। হায়! এই লোকগুলো যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতো এবং দুনিয়াবী নিয়ামতরাজির পাশাপাশি ঈমানের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হতো তাহলে কতই না উত্তম হতো।

উম্মত আলী বললেন, শহরে দশটি মসজিদ রয়েছে। কিন্তু জামে মসজিদ একটিই। জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব নিজেই কাদেরিয়া তরীকার একজন শায়খ। খানা শেষে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্য বের হয়। বের হয়ে বুঝলাম বৃষ্টি হয়েছে। গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির পানি এখনও ঝরে পড়ছে। আকাশের অবস্থা এখনও ভালো হয়নি। পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া অসম্ভব ছিল। কিছুক্ষণ পরেই একটি গাড়ী পাশে এসে থামল। ড্রাইভিং সিটে বসা ছিল এক যুবক এবং এক মহিলা ছোট একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে পিছনের সিটে বসা ছিল। যুবকটি উম্মত আলীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনার সাথে এই মেহমান কে? উম্মত আলী যখন আমার পরিচয় দিল, তখন মহিলাটা বলল, আমরা আপনাদেরকে গাড়ী দিয়ে মসজিদ পর্যন্ত পৌছিয়ে দিলে কেমন হয়? আমি এটাকে আল্লাহর সাহায্য মনে করে মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম। মহিলাটি সামনের সিটে বসল, আর পিছনের সিটে আমরা তিনজন বসলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মসজিদে পৌঁছে গেলাম। আমি বললাম, সর্বপ্রথম আমরা ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করব। ইমাম সাহেবের দরজার সামনে যেতেই তিনি হাতের দ্বারা ইশারা করে বললেন, আপনারা মসজিদে চলে যান। মসজিদে এসে দেখলাম, এখন পর্যন্ত কোন মুসল্লী মসজিদে আসেনি। মাগরিবের নামাযের আযান হতেই দশ পনের জন লোক এসে সমবেত হল। উম্মত আলীর ইচ্ছা ছিল নামায শেষে ইমাম সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু ইমাম সাহেব নামায শেষে মুসল্লীদের সাথে কথোপকথন করতে করতে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন।

দু'একজন লোক উম্মত আলীর কাছে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে ইমাম সাহেব তাদেরকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি উম্মত আলীর পেরেশানী দেখে বললাম, কী ব্যাপার, এত পেরেশান কেন? তিনি বললেন, এই আলেম আপনাকে দেখে খুশী হননি এবং আপনি মুসল্লীদের সাথে পরিচিত হন তিনি তা চান না। মসজিদে বয়ান করা তো আকাশকুসুম কল্পনা। আমি বললাম কোন চিন্তা নেই। নিসবতে শরীফা নিজেই তার রাস্তা বের করে নেবে। উম্মত আলী মসজিদের বাইরে ইমাম সাহেবকে মুসল্লীদের সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত দেখতে পেলেন। উম্মত আলীকে দেখে তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথে কে? তিনি বললেন, তিনি নকশবন্দীয়া সিলসিলার এক শায়খ। ইমাম সাহেব বললেন,

আমরা তো কাদেরিয়া তরীকার। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এই লোক তুর্কী ভাষায় কথা বলতে পারে কি না? উম্মত আলী বললেন, না। ইমাম সাহেব বললেন, তাহলে আমরা তার কথা কিভাবে বুঝব। বসে অযথা সময় নষ্ট করতে চাই না।

উম্মত আলী বললেন, আমাদের উজবেকী লোকদের মাঝে মেহমানের সম্মান করা হয়। কিন্তু আজ আমার খুবই লজ্জা হচ্ছে যে, মেহমান মসজিদে বসা আর মেজবান বাইরে খোশগল্পে লিপ্ত। একথা শুনে দুই যুবক অল্প সময়ের জন্য বয়ান শুনতে রাজী হয়ে গেল। ইমাম সাহেব তাদেরকে বললেন, যাও। তবে দ্রুত আসবে। দুই যুবক ভিতরে প্রবেশ করে আমার কাছে বসল। আমি তাদেরকে সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়া সম্পর্কে কিছু বয়ান করতে লাগলাম। অল্পক্ষণ পরই একের পর এক সবাই ভেতরে প্রবেশ করল। ইমাম সাহেব একা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। দীর্ঘক্ষণ পর কাউকে বের না হতে দেখে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য যখন তিনি আমার কাছে এসে বসলেন। তখন আমি সিলসিলায়ে নকশেবন্দীয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান করছিলাম। মাওলানা আব্দুল্লাহ অনুবাদ করছিলেন। ইমাম সাহেব আমার বয়ান শোনার পর তার মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। মাহফিলের শেষে আমি বললাম সবাই মুরাকাবা করুন। মুরাকাবার সময় ইমাম সাহেবের উপর তাওয়াজ্জুহ এমনভাবে পড়ল যে তিনি কাঁপছিলেন। মুরাকাবা শেষে ইমাম সাহেব বললেন, আমি এই তরীকা শিক্ষা লাভ করব। আমি বললাম, এর জন্য বায়আত হওয়া জরুরী। ইমাম সাহেব বললেন, যদিও আমি একজন পীর। তবু আজ আমার অন্তর আমাকে তিরস্কার করছে যে, আজ তোমার ঘরে নিয়ামত মিলেছে। সুতরাং তা থেকে তুমি বঞ্চিত হয়ো না। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন এবং আপনার মুরীদীনদের জামাতের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। অতঃপর মসজিদে সমবেত সকল লোক সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়া তরীকায় মুরীদ হয়ে গেল। এশার নামাযের পর আমি তাদেরকে দ্বিতীয় মুরাকাবা করালাম। দু'আ শেষে যখন আমি চলে আসতে লাগলাম তখন ইমাম সাহেব আমার লাঠি উঠিয়ে দিলেন এবং সামনে চলতে লাগলেন।

মসজিদের দরজায় এসে আমাকে তার বাসায় যেতে এবং খানা খেতে অনুরোধ করলেন। উম্মত আলী এই দাওয়াত কবুল করে ফেললেন। অতঃপর আমরা ইমাম সাহেবের বাসায় চলে গেলাম। ইমাম সাহেবের ছেলে হাফেজে কুরআন ছিল। সে আমাকে দেখে বায়আত হওয়ার তামান্না করল। আমি বাসার সবাইকে বায়আত করলাম। আসার সময় ইমাম সাহেব আমার লাঠিতে চুমু খেতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন আজ আমার দ্বারা আপনার সাথে বেআদবী হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আর এই মসজিদকে আপনার মসজিদ মনে করবেন।

তার ছেলেকে আমাদের বাসা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। উম্মত আলী বাসায় এসে হাত জোর করে ক্ষমা চাইতে লাগলেন, হযরত! আমি আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে পারিনি। আমি বললাম, তাতে তোমার কী অপরাধ? ইমাম সাহেব প্রথমে উদাসীনতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু নিসবতে শরীফা তাদেরকে বরকত থেকে বঞ্চিত হতে দেয়নি। ফলে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে।

মাওলানা আব্দুল্লাহ খান আনন্দে নেচে উঠলেন। তিনি বললেন, "হে সাইয়্যেদী! আপনার কাছে আসল সম্পদ রয়েছে। যেখানেই যাবেন মালের খরীদদার মিলবেই।

উম্মত আলী যখন বাসার ভিতরে গিয়ে মহিলাদেরকে মসজিদের কারগুজারী শুনলেন। তার স্ত্রী বায়আত হওয়ার জন্য পয়গাম পাঠালো। আমি তাদেরকে বায়আত করে সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার মুরীদ করে নিলাম। উম্মত আলীর ছেলে মুহাম্মদ উসমান তার খুব প্রিয় সন্তান ছিল। আমি বললাম, আজ থেকে আমি তোমাকে আবু উসমান বলে ডাকব। আলহামদুলিল্লাহ! এই নাম এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আজ মধ্য এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের মুসলমান তাকে মাওলানা আবু উসমান বলে স্মরণ করে।

সায়ী জাবালানের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য

১৭ই মে রবিবার মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু ওসমান নিকটবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলগুলো সফর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। বললেন, বিকালের দিকে ফিরে আসব। আমি বললাম, খুব ভাল। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. এর জলধারা, সমতল ভূমি ও শ্যামলিমা খুবই পছন্দনীয় ছিল। আমিও রাসূল সা. এর সুন্নতের নিয়তে ঐ সমস্ত দর্শনীয় স্থানে বসে আল্লাহর জিকির করব।

একটি গাড়ীতে চড়ে আমরা পাঁচজন আংগিরীন থেকে সায়ী জাবালানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কয়েক কিঃমিঃ যাওয়ার পর অনুভব করলাম মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমান পিছনে বসে ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বলছেন। আমি বললাম, কী ব্যাপার?

মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত! আবু উসমান বাসায় রকমারি খাবার তৈরি করেছিল। কিন্তু ভুলবশতঃ তা সাথে আনা হয়নি। আজ পুরো দিন অনাহারে কষ্ট করতে হবে। তার চেয়ে ভাল হবে ফিরে গিয়ে খাবারগুলো সাথে নিয়ে আসি।

আমি বললাম, মাওলানা! আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করা আল্লাহ তাআলার জিম্মায়। ইনশাআল্লাহ! আমরা বাসায় ফিরে এসে খাবার খাব।

মাওলানা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেখানে কী খাব? আমি বললাম–

کار ساز ما بفکر کار ما
فکرما در کارما ازارما

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের কাজ নিয়ে চিন্তিত। আমরা চিন্তা করলে তো শুধু দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে।

মাওলানা এই শে'র শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন হযরত! তবে আজ অনেক মুজাহাদা হবে। আমি বললাম, মাওলানা! আমরা মান্না-সালওয়ার ফকীর। আজ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার রহমতের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন। এখনও তিনিই খাবারের ব্যবস্থা করবেন।

মাওলানা আমার কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন বটে, কিন্তু চেহারায় পেরেশানীর ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। দিনের ১১টায় আমরা একটি পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ায় উঠলাম। চারদিকে উচু-উচু গাছ এবং শুধু ফুল আর ফুলের সমারোহ দেখে মনে হয়, কেউ নিজে হাত দিয়ে ফুলগুলো ঝুলিয়ে রেখেছে। দৃশ্য এত মনোমুগ্ধকর ও সুন্দর যে, মনে হয় কেউ কাগজে এঁকে রেখেছে। প্রবাহিত ঝরনাসমূহ এবং তৃণভূমি পরিবেশকে মনের মত করে সাজিয়ে রেখেছে। তাছাড়া সুগন্ধময় পরিবেশ মনকে আন্দোলিত করে তুলল। মাওলানা আব্দুল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হযরত! এখানকার দৃশ্য কেমন মনে হল? হযরত এখানে কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার জন্য তাঁবু তৈরি করা আছে। আমরা একটি তাঁবু ভাড়া নিতে পারি।" সামনে এগিয়ে দেখলাম। রেস্টুরেন্ট ও সরকারী রেস্টহাউসও আছে। খেলার জন্য একটি সমতল মাঠও রয়েছে। পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য তাবু তৈরি করা আছে।

আমি দু'টি তাবুর দরজা খুলে দেখলাম, মদের দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। প্রত্যেকটি তাবুই নোংরা। মাওলানা বললেন, হযরত! পর্যটকরা এখানে বিনোদন ও আনন্দ-উল্লাস করতে আসে। রেস্টুরেন্টের নিচেই যুবতীদের পাওয়া যায়, যাদেরকে নিয়ে পর্যটকরা এখানে সময় কাটায়। সত্য কথা হল– এখানে একটি তাবুও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। আমি বললাম, আমাদের পরওয়ারদেগার অবশ্যই আমাদের জন্য রাস্তা বের করে দেবেন। বলতে বলতেই এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে বলল, আপনাদের কোন তাবুর প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া জরুরী। সে বলল, কিছুক্ষণ পূর্বে একটি নতুন তাবু তৈরি করা হয়েছে। আপনাদেরকে সেটা দেওয়া হবে।

আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি নতুন তাবু তৈরি আছে। সাথে সাথে আমরা তাবুর ভাড়া দিয়ে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম, যিনি আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন। আমরা সেখানে বসে যিকরে-ক্বালবী সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, এই মুহূর্তে এক ব্যক্তি ভূনা গোশত

নিয়ে হাজির হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী উদ্দেশ্যে? সে বলল, হযরত আমি উপরের একটি বাসায় বসবাস করি, আমার স্ত্রী একটি বকরীর গোশত ভূনা করেছিল। সে আপনাদেরকে দেখে আমাকে বলল, এই গোশত মেহমানদেরকে দিয়ে আসুন। আপনি আমাদের মেজবানী কবুল করুন। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমানের চিন্তিত চেহারার দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখলেন তো আমরা রুটি, মান্না ও সালওয়া খাওয়ার ফকীর।

মাওলানা বললেন "আপনি সত্যিই বলেছেন সেই মহান সত্তা পূঁত-পবিত্র, যিনি ফকিরদেরকে বারবার তার নিয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন।"

আমার কুরআন মজীদের এই আয়াত স্মরণ হয়ে গেল–

فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে?

অল্প সময়ের মধ্যে অনেক লোক সাক্ষাৎ করার জন্য একত্রিত হয়ে গেল, তাদের সাথে কথা বলে আমার বুঝে আসল যে, এই এলাকায় অতীতে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও বুর্যুগানে দীন বসবাস করেছেন। এই এলাকার অধিকারী মাওলানা রফীউদ্দীন চল্লিশ বছর যাবত বুখারার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন।

এখানকার আলেমদেরকে কমিউনিস্টরা বিপ্লবের সময় বন্দী করে তাদেরকে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। তাঁদের সন্তানরা বর্তমানে পাশেই এক জনপদে বসবাস করছে। স্বাধীনতার পর তারা দীনদার হয়ে গেছে। আমরা কথা বলার সময় এক ব্যক্তি শুরবা ভর্তি পিয়ালা নিয়ে এল। সাথে এলাকার সুস্বাদু দইও ছিল। আমাদের খুবই ক্ষুধা পেয়েছিল, তাই আমরা পেট ভরে খেয়ে নিলাম। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমানকে বললাম, আপনারা ضيوف الرحمن আল্লাহর মেহমান। তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিন এবং তার গুণকীর্তন করুন ও শুকরিয়া আদায় করুন।

খানা শেষে নামায আদায় করে কিছু সময় কায়লুলা করে নিলাম। অতঃপর দৃশ্যাবলী দেখার জন্য বাইরে বের হলাম। মাওলানা আব্দুল্লাহ ঝরনাগুলো দেখালেন, ঝরনা দেখে খুবই আনন্দ উপভোগ করলাম। তাছাড়াও কুয়ার পানি, প্রবাহিত ঝরনা, পাহাড়ের গায়ে আকাঁ বাঁকা করে কাটা সিঁড়ি এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য। আমি সিঁড়ি থেকে নিচে নেমে এসে দেখলাম, একটি সমতল ভূমি যার দু'পাশ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি সাথীদের নিয়ে সেই সমতল ভূমিতে বসে পড়লাম। পানির কলকল ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর যিকির শুরু করে দিলাম। মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমানও আমার সাথে শরীক হল। এত পুলক ও স্বাদ অনুভব হচ্ছিল যে, আজও সেই মুহূর্তটি স্মরণীয় হয়ে আছে। এক ঘন্টা

সেখানে বসে উপরের একটি ভূমির দিকে আসলাম। এখানে এসে আমি একটি রুমাল বিছিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়লাম। সাথে সাথে সবাই বসে পড়ল, আমি ওয়াজ ও নসীহত করতে লাগলাম তা দেখে স্থানীয় লোকজনও এসে মাহফিলে শরীক হলো।

মদপানকারী যুবকদের তওবা

এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল, কয়েকজন যুবক রেস্টুরেন্টে বসে মদপান করছে। তারা আনন্দ উল্লাস করার যাবতীয় ব্যাবস্থা করেছে। কিছুক্ষণ পরই তারা তাবুতে প্রবেশ করবে। আমি তাঁকে বললাম, তাদেরকেও আমাদের কাছে নিয়ে আসুন।

আল্লাহ তাআলার কুদরত! যখন এই লোক তাদেরকে বলল, তোমাদেরকে এক শায়খ ডাকছেন, একথা শুনে তারা এত প্রভাবিত হয়ে পড়ল যে, আমার কাছে চলে আসল। মূলতঃ তারা মদপান করেছিল। তবে তখনও নেশাগ্রস্ত হয়নি। হেলে দুলে পড়েনি।

আমার অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত এত প্রবল ছিল যে, আমার অন্তর চাচ্ছিল এই যুবকদের অন্তরে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করি, যেন তারা ইশকে মাজাযী থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ইশকে হাকীকীর মধ্যে জীবন পরিচালিত করে। আমি তাদের সামনে কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করি। সেই তেলাওয়াত তাদের অন্তরে গেঁথে যায়। যখন আমি তাদেরকে বললাম, পাপাচারের জীবন পরিত্যাগ করে ভাল ও কল্যাণকর জীবন গ্রহণ কর। তারা সকলই সম্মতি জ্ঞাপন করল। মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত! তারা সত্যিকারার্থে তওবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমি এই পনেরজন মদপানকারী যুবককে বায়আত করলাম এবং মুরাকাবা ও যিকিরের পদ্ধতি বলে দিলাম। তাদের লতীফায়ে ক্বলব জারী করে দিলাম এবং বললাম এখান থেকে সোজা বাড়ীর দিকে চলে যাও।

তখন তারা তাদের গাড়ীর দিকে চলে গেল এবং সেখান থেকে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করল। মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত! এতো আপনার কারামত বৈ আর কিছু নয়। কারণ তারা এক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেদের অন্যায় বিনোদন ও মদপান থেকে তওবা করে, পাপাচারের জীবন ত্যাগ করে ভালো ও কল্যাণকর জীবন গ্রহণ করেছে। আমি বললাম, নেশা পান করিয়ে মাতাল বানাতে সবাই পারে। আনন্দ তো তখন যখন নেশা পানকারী তওবা করে নেশা ত্যাগ করে।

রাস্তার অবরোধ

যখন মদপানকারী যুবকদের তওবার সংবাদ সরকারী রেস্ট হাউজের ইনচার্জ শুনলেন, তখন তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চলে এলেন এবং বললেন,

আপনি আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত কবুল করুন। দাওয়াত কবুল করার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু যখন তিনি বললেন, হযরত! আমাদের জীবন এখানেই কাটিয়েছি। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত আমরা মানুষকে গোনাহ করতে দেখি আর চিন্তা করি পৃথিবীর এই অংশটি কেন অন্ধকার হয়ে যায় না? আল্লাহর শুকরিয়া আজ আপনি এখানে আগমন করে মুরাকাবা ও জিকির করেছেন। তাছাড়াও এখানে পনেরজন যুবকের মদপান ও যিনা করা থেকে তওবা করার ঘটনা আমাদের জন্য বিরাট পাওয়া। আমরা আপনার যাওয়ার রাস্তায় শুয়ে থাকব, এখন আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের বুকে পা রেখে চলে যেতে পারেন। আর না হয় আমাদের দাওয়াত কবুল করে আমাদের খুশী করবেন। আমি বললাম আপনার কথা বলার ভঙ্গি তো খুবই চমৎকার। তিনি বললেন, জ্বী, হযরত! আপনার অন্তরের ভালবাসা লাভের জন্য। উপস্থিত সবাই খিলখিলিয়ে হাসলেন।

অতঃপর আমরা রেস্টহাউজে গিয়ে দেখলাম, এমন ধরনের রকমারী খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে যেন কোন সাম্রাজ্যের সম্রাট এখানে আগমন করেছে। ভূনা গোশত, শুরবা, পোলাও, পাকানো গোশত, ফল ইত্যাদি সব রকমের খাবার মজুদ ছিল। আবু উসমান খাবার খাওয়ার সময় সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলছেন। আমি বললাম, যদি বাসার পাকানো খাবার নিয়ে আসতেন তাহলে এগুলো কিছুই পাওয়া যেত না। যেহেতু আল্লাহ তাআলার উপর ভাসা করেছেন সেহেতু লক্ষ্য করুন আল্লাহ তাআলা কত নিয়ামত খাইয়েছেন।

খানা শেষে ফিরে আসতে চাইলাম। তখন স্থানীয় লোকজন তাদের ঠিকানা লিখে দিল আমার ঠিকানাও লিখে রাখল। তারা আবেদন করল, হযরত আগামীতে যখন আসবেন, তখন আমাদের এখানে অবশ্যই তাশরীফ আনবেন।

আমরা রওয়ানা করে রাস্তার এক-তৃতীয়াংশ পৌঁছে দেখি রাস্তায় ট্রাফিক দাঁড়িয়ে আছে। মাওলানা আব্দুল্লাহ গাড়ী থেকে নেমে জানতে পারলেন যে, একটি উঁচু পাহাড়ের কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে, মূলত এই রাস্তাটি পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে, রাস্তার এক পাশে প্রায় সত্তর ফুট নিচে সমুদ্র প্রবাহিত, অপর পাশে পাহাড়ী প্রান্তর ছিল। মাওলানা আব্দুল্লাহ পাহাড়ের বড় বড় অংশ দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি এসে বললেন, রাস্তা পুরোটাই বন্ধ হয়ে আছে, খোলার কোন উপায় নজরে আসছে না। একথা শুনে আমরা সবাই বাইরে এসে দেখি, বালির টিলার ন্যায় উঁচু-উঁচু বড় বড় পাহাড়ের অংশে রাস্তা ভরপুর হয়ে আছে। এমনকি পথচারীদের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়াও দুঃসাধ্য।

ইতি উতি করে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। ইতোমধ্যে এক পুলিশের সাথে সাক্ষাৎ হল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই রাস্তা কখন পরিষ্কার হবে?

সে বলল, আমরা ক্রেন ও বুলডোজার আনতে পাঠিয়েছি, রাস্তা পরিষ্কার হতে আনুমানিক এক সপ্তাহ সময় লাগবে। একথা শুনে মাওলানা আব্দুল্লাহ অত্যন্ত পেরেশান হয়ে বলতে লাগলেন, গাড়ীর ড্রাইভারের দ্রুত বাড়ীতে যাওয়া জরুরী। সে এক সপ্তাহ এখানে অপেক্ষা করবে কীভাবে? আমি বললাম, এখান থেকে আংগিরীন যাওয়ার দ্বিতীয় কোন রাস্তা আছে কি না? ড্রাইভার বলল, দ্বিতীয় একটি রাস্তা আছে। তবে ১০০ কিঃমিঃ দূর হবে। আমি সাথীদেরকে বললাম ড্রাইভারকে মালামালসহ সেই রাস্তায় পাঠিয়ে দিন। আর আমাদের কোন না কোন ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করে দেবেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ কিছুক্ষণ চিন্তা করে ড্রাইভারকে বললেন, হযরত যা বলছেন তাই করো, এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে।

অতঃপর ড্রাইভার চলে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কুদরত প্রত্যক্ষ করছিলাম। পাহাড়ের অংশ এত বড় বড় ছিল যেন মনে হচ্ছিল শীশার অংশ পড়ে আছে। প্রায় ৫০ মিঃ পর্যন্ত রাস্তা পাহাড়ের টুকরায় ভরপুর। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে বললাম, চলুন আমরা এগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে যায়। মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে সম্ভব? আমি বললাম, যার দৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছা রয়েছে তাকে এগুলো দমাতে পারে না। একথা বলে আমি এগুলোর উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মাওলানা ও আবু উসমান আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন। মাওলানা তার ডান পাশের পাহাড় দেখছেন। পাহাড়ের কোন অংশ আমাদের উপর পড়ে যায় কি না তিনি এ ভয় পাচ্ছিলেন। এগুলো মাড়িয়ে আমরা পৌঁছে দেখি ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, লোকজন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা উপর থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। এক লোক দ্রুত আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, শায়খ! আপনারা কোথায় যাবেন? আমি বললাম, আংগিরি যাব। সে বলল "আমাদের গাড়ীতে সিট খালি আছে। আমরা পিকনিক করার জন্য বাড়ী থেকে এসেছি। রাস্তা বন্ধ বিধায় দাঁড়িয়ে আছি। আপনাদেরকে দেখে আমাদের মহিলারা প্রস্তাব করেছে, যদি আপনারা আমাদের দাওয়াত কবুল করেন তাহলে আমরা সমুদ্র তীরে খাবার খেয়ে নেব। অতঃপর আপনাদের ফিরিয়ে দিয়ে যাব। আমি বললাম, ঠিক আছে। যুবকটি অত্যন্ত আনন্দিত হল। মহিলারা আনন্দের সাথে মালামাল গাড়ী থেকে নামাল, বাচ্চারা খুশীতে লাফাতে লাগল। আমরা সত্তর ফুট নিচে সমুদ্রের তীরে আসলাম, মহিলারা খাবার গরম করার জন্য লাকড়ি খুঁজছে। পুরুষেরা দস্তরখানা বিছিয়ে দিল। আমরা এক জায়গায় যিকির শুরু করি। পানির কলকল ধ্বনি পাখির গুঞ্জরণ সবকিছু মিলিয়ে মন আনন্দে মেতে উঠল। মাগরিব নামাযের পর খাবার খেয়ে নিলাম। এত সুস্বাদু খাবার আমার জীবনে খুব কমই খেয়েছি। সম্ভবত মেজবানের ইখলাসের বদৌলতে এর মধ্যে এত স্বাদ এসেছিল।

খাবার শেষে মহিলারা ওয়াজ নসীহত শুনতে আগ্রহবোধ করল। আলহামদুলিল্লাহ! অল্প সময় নসীহতের পর পুরুষ-মহিলা সবাই বায়আত হল। আসার সময় মহিলা ও বাচ্চারা এক গাড়ীতে এবং আমরা পুরুষরা এক গাড়ীতে উঠে বসলাম। এক ঘন্টা সময়ের ভিতরে আমরা তাদের বাড়ীতে এসে পৌছলাম। মেজবানের পিতা এলাকার একজন প্রবীণ আলেম। তিনি আমাকে দেখে অনেকক্ষণ যাবত বুকের সাথে মিলিয়ে রাখলেন, অবশেষে চা পান করিয়ে আমাকে এক মূল্যবান জুব্বা হাদিয়া প্রদান করলেন। আমরা বিদায় নিয়ে বাড়ীতে পৌছে আল্লাহ তাআলার লক্ষ লক্ষ শুকরিয়া আদায় করলাম, যিনি আমাদের সফরকে সহজ করে দিয়েছেন। সফরে যাওয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করছিলাম–

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا

হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরকে সহজ করে দিন।

রাত বারটা বেজে গেলে পুরো শরীর ক্লান্ত হয়ে গেল। বিছানায় আসতেই ঘুমিয়ে গেলাম। ফজরের সময় ঘুম থেকে জেগে নামায আদায় করলাম।

ঐতিহাসিক সমরকন্দ শহর

ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, ১৮৫০ ইং পর্যন্ত শুধু দু'জন ইউরোপিয়ান সমরকন্দ পৌছার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছিল।

সমরকন্দের এক দিকে যরাফশা সমুদ্র এবং বাকী তিন দিকে তিয়ান শিয়ান পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পাহাড় মাড়িয়ে এই শহরে প্রবেশ করার আনন্দই অন্য রকম। বলা হয় যে, সমরকন্দ আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন শহর। এই শহরকে সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারের দিক থেকে এক সময় প্রাচ্যের রোম বলা হত। প্রথম যুগে এর নাম ছিল "মারকান্ত"। ৩২২ খৃষ্ট পূর্ব সময়ে ইস্কান্দারে আযম এ এলাকা বিজয় করেছিলেন।

৭১২ সনে এক আরবী বিজেতা এসেছিলেন। ১২১১ সনে চেঙ্গিস খান এই শহরের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত করে দেয়।

১৪১৪ সনে এই শহরের ভাগ্যকাশে দ্বিতীয়বার সূর্যোদয় হয়, যখন আমীরে তৈমুর এই শহরে তার দারুল খিলাফা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে এত সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল, যেগুলোর শান-শওকত, চাকচিক্য ছিল কল্পনাতীত। যেগুলোর নিদর্শন শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আজও বিদ্যমান।

১৯ মে ১৯৯২ তারিখে মাওলানা আব্দুল্লাহ ও দাদা খান নূরীর সাথে সমরকন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় এক স্থানে খাবার খেয়ে নিলাম। অতঃপর যোহরের সময় জামে মসজিদ যুলমুরাদ গিয়ে নামাযান্তে মসজিদের ইমাম

ও খতীব মাওলানা মুফতী গোলাম মোস্তফা গুলের সাথে মোলাকাত করি। মাওলানা আব্দুল্লাহ আমার পরিচয় দিলেন এবং ইনজাদান ও নামগান এর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করলেন। ফলে মুফতী সাহেবের অন্তরে আমার প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পেল। মুফতী সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন "আপনি এখানে কতদিন অবস্থান করবেন? আমি বললাম, তিন-চারদিন। তিনি বললেন, খুব ভালো। আপনি আমার মেহমান, প্রতিদিন আপনার সাথে আলোচনা হবে। আমি বললাম, আপনাদের এখানে কমিউনিস্ট আগ্রাসনের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে হবে। আগ্রাসনের সময় মুসলমানদের উপর নির্যাতনের হাল-অবস্থা বিস্তারিত জানাতে হবে। মুফতী সাহেব চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আমাকে বললেন, শায়খ! এই বিস্তারিত ট্রাজেডী বললে তো এক বৈঠকে শেষ হবে না। আমি বললাম, বলা আরম্ভ করুন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বলা শেষ হবে। মুফতী সাহেব শুনলেন।

کہاں سے ابتدا کیجئے بڑی مشکل ہے درویشو
کہانی عمر بھر اورجلسہ رات بھر کا ہے

আরে ভাই! ঘটনা কোথা থেকে শুরু করব?
ঘটনা গোটা জীবনের, বলতে হবে এক জলসাতে।

কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র

প্রথম দিকে বুখারা সমরকন্দ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র এবং তাতে ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজমান ছিল। জনগণ ওলামায়ে কেরামকে যথেষ্ট সম্মান করত।

কিন্তু রাশিয়ার ইয়াহুদী সম্প্রদায় ইসলামের এই প্রাণকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করার অটল-সংকল্প বাস্তবায়নকল্পে ষড়যন্ত্রের গভীর জাল বুনতে লাগল। প্রথমত তাদের কয়েকটি গোত্রকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাহানায় বুখারা শহরে পাঠিয়ে দিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভবান হল। অতঃপর তাদের সন্তানদের বুখারার বড় মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিল। বাচ্চারা খুব মেধাবী ছিল, কেননা তাদের গোত্র থেকে বাছাই করে এ কাজের জন্য মনোনীত করা হয়। সেহেতু তারা পড়া-লেখাতে খুবই ভাল ছিল। নিজেদের শ্রেণীর ছাত্রদেরকে পিছনে ফেলে দিত। ফলে শিক্ষকরা তাদের তীক্ষ্ণ মেধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তারা প্রতিটি পরীক্ষায় অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হত। তারা মাঝে-মধ্যে বাড়িতে আসলে তাদের পিতা-মাতা তাদের ব্রেইন ধোলাই করে দিত। তারা বলত, আমরা ইয়াহুদী সম্প্রদায়। তবে তোমাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ইলমে দীন শিখাচ্ছি। যেহেতু বাচ্চাদের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করে দেয়া হয়েছিল, সেহেতু তারা ইলমে দীন শিক্ষা করত। তবে তারা ইলমের নূর থেকে বঞ্চিত ছিল।

কয়েক বছর পর যখন তারা ইলমে দীন শিক্ষা করা থেকে ফারেগ হল তখন তাদের মেধার কারণে তাদেরকে মাদরাসার শিক্ষক নিয়োগ করা হল। উস্তাদ হয়ে তারা ছাত্রদের খুব প্রিয় উস্তাদ এবং নিজেদের কৌশলের দ্বারা সাধারণ জনগণের কাছে খুবই প্রিয়ভাজন হতে সক্ষম হল। সময়ের গণ্ডি বেয়ে এই গোপন ষড়যন্ত্র সফলতার সুউচ্চ চূড়ায় উঠতে লাগল। এমনকি কোন এক মুহূর্তে তারা বুখারার মুফতী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গেল। আর জনসাধারণ মুফতী সাহেবের কথা অনুযায়ী আমল করে থাকে। তারা প্রথমে কিছুদিন ভাল ভাল কাজ কর্ম করল। ফলে তারা লোকদের আস্থাভাজন হয়ে গেল।

তারপর তারা ধীরে ধীরে এমন ধরনের উদ্ভট ফতোয়া দিতে শুরু করল, যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে পরস্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে লাগল। প্রথমদিকে ওলামায়ে কেরাম কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করল। অতঃপর যখন দেখল পানি অনেক দূর গড়িয়ে যাচ্ছে তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে ইলমী সংগ্রাম শুরু করল। ফলে অতীতে যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এক শিবিরের অন্তভূর্ক্ত ছিল তারা আজ দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। সর্বদাই তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক, বহস মোনাজারা অব্যাহত রইল। আলেমদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়ে গেল। ফলে তাদের অন্তর থেকে ওলামায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা হ্রাস পেতে লাগল। তারা ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে দূরে সরে নিজেদের জীবন-যাপন শুরু করল।

একতা ও ঐক্যবদ্ধ থাকার দরুণ সমাজে যে বরকত ছিল তা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গেল। দেখা গেল তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের প্রথম ধাপ এভাবে বাস্তবায়ন হয়ে যায়।

এ অবস্থায় রাশিয়ার সম্রাট মুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য কূটনৈতিক চাল শুরু করল, যা ছিল তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় ধাপ। প্রথমতঃ তারা মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করল। দীর্ঘদিন এই সম্পর্ক রাখার পর মুসলিম দেশগুলোর কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নত করার প্রস্তাব পেশ করল এবং বলল, তোমাদের দেশে আমরা রেল লাইন ও শিল্প কারখানা তৈরী করতে চাই। যাতে তোমাদের আর্থিক উন্নতি হয়। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে এ প্রস্তাব মনঃপূত হল। ফলে তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করল। ওলামায়ে কেরাম তখন কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কিন্তু তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। কেননা ওলামায়ে কেরামের সম্মান তাদের অন্তর থেকে প্রথমেই উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কর্মকারের দোকানে কুরআন পাঠ কে শোনে।

অতঃপর যখন রুশ সম্রাট মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা ভালভাবে অনুধাবন করতে পারল, তখন সে প্রত্যেক দেশকে বলতে লাগল যে, তোমাদের দেশ স্বর্ণ,

তৈল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে ভরপুর। অতএব তোমরা যদি প্রত্যেক রাষ্ট্র পৃথক হয়ে যাও তাহলে তোমরা সহজে বিপুল অর্থের অধিকারী হতে পারবে। নইলে যদি তোমরা তোমাদের এই উপকরণগুলো প্রবেশ কর তাহলে অন্যান্য রাষ্ট্র তোমাদের কাছে অংশ চাইবে।

তাদের এই ষড়যন্ত্র এমনভাবে সফল হল যে, দেখা গেল প্রত্যেক মুসলিম দেশ নিজেরাই পৃথক হতে লাগল। যখন পরস্পরে মতানৈক্য বৃদ্ধি পেল, কয়েক বছরের মাথায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই পৃথক হয়ে গেল। তখন রুশ সম্রাট মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দিল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে এই বলে আশ্বস্ত করল যে, তোমাদের সাথে আমাদের ভ্রাতৃত্ব সর্বদাই অটুট থাকবে। কিন্তু অমুক রাষ্ট্রকে কিছুটা শায়েস্তা করা দরকার। দেখা গেল এক রাষ্ট্রের উপর তারা আধিপত্য বিস্তার করে ফেলল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে লোক দেখানো ভ্রাতৃত্ব অটুট রাখল। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাদের এই ধোঁকা বুঝতে সক্ষম হয়নি। ফলে এক এক করে এভাবেই প্রতিটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে রাষ্ট্রগুলো তাদের করায়ত্বে নিয়ে গেল।

একথা শেষ করে মুফতী সাহেব একটি ফটো বের করে নিয়ে এলেন, যার মধ্যে বুখারার মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ছবি ছিল।

ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে মুহতামিম সাহেব পর্যন্ত সুন্নতী পোশাক ও পাগড়ী পড়ে দাঁড়ানো ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, এটা কি? মুফতী সাহেব বললেন, যখন কমিউনিস্টরা বুখারার উপর আক্রমণ করল, তখন মাদরাসার সকল ছাত্র শিক্ষককে দাঁড় করিয়ে এই ফটো উঠিয়ে রেখেছে, এ কাজের রেকর্ড রাখার জন্য।

আলেমদের প্রতি কঠোরতা

মুফতী সাহেব কথা বলার ধারাবাহিকতায় বললেন, ষড়যন্ত্রের তৃতীয় ধাপ ছিল যে, কমিনিউস্টরা যখন অভিযান শুরু করল সর্বপ্রথম তারা ওলামা সমাজকে টার্গেট করল। তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হল। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হল। আলেমদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করল যে, লাশের স্তুপ জমা হয়ে গেল। তখন তারা ক্রেনের মাধ্যমে টেনে টেনে গর্তে ফেলে হাজার হাজার আলেমকে গণকবর দিল। সেই গণকবর আজও বিদ্যমান রয়েছে। কিছু আলেমকে জাহাজে করে নিয়ে সাইবেরিয়ার বরফের সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। এদের অনেকেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে শাহাদত বরণ করেন। তাদের থেকে যারা বেঁচে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারা বলেছেন "ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা সর্বদাই নড়াচড়া করতেন, যখন তাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগত, তখন তারা বরফ ভেঙ্গে নিচে হাত ঢুকিয়ে মাছ ধরে কাঁচা মাছ খেতেন। রাত-দিন কোন সময় তারা ঘুমাতে পারেননি, তীব্র ঘুম আসার ফলে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যেত। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডায় অবশ

হয়ে যেত। বাধ্য হয়ে শরীর নড়াচড়া করতে হত। যেখানে গেলে ঠাণ্ডা কম লাগবে অনুমান হতো সেখানেই যেতেন। এই অবস্থায় তাদের রাত দিন কাটাতে হত।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল বিধায় অবশেষে তারা সাইবেরিয়া থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন সময় আলেমদেরকে একত্র করে দু'ট্রেনে বসিয়ে দু'ট্রেনকে দু'স্টেশনের উদ্দেশ্যে ছাড়া হত এবং খালি ময়দানে অপর ট্রেন দিয় ধাক্কা লাগানো হতো ফলে অনেকেই শহীদ হয়ে যেতেন এবং অনেকেই পঙ্গু হয়ে যেতেন। কতক আলেমদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপবাদ দিয়ে তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হত।

মোটকথা কমিউনিস্টরা ওলামায়ে কেরামের অস্তিত্ব ধ্বংস করা ও তাদের নাম নিশানা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোন শিথিলতা ও কসুর করেনি।

সমরকন্দের নিকটবর্তী এক আলেম এখনও জীবিত আছেন, তার থেকে কমিউনিস্টদের অত্যাচারের কাহিনী শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। তিনি বলেন, এক প্লেটের মধ্যে তাদের হাত-পা ধোয়ানো হত। তারপর পানি ফেলে দিয়ে এই প্লেটেই খাবার দিয়ে খাওয়ার নির্দেশ করত, যাতে তাদের রুচি নষ্ট হয়ে যায় এবং খাবার না খায়। থাকার জন্য অল্প জায়গা দেয়া হত। ফলে না বসা যেত, না ঘুমানো যেত, না পা লম্বা করা যেত। কখনও শীতের মৌসুমে গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হত এবং গোটা রাত ঠাণ্ডা পানিতে বসিয়ে রাখা হত, যাতে ঘুমাতে না পারে। জালিমরা এমন অত্যাচার করত, যার ফলে আলেমরা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বলতেন, আমাদেরকে ফাঁসি দিয়ে দাও। একথা শুনে জালেমরা-মুচকি হাসত এবং বলত, আমরা এই আলেমদের এমন অবস্থা করেছি যে, এখন তাদের কাছে মৃত্যুই ভাল লাগে।

ধন্যবাদ সেই ওলামায়ে কেরামকে, যারা সমস্ত জুলুম অত্যাচার চোখ বুজে সহ্য করেছেন। তদুপরি কুফরী কবুল করেননি। আল্লাহ পাক তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। তাছাড়া ঈমানদীপ্ত কিছু দাস্তান শুনেছি। সমরকন্দের অদূরেই একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। যার মধ্যে এক মর্দে মুজাহিদকে তাশাহুদের অবস্থায় শহীদ হিসেবে পাওয়া গেছে। গুলি তার বুকে বিদ্ধ হয়ে পিঠ দিয়ে বের হয়েছিল। তার দাড়ি চুল পড়ে গেলেও পুরা শরীর কয়েকশত বছর পরও অক্ষত রয়েছে। সুবহানাল্লাহ।

এক পাহাড়ে একটি গুহায় পবিত্র ও সতী নারীর লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে। গুহার দরজায় পাহারারত এক যুবককে গুলী করে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আজও যদি কোন লোক এই পাহাড়ে উঠে গুহা দেখতে চায়, তাহলে উপর থেকে গায়েবীভাবে ছোট ছোট পাথর এমনভাবে বর্ষিত হয়, যেন কেউ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ

করছে। যত উপরে উঠা হয় পাথর বৃষ্টি ততই বেগে বর্ষণ হতে থাকে। তাই এখন কেউ পাহাড়ের উপর উঠে গুহা দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করে না।

কমিউনিস্ট আগ্রাসনে হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামকে এজন্য হত্যা করা হয়েছে যে, তারা শুধু একমাত্র আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে।

রেখেছে যে নযীর খুন আর মাটিতে গড়িয়ে
এমন প্রেমিকের তরে তার রহমত দেন বিলিয়ে।

দীন মিটাও আন্দোলন

তাদের ধারণায় ওলামায়ে কেরামের অস্তিত্ব বিলীন করার পর চতুর্থ দফায় তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল ইসলামকে মানুষের জীবনাচার থেকে বিলুপ্ত করে দেয়া। তাই তারা শুধু কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, বরং আইন করল যে, আরবী ও উর্দূ ভাষায় লিখিত কোন চিরকুট বা কিতাবের সন্ধান কারও ঘরে পাওয়া গেলে তাকে তার পুরো পরিবারসহ ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। ফলে জনগণ তাদের ভয়ে দীনী শিক্ষা-দীক্ষা থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেল। উজবেকী ও তাজেকী ভাষার হুরুফে আবজাদ আরবী-ভাষার সাথে মিল ছিল। তাই তারা তা পরিবর্তন করে দিল এবং তাদের জন্য রুশ ভাষা বাধ্যতামূলক করে দিল, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দীনী শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। নারীদের মাথায় কাপড় দিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদেরকে মাথায় কাপড় দিয়ে যেতে দেখলে পুলিশ তাদেরকে বাজারে দাঁড় করিয়ে কাপড় খুলে ফেলত এবং চুল লম্বা দেখলে তা কেটে দিত। জনগণকে বলা হত "মাযহাব–ধর্ম আফিম এর ন্যায় নেশা" আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি, বরং মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বের কল্পনা বা ধারনা সৃষ্টি করেছে। একথাও বলা হত যে, মানুষের কিছু প্রয়োজন রয়েছে এগুলো পুরো করতে কোন লজ্জা-শরম থাকবে কেন? যেমন ক্ষুধা লাগলে আহার করবে, পিপাসা লাগলে পান করবে, ঘুম আসলে ঘুমাবে এবং যৌন চাহিদা হলে পাশের কোন মেয়ের সাথে চাহিদা পুরো করবে, এতে লজ্জা-শরমের কী আছে? নাউযুবিল্লাহ।

সঙ্গীতকে এত ব্যাপক দান করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে রিসিভার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সর্বদা-সঙ্গীত শোনা জরুরী করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি কিছু মসজিদের মিহরাবেও স্পিকার লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল, যার মধ্যে সর্বদাই নাস্তিকতার তা'লীম দেওয়া হত। অতঃপর সঙ্গীত শুনানো হত। প্রত্যেক নারী-পুরুষকে বাধ্য হয়ে সঙ্গীত শুনতে হত। ফলে জনগণ বিনোদনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। শরাব এত ব্যাপক করা হয়েছিল যে, সেভেনআপ এর বোতল চার রুবলে এবং শরাবের বোতল দু'রুবলে পাওয়া যেত। সাধারণ জনগণ বাধ্য হয়ে

সেভেনআপ এর পরিবর্তে শরাবের বোতল খরীদ করে পান করত। ব্যাপক শরাব পান করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে সমাজ থেকে লজ্জা শরম ধ্বংস হয়ে যায়।

শুকরের গোশত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে হারাম গোশত খাওয়ার দ্বারা বেহায়াপনা বৃদ্ধি পায়। আর শুকরের কাবাব এত সস্তা ছিল যে, লোকেরা সেই কাবাব খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সাধারণ জনগণ পাকানো গোশত খরীদ না করে তারা কাবাব দিয়ে রুটি খেয়ে নিত। এর ফলে তাদের শরীরে হারাম প্রবেশ করত।

নাম-নিশানা ধ্বংস করা হয়

কমিউনিস্টরা জনগণের জীবনাচার থেকে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার পরও আশংকাবোধ করছিল যে, মুসলমানরা লুকিয়ে গোপনে ইবাদত বন্দেগী করে কিনা। তাই তারা বিপ্লবের তেইশ বছর পর ঘোষণা করল যে, ইবাদত বন্দেগীকারীদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করা হবে। প্রত্যেকেই তাদের ইচ্ছানুযায়ী ইবাদত করতে পারবে, তাকে কেউ বাধা প্রদান করবে না। মুসলমানরা তাদের এ ঘোষণায় অত্যন্ত খুশী হল এবং ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরে নামায পড়তে শুরু করল।

এদিকে গোপনে গোয়েন্দা বাহিনী তাঁদের রিপোর্ট তৈরি করতে লাগল। প্রায় তিন বৎসর যাবত তারা ইবাদতকারীদের লিস্ট তৈরি করল। একদিন হঠাৎ করে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলা হল। এই অপারেশনের পর কমিউনিস্টরা খুবই আনন্দিত হল যে, এখন আমরা মুসলমানদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছি।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়

কমিউনিস্ট প্রধানগণ সাধারণ জনগণকে বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

প্রথমত, অন্য রাষ্ট্রে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট পাওয়া যেত না। যদিও কেউ পাসপোর্ট সংগ্রহ করত, তাহলে তার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেওয়া হত। জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করা হত নানাভাবে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের নজরদারী করত। এমনকি ভাই বোন পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারত না। এক ঘরে বসবাসকারী একে অপরের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছিল। মুফতী সাহেবের কাছ থেকে এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনা শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সত্তর বছর পর বর্তমানে কীভাবে ইসলামী নিদর্শনাবলী অবশিষ্ট রয়েছে? মুফতী সাহেব ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছেড়ে ইসলামী নিদর্শন অবশিষ্ট থাকার ইতিহাস বললেন–

নীরব বিপ্লব

কমিউনিস্টদের শাসন সাধারণ জনগণের দেহের উপর ছিল। অন্তরের উপর ছিল না। যাদের অন্তরে ঈমানের নূর প্রজ্বলিত ছিল তারা নিজেদের ঈমানকে গোপন রাখতেন এবং قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (তাদের অন্তর ঈমানের দ্বারা প্রশান্ত) এর মর্যাদা লাভ করেছিল। তাদের ধরার জন্য কমিউনিস্টরা চূড়ান্তভাবে চেষ্টা করত। ফলে কাউকে কাউকে ধরে ফেলত এবং কারো কারো কোন হদীস পেত না। যেমন আমার পিতা একজন বড় আলেম ছিলেন তাদের আগ্রাসন আসার পূর্বেই তিনি তার বেশ-ভূষা পাল্টে নিয়েছিলেন। ফলে তাকে দেখে আলেম বুঝা তো দূরের কথা বরং সাধারণ মূর্খ লোক মনে হত। সারাদিন সরকারী জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে হাল চাষ করতেন। প্রায় ১৬-১৮ ঘন্টা কাজ করতেন। লোকজন তাকে ট্রাক্টরের পাগল ও গ্রাম্য লোক মনে করত। কিন্তু তার অবস্থা ছিল যে, যখন তিনি জমি চাষ করে রাত ১২টায় বাসায় ফিরতেন, তখন তিনি আমাকে বুখারী শরীকের পাঠদান করতেন। আমি ছোট বাচ্চা ছিলাম। তিনি আমার আম্মাকে বলতেন, চা তৈরি কর। অতঃপর আমাকে দস্তরখানার সামনে বসাতেন। ততক্ষণে তিনি চুপিসারে নামায আদায় করে নিতেন।

কখনও কখনও পুলিশ এসে আমাকে মিষ্টি জাতীয় কিছু দিয়ে জিজ্ঞাসা করত, তোমার আব্বা কি ঘরে নামায পড়েন? আমি বলতাম, না। কেননা আমি তো দস্তরখানা থেকে সবেমাত্র উঠে গিয়েছি। পুলিশ বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করত যে, তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আরবী শিক্ষা দেয় কিনা? যদি সে হ্যাঁ বলত, তাহলে তার পিতাকে ধরে নিয়ে ফাঁসি দিত। কোন বাচ্চা যদি বিসমিল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করত, তাহলে তার পিতাকে জেলে ঢুকিয়ে রাখত। স্কুলের শিক্ষকদের দায়িত্ব দেয়া ছিল, কোন বাচ্চা যদি আরবী শব্দ উচ্চারণ করে তাহলে K.G.B কে যেন রিপোর্ট করে। ওলামায়ে কেরাম এমনভাবে আত্মগোপন করে কাজ করতেন যেন কারো কানে কানেও সংবাদ ছড়িয়ে না পড়ে। বিভিন্ন স্থানে গোপন কামরার মধ্যে তা'লীমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কখনও আমরা বড় ধরনের হলরুম তৈরী করতাম এবং এর মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করতাম। তারপর হলের পাশে দ্বিতীয় একটি কামরা তৈরী করতাম। যাতে এর আওয়াজ বাইরে বের না হয়। সেজন্য হলরুমকে সাউন্ডপ্রুফ করে তৈরী করা হত। একটি কামরার সাথে এই হলরুমের দরজা থাকত। উস্তাদ ও বাচ্চারা হলরুমের ভেতরে প্রবেশ করলে আমরা ভালভাবে দরজা বন্ধ করে দিতাম এবং সেখানে একটি আলমারি রেখে দিতাম। এর মধ্যে শরাবের বোতলও থাকত। বিভিন্ন রঙ্গীন নগ্ন ছবি দিয়ে রুম সাজিয়ে রাখতাম। পুলিশ এসে অনুসন্ধান করে শরাবের বোতল ও নগ্ন ছবির কামরা দেখে খুশী হয়ে চলে যেত, ভাবত এটা কোন কমিউনিস্টের বাড়ী। কিন্তু তারা অনুধাবন করতে

সক্ষম হতো না যে, কয়েক মিটার দূরেই বাচ্চারা তাদের মাসুম যবান দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কুরআন পাঠ করছে। আমরা উস্তাদ ও বাচ্চাদের কে কখনও প্রায় ছয় মাস পর বের করতাম। দেখা গেল যে বাচ্চারা হল রুমে প্রবেশের পূর্বে কুরআনের একটি শব্দও বলতে পারত না, তারা এখন বের হয়ে গোটা কুরআন অনায়াসেই তেলাওয়াত করতে পারে। মুসলমান রমণীদের খুবই ত্যাগ স্বীকার করতে হত। প্রায় ছয় মাস যাবত নিজের সন্তানকে দেখার সৌভাগ্য হত না। আমাদের লোকজন যদি আত্ম-পূজারী হত তাহলে তারা দীন থেকে বিমূখ হয়ে যেত। কারণ বিবেক এই অবস্থা কখনও মেনে নেয় না। কিন্তু তারা ছিলেন আল্লাহর পাগল, তাই সম্ভব হয়েছে।

এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা তাদের দীন নিরাপদ রেখেছেন।

মুফতী সাহেবের আলোচনা শুনে আরও আলোচনা শোনার আগ্রহ হল। কিন্তু কথা বলতে বলতে তিনি কিছুটা ক্লান্তি বোধ করলেন এবং বললেন, অবশিষ্ট আলোচনা আগামী সাক্ষাতে সমাপ্ত করব। ইনশাআল্লাহ্।

এক রমণীর ঈমানী দৃঢ়তা

পরেরদিন যোহরের নামায মসজিদে আদায় করলাম্। কিছু যুবক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল এবং তাদের বাসায় যাওয়ার জন্য জোর আবেদন করল। শুরুতে আমি অস্বীকার করলাম। কিন্তু তারা আবারও পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি মুফতী সাহেবের কাছে অবস্থা বর্ণনা করলাম। মুফতী সাহেব আমাকে বললেন! হযরত, এই যুবকদের আবেদন নাকচ করবেন না, তাদের মায়ের অনেক ত্যাগ ও কুরবানী রয়েছে। তিনি অসুস্থ, আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। আমিও আপনার সাথে যাব। অতঃপর আমি মুফতী সাহেবের সাথে গাড়ীতে বসলাম, তিনি আমাকে বললেন, হযরত! যখন কমিউনিস্টদের আগ্রাসন শুরু হল তখন তাদের আম্মা বিশ-বছরের যুবতী। তিনি ভয় ভীতি উপেক্ষা করে অন্যান্য নারীদেরকে কালিমার তালকীন ও ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আমরা তাকে নিষেধ করতাম যে, তোমার জীবনে ঝুঁকি রয়েছে। তুমি এগুলো করা থেকে বিরত থাক। কিন্তু তিনি বলতেন, মৃত্যু যখন আসার তখন তো আসবেই। মৃত্যুর ভয়ে আমি দীনের তাবলীগ থেকে ফিরে আসব না। ৭০ বছর যাবত এ কাজই করেছেন। বর্তমানে তার ৯০ বছর বয়স, অসুস্থ অবস্থায় খাটের সাথে মিশে আছেন। পাকিস্তান থেকে এক শায়খ আগমন করেছেন জেনে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে উদগ্রীব হয়ে আছেন।

আমরা বাড়িতে প্রবেশ করে দেখলাম, ঘরের প্রশস্ত আঙ্গিনা, দূর থেকে দেখলাম, কাঠের উপর এক বৃদ্ধ রমণী হেলান দিয়ে বসে আছেন। খাট থেকে

৩-৪ মিটার দূরে দাঁড়ালাম। আমি সালাম করে দু'আ করার আবেদন পেশ করলাম। তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন।

হে আল্লাহ! ঈমান নিরাপদ রাখুন।

আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ! যে রমণী ২০ বছর থেকে শুরু করে ৯০ বছর পর্যন্ত কালেমার প্রচার-প্রসারের জন্য অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানী করেছেন, আর এখন দু'আ করার সময় বলেন, হে আল্লাহ! ঈমান নিরাপদ রাখুন। এর দ্বারাই তার ঈমানের দৃঢ়তা প্রমাণিত হয়।

রেগিস্তানের মাদরাসাগুলো

সমরকন্দের মধ্যভাগে এক ঐতিহাসিক স্থান "রেগিস্তানচক" নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার তিনটি মাদরাসার তিনটি সুরম্য, প্রশস্ত, বিশাল ও আলীশান ভবন রয়েছে, যা যে কোন দর্শণার্থীর দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

এটি কেন্দ্রীয় চক যা তৈমুরের সময়ে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে বড় বাজার ছিল। বাণিজ্যিক কাফেলা এখানে আসত। এর চারপাশে কারিগর ও স্বর্ণকারের দোকান ছিল। পনের শতকে আমীরে তৈমুরের ছেলে মীর্যা উলগ বেগ সর্বপ্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজেই এই মাদরাসার উস্তাদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি গণিত, দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

ষোল শতকে সমরকন্দের হাকীম বালাংদুস বাহাদুর অনুরূপভাবে আর একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রদের ভীড়ে মাদরাসাটি জমজমাট ছিল। কিন্তু একটি বিষয় আমার বোধগম্য হয়নি। এ ধরনের কারুকার্য বিশিষ্ট দরজা, মেহরাব ও খুঁটিবিশিষ্ট মাদরাসার দরজায় বাঘ বানানো রয়েছে, যা সবারই নজরে পড়ে। এ জন্য এর নাম হয়েছে শেরদের মাদরাসা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এ জাতীয় কারুকার্য বোধগম্য নয়। রেগিস্তানের তৃতীয় পাশে ১৭ শতকে 'তাল্লাকারী মাদরাসা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদরাসার মাঝখানে নীল গম্বুজ বিশিষ্ট একটি সুন্দর মসজিদ রয়েছে। যার মিহরাবে ২০০ কিঃ গ্রাঃ স্বর্ণ দিয়ে আস্তর করা হয়েছে। এ কারণেই এর নাম তাল্লাকারী হয়েছে।

এ মসজিদের মিনার এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, পৃথক পৃথকভাবে ঝুঁলে আছে বলে মনে হত। শতাব্দী কাল যাবত এভাবেই বিদ্যমান ছিল। ১৯৩২ সালে এগুলো সোজা করে দেয়া হয়েছে। রুশ ও উজবেকী কারিগর এ কাজের উপর গর্ববোধ করে থাকে। সমরকন্দের মুফতী আযম গোলাম মোস্তফা সাহেবের সাথে আমরা এই মাদরাসাগুলো পরিদর্শন করতে গেলাম। সে সময় সলফে সালেহীনদের চিত্র স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। এই মাদরাসাগুলোই এক সময় হযরত দারেমী, ছাহেবে হেদায়ার ন্যায় জ্ঞানের পাহাড় ও বিদ্যা সাগরদের ইলমের পিপাসাই

মিটাতে সক্ষম হয়েছিল। এ স্থানসমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখে খুবই মর্মাহত হলাম। রাশিয়ার গভর্নর এই মাদরাসাগুলোকে নাইটক্লাব হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ভবনগুলো এক সময় কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনিতে মুখরিত হত, তাতে গানের তালে তালে লোকজন নাচত।

বর্তমানে এই তিন মাদরাসার মধ্যখানের স্থানকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। তাল্লাকারী মাদরাসাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে এক আশ্চর্য ঘরে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এ মসজিদের শুধু মেহরাব ও মিম্বরের নিকটবর্তী সামান্য স্থানটুকু ছেড়ে বাকী সবটুকু স্থান সরকারী ও জনসাধারণের কনফারেন্সের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আমি মেহরার ও মিম্বরের সৌন্দর্য অবলোকন করে খুবই মুগ্ধ হয়েছি। তাই মিম্বরে বসে বরকত অর্জনের নিমিত্তে কিছু নসীহত করি, যা উপস্থিত লোকজন খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছে। যুলমুরাদ মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব ফয়জুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বললেন, হযরত হয়ত অর্ধ শতাব্দী ধরে এ মসজিদে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কেউ করেনি।

আমরা কাপড় বিছিয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করে এ মাদরাসার উন্নতির জন্য খুব দু'আ করি। এ সব ভবনের উচ্চতা দেখে আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের আকাবিরীনদের ব্যক্তিত্ব কত বড় ছিল।

সমরকন্দের মুফতিয়ে আযমের বায়আত

ফিরে এসে যুলমুরাদ মসজিদে রাতে অবস্থান করলাম। মুফতী সাহেব আমাকে বললেন, হযরত! গত রাতে বলেছিলেন আজ বয়ান করবেন। তাই কিছু নসীহত করুন। আমি চিন্তা করলাম, মুচি যেখানেই যায় সেখানেই সে জুতা ঠিক করে। তাই আমিও এখানে আমার সিলসিলার পরিচয় প্রদান করব। আমি ভাঙ্গা-চুরা আরবী ভাষায় সিলসিলায়ে আলীয়ার বয়ান ও বাতেনী তাওয়াজ্জুহ দিলাম।

মাহফিল শেষে ফলাফল দাড়াল, মুফতী সাহেব আমাকে বললেন, হযরত! আমাকে বায়আত করে আপনার মুরীদানের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমার অন্তরে আপনার প্রবল মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে, যা আপনার বয়ান দ্বারা সম্ভব হয়েছে। আমি তাকে বায়আত করলাম এবং লতীফায়ে ক্বলবের পরিচয় করিয়ে দিলাম। বহু কষ্টের পর এই বাদশাহ অধীন হল।

অতঃপর মুফতী সাহেব তার পরিবারের সবাইকে বায়আত করালেন। বায়আত শেষে মুফতী সাহেব বললেন আমি দুনিয়াদার আলেম ও বেদআতী পীরদের ঘোর বিরোধী ছিলাম। সে কারণেই আমি দু'দিন যাবত আপনার চাল-চলন, উঠা-বসা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করছিলাম। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম যে, আমার বাতেনী ফায়েদা আপনার দ্বারাই হবে। মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব মুফতী

সাহেবের বায়আতের কথা জেনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, মুফতী সাহেব সমরকন্দের দেড়শত জামে মসজিদের ইমামদের তত্ত্বাবধায়ক। জুমআর নামাযে পাঁচ হাজার লোক তার পিছনে নামায আদায় করে। ঈদের দিন রেগিস্তান মাদরাসার সামনে প্রায় এক লাখ লোক তার ইমামতিতে নামায আদায় করে। তার কথার বেশ প্রভাব রয়েছে, ভ্রান্ত মতাবলম্বী লোকদের মোকাবেলায় তিনি যেন এক তলোয়ার। তার বড় ছেলে তাশখন্দের মাদরাসার ছাত্র, বাসায় কুরআনে কারীম হিফজ করছে। তার স্ত্রী সরফ ও নাহুতে পারদর্শী। বাসায় দীনী পরিবেশ রয়েছে। আমি বললাম, আপনি মুফতী সাহেবের অনেক প্রশংসা করলেন। তিনি পুনরায় বললেন, হযরত! এ ব্যক্তি একাই দশ হাজার লোকের সমতুল্য।

মুফতী সাহেব তার মাদরাসার পরিদর্শন খাতা দেখালেন, যেগুলোতে তুর্কী, মিশর ও সউদী আরবের ওলামায়ে কেরাম এসে অভিমত লিখেছেন।

মুফতী সাহেব বললেন, হযরত! যত লোক এখানে আগমন করেছে সবাই খাতায় তাদের অভিমত লিখেছেন। কিন্তু আপনি আমার অন্তরের কিতাবে الله। (আল্লাহ) লিখেছেন। আমি বললাম, মুফতী সাহেব !

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

মুফতী সাহেবের বায়আত হওয়ার সংবাদ দাবানলের মত ওলামা-ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। মুফতী সাহেব অনুমতি নিয়ে বাসায় চলে গেলে মসজিদের মুতাওয়াল্লী, মুয়াযযিন সবাই বায়আত হয়ে গেলেন। সমরকন্দের শহরের শিক্ষানবীশ ছাত্ররা আগ্রহভরে বায়আত হতে লাগল। ইশার নামাযের পর যে স্থানে বসা ছিলাম সে স্থানে বসেই ফজরের সময় হয়ে গেল। একে একে প্রায় এক ডজন খুতবা পাঠ করে লোকদেরকে সিলসিলায়ে আলীয়ার অন্তর্ভুক্ত করলাম।

এক যুবক আলেম বায়আত হতে এসে কয়েকটি ইলমী প্রশ্ন করল। মাওলানা আব্দুল্লাহ তার মেধা ও প্রশ্নের সুন্দর ঢং দেখে তার প্রশংসা করলেন। প্রায় এক ঘন্টা কথাবার্তার পর সে বায়আত হল। মসজিদের মুয়াযযিন সাহেব বললেন 'এ যুবক বায়আত হওয়ার পর সমরকন্দের কোন যুবক বায়আত হওয়ার বাকী থাকবে না।' কতক ছাত্রদের চেহারায় ইলম ও আমলের নূর দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই।

ফজর নামাযান্তে ইসহাকওয়ালী মসজিদের খতীব মাওলানা নাসরুল্লাহ এবং অপর একজন শিক্ষক এসে বায়আত হলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন 'হে সাইয়্যিদি! অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম করে নিন। আপনার দেহের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। মাওলানার কথা শুনে আমি মাহফিল শেষ করি।

হস্তলিখিত কিতাবের লাইব্রেরী পরিদর্শন

মাওলানা আহমেদ আলী খানকে বায়আত করার পর বললেন, তিনি এক লাইব্রেরীতে চাকুরী করেন, যার মধ্যে হস্তাক্ষরে লিখিত দুর্লভ কিতাব ও ছাপানো দুষ্প্রাপ্য কিতাব একত্র করা হয়েছে। আমি বললাম, আমরা কী কিতাব দেখতে পারব? মাওলানা বললেন, হযরত! কিতাব দেখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমি যদি অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করি তাহলে চাকুরী থেকে আমাকে ছাঁটাই করে দেবে। বলবে এই লোক ভিনদেশী লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে। আমি বললাম ঠিক আছে, আপনি আমাদেরকে ঠিকানা ও লোকেশান বলে দিন। আমি নিজেই কারও সাথে সেখানে যাব। যদি আল্লাহর মঞ্জুর হয়, তাহলে আমার এই দুর্লভ কিতাবগুলো দেখার সৌভাগ্য হবে। অথবা প্রবেশের অনুমতি না পেলে ভাবব যে, হয়ত আল্লাহ তাআলার মঞ্জুরী ছিল না। তাই দেখতে পারিনি। একথা শুনে মাওলানা শান্ত হয়ে গেলেন। পরের দিন আমি ফয়জুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে সাথে নিয়ে লাইব্রেরীতে চলে গেলাম। মেইন গেটের প্রহরী আমাদেরকে প্রবেশ করতে দিল। আমরা লাইব্রেরীতে ঢুকতেই এক মহিলা লাইব্রেরীয়ান আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কেন এসেছেন? আমি বললাম, লাইব্রেরী দেখার জন্য এসেছি। সে বলল, খুব ভাল। আপনারা মন ভরে লাইব্রেরী দেখুন। লাইব্রেরীর ইতিহাস আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি–

যখন কমিউনিস্টরা আগ্রাসন চালাল, তখন মুসলমানদের ঘর থেকে দীনী কিতাবসমূহ বের করে আগুন দিয়ে জ্বালাতে শুরু করল। এভাবে লক্ষাধিক কিতাব জ্বালিয়ে দেয়। কিছু মুসলমান কিতাবসমূহ হেফাজত করার জন্য বড় আশ্চর্য ধরনের পন্থা অবলম্বন করল। কেউ কেউ কিতাব মাটির নিচে দাফন করে এর উপর কবর বানিয়ে দিল, কেউ কেউ দাফন করে এর উপর দেওয়াল তৈরী করে দিল, যেন কোন নিদর্শন না পাওয়া যায়। আজ তারা দুনিয়াতে বেঁচে নেই। তাদের বংশধরদের কারও কিতাবের কথা স্মরণ আছে, আবার অনেকেই ভুলে গেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর সরকার লোকদেরকে এই মর্মে ঘোষণা দিল যে, যে কেউ লাইব্রেরীর জন্য দুর্লভ কিতাব সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে তাদেরকে এর বিনিময় দেওয়া হবে। দেখা গেল, লোকজন তাদের স্মৃতি অনুযায়ী কিতাব বের করে নিয়ে আসতে লাগল। আমরা যখন মূল্যবান দুর্লভ কোন কিতাব দেখি, যা সংরক্ষণ করা জরুরী, তখন আমরা তাদের থেকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তা খরীদ করে নেই এবং এই লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করি। আমাদের এই লাইব্রেরীতে প্রায় তিন হাজার দুর্লভ কিতাব সংরক্ষিত আছে। এরপর সে এক কামরা থেকে মাওলানা আহমেদ আলী খানকে ডেকে বললেন, মেহমানদেরকে লাইব্রেরীর কিতাবসমূহ

দেখিয়ে দাও। একথা বলে সে চলে গেল। মাওলানা আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, মাওলানা! আপনি এই নিসবতেব বরকত দেখুন। যে কাজ করা আপনার দ্বারা অসম্ভব ছিল, আল্লাহ তাআলা তা কত সহজ করে দিলেন।

মাওলানা মুচকি হেসে আমাদেরকে কিতাবসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞাত করালেন। সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রামাণ্য কিতাব (القانون) আল-কানুন দেখলাম। অতঃপর তফসীরে হুসাইনী দেখলাম, যা ইলম ও মারেফাতের দিক থেকে খুবই প্রসিদ্ধ কিতাব।

লোহার পাতে লিখিত কুরআন মজীদ

মাওলানা আহমদ আলী আমাদেরকে একটি কামরায় নিয়ে যান, যেখানে কাপড় আবৃত একটি লোহার পাত ছিল। মাওলানা, কাপড় উঠালে আমরা দেখলাম যে, লোহার পাতের উপর খোদাই করে কুরআন মজীদ লেখা রয়েছে। মাওলানা বললেন, এটা পুরো কুরআন মজীদের সেট। আমি জিজ্ঞেস করলাম লোহার পাতের উপর কুরআন মজীদ লেখার কী উদ্দেশ্য? মাওলানা বললেন, তৎকালীন মুসলমান রাজা-বাদশাহগণ চিন্তা করলেন যে, কুরআন মজীদের এমন একটি কপি তৈরী করা প্রয়োজন, যাতে কোন সময় প্রয়োজন হলে তা মাপকাঠি ও সনদ হিসাবে কাজে আসে। যেমনিভাবে বৃটেনে সময়ের মাপকাঠি নির্ধারণ করা আছে, যাকে আমরা "গ্রীনিচ" বলে থাকি। গোটা পৃথিবীর ঘড়ির সময় এই "গ্রিনিচের" সাথে হিসাব করে রাখা হয়। কেননা এই লোহার পাতের উপর লিখিত কুরআন মজীদ যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত থাকবে। কারণ এটা একটি প্রামাণ্য কপি। কখনও যদি কোন পাপিষ্ট কুরআন মজিদ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে তাহলে এই কপির সাথে মিলিয়ে অন্য কপির ভুল-ক্রটি ধরে তা বাতিল করা যাবে। লোহার পাত এত ভারী ছিল যে, চারজন মিলে তা উঠাতে হতো। আর এমন লোহা ছিল যে, তাতে একটুও মরিচা বা জং ধরেনি।

গাছের পাতায় লিখিত কুরআন মজীদ

আমরা কথা বলছিলাম, ইতোমধ্যে লাইব্রেরীয়ান মহিলা এলেন। তিনি আমাকে দেখে সালাম করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, সব কিতাব দেখা শেষ হয়েছে কি? আমি হ্যাঁ বললাম। তিনি বললেন, আমার কাছে একটি বিশেষ বস্তু রেখেছি। আপনারা আসুন। আমি তা দেখাব। তিনি আমাদেরকে তার কামরায় নিয়ে গেলেন এবং একটি বড় বক্স খুললেন। এর ভিতর থেকে অপর একটি বক্স খুললেন, অতঃপর এই বক্স থেকে একটি ব্রিফকেস বের করলেন, যার মধ্যে প্রতিটি বস্তু কেমিক্যাল দিয়ে সংরক্ষণ করা আছে, যখন তিনি এই ব্রিফকেস খুললেন, তখন দেখলাম এর মধ্যে কুরআন মজীদের ছোট ছোট কয়েকটি কপি।

এগুলো লেখা এত ছোট ছিল যে, পড়া দুঃসাধ্য। কিন্তু তিনি আমাদেরকে হরফ বড় দেখার জন্য এক ধরনের গ্লাস দিলেন। ফলে আমরা দেখলাম প্রতিটি পৃষ্ঠায় এক রুকু করে লিখা আছে, লেখা এত সুন্দর ছিল যে, আমরা দেখে অবাক হয়ে যাই। এমন কিছু কপি দেখে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করি। যখন তিনি দেখলেন আমরা আগ্রহভরে কুরআন মজীদের ছোট ছোট কপি দেখছি তখন বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে আসল বস্তু দেখাব। আর তা হল গাছের পাতায় লিখিত কুরআন মজীদের কপি, যা কাগজ তৈরী হওয়ার পূর্বে লিখিত। আনন্দের বিষয় হল, এই পাতাগুলো এমনভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে যে, তা ভাজ করা যায় না এবং টুকরাও করা যায় না। একথা বলে তিনি এক জিলদ কুরআন মজীদ বের করলেন। আমি হাতে নিয়ে ভাল করে দেখলাম, তখন আমার অনুভব হল এটি কোন গাছের পাতার উপর হাতে লিখিত কপি। প্রথম যুগের কুরআনের কপি দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। প্রথম আনন্দের কারণ হল, আমাদের সালফে সালেহীন দীনের সংরক্ষণের জন্য কী ধরনের কঠিন কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। দ্বিতীয় আনন্দের কারণ, আমরা নবী আলাইহিস সালামের কাছের যুগের এক বস্তু নিজের পাপী চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করলাম। আমি কুরআন মজিদের এই কপিতে চুমু খেলাম এবং চোখে লাগালাম। মাওলানা আহমদ আলী খান বলতে লাগলেন, হযরত! আপনার বরকতে এই কপি দেখার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। তা না হলে আমি মাহরূম থাকতাম। আমি লাইব্রেরীয়ান ও ডাইরেক্টর মহিলাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের জন্য দু'আ করে ফিরে এলাম।

লিপিকা বিদ্যা

লাইব্রেরী থেকে ফেরার পথে মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বললেন, হযরত! আমাদের আকাবিরীন কত বিশাল বিশাল কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন! লিপিকারগণ কেমন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন! আমি তাদেরকে লিপিকার সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা শুনালাম। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন লিখেন "লিপিকা বিদ্যা মানুষের বৈশিষ্টসমূহের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারাই মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে স্বতন্ত্র গুণের অধিকারী হয়। আরবী ভাষায় এই বিদ্যা তবগ গোত্র থেকে এসেছে, যারা ইয়ামানের উন্নত ও মর্যাদাশীল গোত্র ছিল। সে সময় এই বিদ্যার নাম ছিল হুমায়রী, সেখান থেকে আহলে হায়রা, হায়রা থেকে আহলে তায়েফ তাদের থেকে কুরাইশ গোত্র পর্যন্ত পৌছে এবং হায়রা থেকে এ বিদ্যা মিশর পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর আহলে উন্দুলুসের মধ্যে পূর্ণতা আসে। এই লিপিকাকে আরব ও আফ্রিকায় সর্বোত্তম লিপিকা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। লিপিকা বিদ্যায় মুসলমানগণ অনেক উন্নতি লাভ করে এবং এটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে। যেমন (১) খত্তে কুফী (২) খত্তে নসখ (৩) খত্তে রায়হানী (৪) খত্তে দেওয়ানী (৫) খত্তে শাকিস্তা (৬) খত্তে ফার্সী

(৭) খত্তে নাস্তালিক (৮) খত্তে তোগরা (৯) খত্তে গুলজার (১০) খত্তে গুবার এবং (১১) খত্তে রুক্আ ইত্যাদি।

দ্রুত লিপিকা ও সূক্ষ্ম লিপিকা পৃথক পৃথক বিদ্যায় পরিণত হয়। ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ্ নাসেখ এর নামে খত্তে নাসেখ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি খত্তে গুবারেও পণ্ডিত ছিলেন এবং সূক্ষ্মলিপিকার উপর তার সমান দখল ছিল। সূরায়ে ইখলাস তিনি একটি চাউলের উপর লিখে দিতে পারতেন। তিনি একবার আয়াতুল কুরসী একটি চাউলের উপর লিখে দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। ৯৭৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লামা আবু আবদুল্লাহ খোরসানী কাগজের এক পৃষ্ঠায় ৬৪০ লাইন লিখতে পারতেন।

আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ ছিলেন। তদুপরি নিজ হাতে কুরআন লিখে এর দ্বারা যা উপার্জন হত তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সলফে সালেহীনগণ নিজেদের কন্যাদেরকে দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতেন। অতঃপর কন্যাদের হাতে অত্যন্ত সুন্দর করে কুরআন শরীফ লিখাতেন। কুরআন শরীফ জিল্দ করে বাঁধিয়ে তা মেয়ের বিবাহের সময় সাথে দিয়ে দিতেন।

শাহ্ জিন্দা রহ. এর মাজারে

লাইব্রেরী পরিদর্শন শেষে আমরা সোজা শাহ্ জিন্দা রহ. এর মাজারে চলে আসি। মাজারটি ছিল একটি পাহাড়ের উপর। বাইরে কারুকার্যমণ্ডিত কাঠের গেট, তাতে লেখা আছে–

عَجِّلُوا بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْفَوْتِ
عَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ

"নামায কাযা হওয়ার পূর্বে দ্রুত আদায় কর।
মৃত্যু আসার পূর্বে দ্রুত তওবা কর।"

দরজার বাইরে একটি মসজিদ বানানো হয়েছিল, যেটাকে কমিউনিস্টরা পরবর্তীতে শরাবখানা বানিয়েছিল। বর্তমানে তা পরিষ্কার করে এর মধ্যে নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বড় দরজা দিয়ে কবরস্থানে প্রবেশ করলে অনেক চওড়া সিড়ি দিয়ে উপরে যেতে হয়, সিঁড়িটি প্রায় ২০ ফুট চওড়া। উজবেকী লোকদের মাঝে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি উঠার সময় এবং নামার সময় সিঁড়ি গণনা করে আর যদি উভয়বার গণনা সমান না হয় তাহলে সে গোনাহগার হবে; তার উচিৎ সিঁড়ির সংখ্যা উভয় দিক থেকে মিলে যাওয়া পর্যন্ত উপরে নিচে উঠা-নামা করা। সিঁড়ির উভয় পাশে গম্বুজ তৈরী করা আছে, যার নিচে তৎকালীন প্রসিদ্ধ ও নামকরা

লোকদের দাফন করা হয়েছে। আমীরে তৈমুরের সহোদর বোনের কবরও রয়েছে। এক বর্গ মিটারের মধ্যে দু'হাজার টাইলস লাগানো হয়েছে। টাইলসের লাল-নীল রং আজও যথার্থ রয়েছে। এর পাশেই তৈমুরের ভাতিজির অত্যন্ত সুন্দর কবর রয়েছে। উজবেকী লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে ১৬ বছর বয়সে তার ভাতিজির ইন্তেকাল হয়েছিল এবং তার মত সুন্দর ও সুশ্রী মেয়ে আর জন্ম হয়নি। একথা শুনে আমার মনে এই চিন্তা জাগল যে, এই পৃথিবী উপদেশ গ্রহণের স্থান। তাকিয়ে দেখ, কত সুন্দরী রূপসীর কবরে ধূলি উড়ছে। শুনেছি যে, তৈমুর আকাবিরীনের কবর ওযুর-সাথে বানানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। আমীরে তৈমুর নিজেও ওযুর সাথে কবর যিয়ারত করতেন। কবরে খোদাইকৃত নাম আজও বিদ্যমান। হাজার বছরের খোদাইকৃত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ফলক রয়েছে। অধিকাংশই সাদা পাথরের উপর খুব সুন্দর করে লেখা। সবগুলো সিঁড়ি চড়ার পর ডানপাশে কারুকার্যমণ্ডিত একটি বড় দরজা দৃষ্টিগোচর হল।

এক দরজার উপর লেখা ছিল اَبْوَابُ الْجَنَّةِ لِلْفُقَرَاءِ 'ফকীরদের জন্য জান্নাতের দরজা।' দ্বিতীয় দরজার উপর লেখা ছিল اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ لِلرُّحَمَاءِ 'দয়ালুদের জন্য জান্নাতের দরজা।' আমি একথা চিন্তা করে হয়রান হয়ে গেলাম যে, হাজার বছর পরও এই দরজাগুলো বহাল রয়েছে। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, একটি মসজিদ যা কাসেম ইবনে আব্বাস রা. এর স্মরণার্থে তৈরী করা হয়েছিল। হযরত কাসেম ইবনে আব্বাস রা. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. এর ভাই এবং রাসূল সা. এর চাচাত ভাই ছিলেন। ৪৫ হিজরীতে তিনি ইসলামের পয়গাম নিয়ে এখানে এসেছিলেন। হাজার হাজার লোক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। একবার ঈদের নামায পড়াকালীন কাফিররা সুযোগ বুঝে তাকে শহীদ করে দেয়। এজন্য তাকে শাহ জিন্দাহ বলা হয়। হযরত কাসেম ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল সা. এর দাফনকার্যে শরীক ছিলেন এবং সর্বশেষে তিনিই কবর থেকে উঠে আসেন।

দরজায় বড় পাথরের ফলকে তার নাম ও এই হাদীস লেখা আছে–

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهُ النَّاسِ بِيْ خَلْقًا وَخُلُقًا

কাসেম ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন রাসূল সা. এর চরিত্র ও গঠনাকৃতির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

মাজারের বাইরের কয়েকটি চিল্লাখানা তৈরী করা আছে। মাজারের উপর এই আয়াত লিখা রয়েছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

তোমরা কখনও আল্লাহর রাস্তায় নিহত লোকদের মৃত ধারণা করো না।

মাজারের নিচে একটি চিল্লাখানা রয়েছে! মুতাওয়াল্লী অনুগ্রহ করে এর দরজা খুলে দিল। আশ্চর্য ধরনের আঁকা বাকা রাস্তা! প্রথমে এক কামরা অতিক্রম করে দ্বিতীয় কামরা, অতঃপর কবরের সন্নিকটে সংকীর্ণ স্থান। এটা এমন একটি স্মরণীয় স্থান যেখানে আমাদের আকাবিরীন যেমন– বায়েযিদ বোস্তামী রহ. এবং আবুল হাসান খিরকানী রহ.-এর মত বুযুর্গানে দীন বসে মুরাকাবা করতেন। আমি এখানে বসে কিছু সময় মুরাকাবা করলাম। ফলে লতীফাগুলোর মধ্যে এমন ধরনের হাল-চাল হল, যা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর সংলগ্ন মসজিদে দু'রাকাআত নামায আদায় করে সাথীদের জন্য দু'আ করি। দু'আ শেষে তখনকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত দারেমী রহ. এর কবরে ইসালে সওয়াব করি এবং দু'আ করে চলে আসি।

বিবি খানম মসজিদ দর্শন

রেগিস্তান চক এর কাছেই এই মসজিদ। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, এক বর্ণনানুযায়ী জানা যায় আমীরে তৈমুর নিজেই এই মসজিদ নির্মাণ করান। দ্বিতীয় বর্ণনানুযায়ী জানা যায় তার বেগম বিবি খানম তৈরী করান, যখন আমীরে তৈমুর হিন্দুস্থান বিজয় করার জন্য গমন করেন। এই মসজিদ আমীরে তৈমুরের জন্য বিবি খানমের দেওয়া বিরাট হাদিয়া। অনেকেই সুন্দর এ মসজিদের রাজমিস্ত্রী ও বিবি খানমের প্রেমের উপাখ্যান তৈরী করে রেখেছে। এ কারণেই আমীরে তৈমুর হিন্দুস্থান থেকে ফিরে নিজের রাষ্ট্রের সমস্ত নারীকে পর্দা করার নির্দেশ দেন। খুব সুন্দর করে এ মসজিদটি তৈরী করা হয়। এই মসজিদ পরিদর্শন করে আমরা গোরে আমীর দেখার জন্য যাই।

গোরে আমীর দর্শন

সমরকন্দের একপ্রান্তে গোরে আমীর অবস্থিত। যেখানে আমীরে তৈমুর এবং তার বংশের অনেকেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। ফিরুজা রঙের গম্বুজ বিশিষ্ট এই কবরস্থান আমীরে তৈমুর তার নাতী মুহাম্মদ সুলতানের মৃত্যুর পর নির্মাণ করান। অতঃপর কয়েক বৎসর পরই ১৪০৫ সালে তিনি নিজেই এই কবরস্থানে সমাধিস্থ হন।

উল্লেখ্য যে, আমীরে তৈমুরের পীর ও মুর্শিদ মীর সাঈদ বীর এই কবরস্থানে শায়িত আছেন। মীর সাঈদের পায়ের কাছে আমীরে তৈমুরের মাথা রয়েছে। মূলত আহ্‌লুল্লাহ্‌দের সাথে গভীর ভালবাসা ও বিশ্বাসের ফলে আল্লাহ তাকে দুনিয়ার বিরাট বড় বিজয়ী বীর বানান। এ কারণেই তার কবরের ফলকে 'আমীরে আলাম' উপাধি লিখিত আছে। হয়ত পীরের প্রতি তার এই বিশ্বাস ও ভালবাসা পরকালে মুক্তির কারণ হয়ে যাবে।

আমীরে তৈমুরের চার ছেলে ছিল। তাদের দু'জনকে তার পৈতৃক শহর সব্জ-এ দাফন করা হয়। অপর দু'ছেলে শাহরুখ ও মীরানশাহ তার পাশেই সমাধিস্থ রয়েছে।

তার নাতী উলগবেগের কবর গম্বুজের নিচেই রয়েছে। উলগবেগের বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই সময়ের ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে জাতিকে রক্ষা করে। তার ছেলে আবদুল লতীফ বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর পিতাকে মৃত্যুর যন্ত্রণার আলোচনা শুনান। তিনি নিজে এই গম্বুজের নিচে শায়িত আছেন। বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্রাট আজ এই গম্বুজের নিচে অল্প জায়গা নিয়ে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব এমনভাবে অনুভব হল যে, আমি চিন্তা মগ্ন হয়ে যাই। আফসোস! হে দুনিয়ার মুসাফির! তোমার শেষ ঠিকানা তো কবর।

আমীর তৈমুরের কবরে গাঢ় সবুজ রঙের পাথর লাগানো আছে, যা আজকাল দুষ্প্রাপ্য, গোটা মধ্য এশিয়া এমনকি চীনেও এগুলো পাওয়া যায় না। তাহলে এ পাথর কোথা থেকে আনা হল? এ আমার প্রশ্ন। চিন্তার বিষয় হলো। যদি কবর জান্নাতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে তাহলে উপর দিয়ে যেমনই হোক না কেন তার কোন গুরুত্ব নেই।

ইমামে আহলে সুন্নাত আবুল মানসুর মাতুরিদী রহ.

গোরে আমীর দর্শন শেষে আমরা সমরকন্দের সংকীর্ণ গলিতে পৌঁছলাম। যেখানে গাড়ীর মোড় নেওয়া দুঃসাধ্য ছিল। এখানে পুরোনো পাথর দিয়ে তৈরী ঘর রয়েছে। এই এলাকায় দীনের আলো সাধারণ জনগণও অনুভব করে থাকে। কেননা আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দীন এই এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই লালিত পালিত হন এবং তাকওয়ার জিন্দেগী কাটিয়ে আপন রবের সান্নিধ্যে চলে যান, তারা আজ জান্নাতে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছেন।

এখানে এসে আমরা এমন একটি ঘরে প্রবেশ করি যেখানে আবুল মানসুর মাতুরিদী রহ.–এর মাজার রয়েছে। কমিউনিস্টরা এ জাতীয় স্থানের নাম নিশানা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু মুসলমানগণ তার মাজারের উপরে ঘর তৈরী করে মাজারের পৃথক কামরা বানিয়ে নেয়, স্বাধীনতার পর তারা নিজেদের ঘর স্থানান্তর করে নেয় যেন সাধারণ মুসলমানগণ সহজেই এখানে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

মুহাদ্দিসদের কবরস্থান যিয়ারত

আবুল মানসুর মাতুরিদী রহ. এর মাজারের একটু কাছেই এক কবরস্থান রয়েছে, যাকে মুহাদ্দিসদের কবরস্থান বলা হয়। এখানে দাফন হওয়ার জন্য মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনের জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হল যে, তাকে

তার যুগের স্বীকৃত মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, তার নাম মুহাম্মদ হতে হবে। পরিচালনা কমিটি এই শর্তদ্বয়ের উপর এত গুরুত্বারোপ করেন যে, সাহেবে হেদায়া আল্লামা কারী বুরহানুদ্দীন মারগেনানী রহ. এর মত মহান ব্যক্তিত্বকে লোকজন এখানে দাফন করতে চাইলে তারা অস্বীকার করেন। কারণ তার নাম মুহাম্মদ নয়। এই কবরস্থানে মুহাম্মদ নামী চারশত মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের কবর রয়েছে।

ফকীহ্ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ.-এর কবর

সমরকন্দের বাসিন্দা এক ব্যক্তিত্ব, যিনি তাম্বিহুল গাফেলীন কিতাব রচনা করে গাফেলদেরকে বিভোর ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন। যার তাকওয়া লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। এক সময় সফরে বের হলে তার সাথে প্রয়োজনীয় মালামালের চেয়ে মাটির ঢিলা বেশী ছিল। কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি এত বড় বোঝা নিয়ে সফর করেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন যে, এগুলো আমার পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন, আর আমি অন্য কারো ক্ষেত থেকে তার অনুমতি ছাড়া মাটি নিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে চাই না।

তার কবরের ব্যাপারে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু তাদের অনেকেরই ধারণা যে, কমিউনিস্টরা তার কবর বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে নতুন বিল্ডিং নির্মাণ করেছে। এখন এর কোন হদিস নেই। তাই তিনি আত্মগোপন করে বরযখী-জিন্দেগীর স্বাদ গ্রহণ করছেন। আমি সব সাথীদেরকে বললাম কুরআন মজীদ থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে তার উপর ইসালে সওয়াব করে দাও।

হযরত খাজা সাঈদ বিন উসমান ইবনে আফ্ফান রা.

তিনি রাসূল সা. এর জামাতা উসমান রা. এবং তার কন্যা হযরত রুকাইয়া রা.-এর সন্তান ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম বুখারা আগমন করেন। কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর হিজরত করে সমরকন্দে চলে আসেন। এখানে অনেকে তার থেকে দীন ইসলামের অনেক আলো অর্জন করেন। তিনি সমরকন্দের উপকণ্ঠে বসবাস করতেন। একবার তার ঘর থেকে ১০০ গজ দূরে কাফিররা সুযোগ পেয়ে তাকে শহীদ করে দেয়। তার কবর মোবারক তার ঘরেই বানানো হয়। কবরের সন্নিকটেই এক আলীশান মসজিদ নির্মাণ করা হয়। যার চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে বাউন্ডারী রয়েছে।

হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ্ আহবারওয়ালী রহ.

তিনি নকশবন্দীয়া সিলসিলার উঁচু দরজার বুযুর্গ ও শায়খ ছিলেন। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে অঢেল ধন-দৌলত দান করেছিলেন। মাওলানা জামী রহ. তার

কাছে বায়আত হতে এসে তার মাহফিলের জাঁকজমক ও শান-শওকত প্রত্যক্ষ করে বিপাকে পড়ে যান। অবস্থা টের পেয়ে হযরত বললেন, স্বর্ণ-রূপা কীলক গাঁথার জন্য হয়, অন্তরের গাঁথার জন্য নয়। হযরত বলতেন, যদি আমি পীর-মুরিদী করতাম তাহলে দুনিয়ার কোন পীর কাউকে মুরীদ করতে পারতেন না। কিন্তু আমাকে তো বিশেষ উদ্দেশ্যে তথা সুন্নত জীবিত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সমকালীন আমীর-ওমারাদের তার দরবারে আসা-যাওয়া করতে দেখা যেত।

এক উঁচু চত্বরে তার মাজার তৈরী করা হয়েছে। মাজারের পাশেই আলীশান মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। সামনে বড় হাউজ রয়েছে, যার চারপাশে উঁচু-উঁচু গাছ রয়েছে। রেগিস্তানের মাদ্রাসাগুলোর ন্যায় একটি মাদ্রাসাও রয়েছে। যা সমরকন্দের মুফতিয়ে আযমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

মাজারের কাছেই রজব আলী নামে একটি লোক বাস করত, যার আকীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বহির্ভূত। সে আমাকে দেখে লোকদের কাছে পরিচয় জানল এবং আমার মত কম বয়সী যুবকের কাছে সমরকন্দের মুফতিয়ে আযম কিভাবে বায়আত হলেন, তা ভেবে বিপাকে পড়ে গেল।

আমার সাথে সাক্ষাৎ করে কিছু প্রশ্ন করার জন্য দরখাস্ত করল। আমি বললাম, যদি বুঝে আসে তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন। সে আমাকে প্রথম প্রশ্ন করল যে, আপনার শাজরা আপনার থেকে রাসূল সা. পর্যন্ত বলুন। সাথে সাথে আমি শাজরা শুনিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় প্রশ্ন করল যে, যিকরে ক্বলবী কী? আমি তা সবিস্তারে বললাম। এরপর মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করল। অবশেষে যখন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল, তখন সে তার ভিতরের কথা খুলে বলল যে, আপনি এত অল্প বয়সে শায়খ হলেন কীভাবে? আমি আমার লাঠি জোরে মাটিতে নিক্ষেপ করে বললাম, মাওলানা! আমি নিজে শায়খ হইনি, আমাকে বানানো হয়েছে। একথা শুনে রজব আলী প্রভাবিত হয়ে গেল এবং তার অহংকার বিনয় ও নম্রতায় পরিবর্তন হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী র. এর শেষ বিশ্রামাগার

হাদীস শাস্ত্রের প্রাণপুরুষ আমিরুল মু'মিনীন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ. ১৯৪ হিঃ শুক্রবার বুখারাতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে অন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আম্মার মকবুল দু'আর বরকতে আল্লাহ তাআলা তার জাহেরী ও বাতেনী চক্ষু খুলে দেন। তার আব্বা চতুর্থস্তরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের রহ. খাস ছাত্র ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন যে, আমার আব্বা ইসমাঈল হাম্মাদ বিন যায়েদকে দেখেছেন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. সাথে দু'হাতে

মুসাফাহা করেছেন। ছোটবেলায় তার পিতা ইন্তেকাল করেন। তিনি তার নেককার আম্মার কাছে লালিত পালিত হন এবং ১৬ বৎসর বয়সে তার আম্মার সাথে হজ্জে গমন করেন। দু'বছর মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করে ইলমে হাদীসের গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেন। আঠার বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন এবং চাঁদনী রাতে রওযা মোবারকের পাশে বসে তার প্রসিদ্ধ দু'টি কিতাব "কাযায়াস সাহাবাতি ওয়াত্তাবেয়ীন ও 'আত্তারিখিল কাবির' রচনা করেন।

তিনি এক হাজার আশিজন উস্তাদ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তবে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এবং আলী ইবনিল মাদানী থেকে বেশি উপকার বা ফয়েজ অর্জন করেন। তার প্রখর স্মৃতি শক্তির দৃষ্টান্ত একমাত্র তিনিই ছিলেন। বাগদাদের আলেমরা তার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য একশত হাদীস উলট-পালট করে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তারা তার ইলম ও স্মৃতিশক্তির মোকাবেলায় হার মানতে বাধ্য হন। তিনি অংশীদার হিসাবে তার পিতার অনেক ধন-দৌলত পান, কিন্তু সমস্ত ধন-দৌলত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দেন এবং নিজে অল্প খাবার খাওয়ার উপর আমল করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. লিখেন, তিনি কখনও শুধু তিনটি বাদাম খেয়ে পুরো দিন কাটিয়ে দেন। একবার তিনি অসুস্থ হলে ডাক্তার তার প্রস্রাব পরীক্ষা করে বললেন, রোগী খাবারের সাথে তরকারী খায় না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, প্রায় বিশ বছর নাগাদ তরকারী খাই না, বিশ বৎসর পূর্বে খেয়েছি।

একবার নামায শেষে তিনি তার ছাত্রদেরকে বললেন আমার পিঠ দেখ। তারা পাঞ্জাবী খুলে দেখল যে, তার গায়ে ভীমরুল সতেরটি দংশন করেছে এবং দেহের অংশ ফুলে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি নামায ছাড়েননি কেন? তিনি বলেন, এমন সূরা তেলাওয়াত করছিলাম যে, অন্তর তা শেষ করতে চাচ্ছিল না। তার ইলম ও বুযর্গী সম্পর্কে ইমাম মুসলিম রহ. বলেন-

أَشْهَدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার মত দুনিয়াতে কেউ নেই।)

তিনি তার জীবনে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি নিশাপুর গমন করলে লোকজন শহরের বাইরে এসে অভ্যর্থনা জানাল। ইমাম মুসলিম রহ. বলেন, এ ধরনের অভ্যর্থনা সাধারণত কোন বাদশাহকেও জানানো হয় না। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে যখন তার দরস শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসতে শুরু করল এবং তাদের উপস্থিতির ফলে মসজিদ ভরপুর হয়ে যেত। ফলে বাইরে দাঁড়িয়ে তারা তার দরস শুনত। তখন কিছু হিংসুক লোক খালকে কুরআনের মাসআলা নিয়ে তার মধ্যে এবং ইমাম যুহলীর মধ্যে ভুল বুঝা

বুঝির সৃষ্টি করল। এই মাসআলা নিয়ে গোটা দেশে হৈ চৈ শুরু করে দিল। নিশাপুরে যেহেতু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর অনুসারী ছিল সেহেতু তারা ইমাম বুখারীর উপর কুধারণা পোষণ করতে শুরু করল।

এরপর যখন তিনি এই শহর থেকে বের হয়ে চলে আসেন, তখন তার সাথে একজন লোককেও শহরের বাইরে আসতে দেখা যায়নি। কাউকে এরূপ আসতেও দেখা যায়নি, আবার কাউকে এরূপ যেতেও দেখা যায়নি।

বুখারার বাদশাহ খালেদও তার বিরোধী হয়ে গেল, যখন তিনি তার ছেলেদের বাসায় যেয়ে পড়াতে অস্বীকার করেন ফলে জোরপূর্বক তাকে বুখারা থেকে বহিস্কার করে দিল। তখন তিনি সমরকন্দে প্রবেশ করতে চাইলে সেখানের আলেমরা তাকে সমরকন্দ প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অতঃপর নিরুপায় হয়ে তিনি তার খালাম্মার এলাকায় অবস্থান শুরু করলেন এবং ৬২ বছর বয়সে ২৫৬ হিঃ ইলমে হাদীসের প্রাণপুরুষ ইহকাল ত্যাগ করেন। তার ইন্তেকালের পর তার কবর মোবারক থেকে সুঘ্রাণের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন তা দেখে আশ্চার্যান্বিত হল। প্রায় চল্লিশ দিন এ অবস্থা ছিল। মূলতঃ আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নয়, কারণ বাস্তবতা হল শেখ সাদী রহ. এর পংক্তিদ্বয়–

جمال همنشیں درمن اثر کرد
وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

আমার সাথীর সৌন্দর্য আমার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে,

তা না হলে আমি শুধু মাটির ঢিলাই ছিলাম।

তার ৯০ হাজার শাগরেদ তার কাছে বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করেছে। তার কিতাবের পুরা নাম হল–

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اَحَادِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ

তাকে মাযহাবের আলেমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মাযহাবের বলে দাবী করে, কিন্তু সঠিক কথা হল তিনি স্বয়ং নিজেই মুজতাহিদ ছিলেন।

হযরত শাহওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি সহীহ বুখারী শরীফের মর্যাদার স্বীকৃত দিবে না সে বেদায়াতী ও পথভ্রষ্ট। আলেমদের বক্তব্য–

ইমাম বুখারী রহ. এর ফেকাহ তার তরজমাতুল বাবের (শিরোনাম) মধ্যে রয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম জাফর সাদেক রহ. ও ইমাম শাফী রহ. থেকে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করেননি। তবে ইমাম মালেক রহ.

থেকে পাঁচটি রেওয়ায়েত এবং ইমাম আহমদ থেকে শুধু দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এর কারণ হল, তিনি বুঝতেন যে, আইয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনদের থেকে হাদীস বর্ণনা করার লাখ লাখ লোক রয়েছে। অতএব আমি ঐ সকল নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করব, যাদের থেকে হাদীস ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। বুখারী শরীফের প্রায় শতাধিক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষন ও টীকা গ্রন্থ রয়েছে। সবচেয়ে অধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারী। হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. বলেন বুখারী শরীফ খতম করার দ্বারা দুর্ভিক্ষ দূর হয়। এবং অনাবৃষ্টির সময়ও এর খতমের বরকতে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

এক মুহাদ্দিস বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একশত বিশ বার বুখারী শরীফ খতম করেছেন এবং প্রতিটি উদ্দেশ্যের সফলতা পেয়েছেন। তাই ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, সহীহ বুখারী শরীফ খতম করা রোগ-ব্যাধি বিপদ-আপদ, শত্রুর ভয় ও পরাজয়ের সময় খুবই ফলদায়ক।

আমি ২৮ মে ১৯৯২ মুফতিয়ে আযম ও অন্যান্য সাথীদের সাথে খরতঙ্গ সফর করলাম যা সমরকন্দ থেকে ২২ কিঃমিঃ দূরে এবং সেখানে ইমাম বুখারী রহ.-এর শেষ বিশ্রামাগার অবস্থিত, প্রশস্ত রাস্তার দু'ধারে ফুলের বাগান বিদ্যমান। ইমাম বুখারী রহ.–এর মাজার খরতঙ্গ জনপদের শুরুতেই অবস্থিত। আমরা মাজারে গিয়ে সর্বপ্রথম ইসালে সওয়াব করি। হাফেজে হাদীস মাওলানা জাফর সাহেবকে আমি বললাম, আমি এখানে বুখারী শরীফ থেকে কিছু হাদীস শুনাতে চাই। আমি যখন হাদীস শুনাতে লাগলাম, তখন মনে হচ্ছিল ইমাম বুখারী রহ. স্বয়ং সামনে বসে হাদীস শুনছেন। অধিকাংশ উপস্থিতিদের উপর প্রতিক্রিয়া হল। হাদীসের নূর ও বরকত এমনভাবে বর্ষিত হতে লাগল, যা ভাষায় বা লিখে ব্যক্ত করার মত নয়। সেই সময়টা জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে রয়েছে। ইসালে সওয়াব শেষে মসজিদে প্রবেশ করি। তখন ইমাম বুখারী রহ. এর মাদরাসার ছাত্ররা অভ্যর্থনা জানাল। নামায শেষে ইমাম সাহেব আমাকে বয়ান করার জন্য বললেন। আমি ইলম সংক্রান্ত বিষয়ে আরবী ভাষায় বয়ান করি। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব অনুবাদ করে শুনালেন। ইমাম উসমান খান আমার বয়ান শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং তার এখানে মেহমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

আমি তার দাওয়াত কবুল করি। ইমাম উসমান খান বিশেষ মেহমানখানা খুলে দেন, যা সরকার সাধারণত বিভিন্ন দেশের আগত রাষ্ট্রীয় মেহমানদের জন্য তৈরি করেছে। আমি মেহমানখানায় অবস্থান করলাম এবং বাকী সাথীরা মসজিদে অবস্থান করল। ইমাম উসমান খান তিন দিন আমাদের মেহমানদারী করলেন। আমি অধিকাংশ সময় ইমাম বুখারী রহ. এর মাজারে মুরাকাবা করে অতিবাহিত করি। মুরাকাবা থেকে অবসর হলে লোকজন বায়আত হওয়ার জন্য সমবেত হত।

আলহামদুল্লিাহ! তিন দিনে ইমাম উসমান খান ও সহকারী খতীবসহ মাদরাসার সকল ওলামায়ে কেরাম ছাত্র যিয়ারতকারী ও খানকার খাদেম সকলেই বায়আত হলেন।

ইমাম বুখারী রহ. এর মাজারের সন্নিকটে একটি লাইব্রেরী রয়েছে যার মধ্যে বিভিন্ন দেশের ছাপানো কুরআন শরীফ রয়েছে। এক কপি কুরআন শরীফ জেনারেল জিয়াউল হক শহীদের নির্দেশে এখানে রাখা হয়েছে।

ইমাম মাওলানা উসমান খান আমাকে বললেন, হযরত! আপনি পাকিস্তান থেকে এক কপি কুরআন এনে দিলে আমরা এখানে রেখে দিব, তাহলে আপনার কথা আমাদের স্মরণ হবে। আমি জনাব ইয়াকুব তাবানীর মাধ্যমে সুন্দর ছাপার এক কপি কুরআন মজীদ এনে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সেখানকার নিকটবর্তী পাহাড়ী এলাকার ওলামা ও ছাত্ররা দলে দলে এসে বায়আত হলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ হয়রান হয়ে যায় যে, এত লোককে কে সংবাদ দিয়েছে যে, পাগলের ন্যায় ছুটে আসছে?

ইমাম উসমান খান বলেন, হযরত! আল্লাহ তাআলা এখানে আপনার সাথে কবুলের মুয়ামালা করেছেন!

ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الْاَرْضِ

অতঃপর জমীনে তাদের জন্য গ্রহণযোগ্যতা রেখে দেয়া হয়েছে।

এক স্মরণীয় মুরাকাবা

খরতঙ্গের মেহমানখানায় অবস্থানকালে তৃতীয় দিন তাহাজ্জুদ নামাযের পর ইমাম বুখারী রহ. এর মাজারে উপস্থিত হই। ইমাম বুখারী রহ. এর খেদমতে বসে মুরাকাবা করি এই আশায়, যেন তার মাজারে যে নূর ও বরকত বর্ষণ হচ্ছে তা থেকে কিছু আমার নসীব হয়। মুরাকাবা অবস্থায় আমি আমার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। এক ঘন্টা কী অবস্থায় অতিবাহিত হয় তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। এই মুরাকাবার পর হাদীসে রাসূল সা. এর সাথে অন্তরের মহব্বত অধিক হারে বেড়ে যায়। যেন ইমাম বুখারী রহ. এর ক্বালব থেকে এক নূর বের হয়ে আমার কলবে আসছে তা আমি অনুভব করতে পারি। সফরকালীন সময়ে এই নূরের বরকত অনুভব হয়।

ঐতিহাসিক দর্পনে বুখারা নগরী

ইতিহাসের আলোকে বলা যায় যে, বুখারা শুরু শতাব্দীকালের প্রাচীন শহর নয়, বরং এই নগরী হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের ৩৩০ বছর পূর্বের প্রাচীন শহর। ইস্কান্দার আজমের সময়ে এই শহর বাণিজ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ সূতিকাগার

ছিল। প্রথম দিকে এখানে বুধ গ্রহের বিশ্বাসীরা বসবাস করত। তারা তাদের উপসনালয়ের নাম রাখে বিহারা। অতঃপর সময়ের অবর্তনে বেখারা ও পরবর্তীতে বুখারায় রূপান্তরিত হয়। এই নামেই এই শহর প্রসিদ্ধি লাভ করে। আটশত বৎসর পর্যন্ত এখানে যরতুস্তের অনুসারীদের কেন্দ্রভূমি ছিল। ৭১১ খৃষ্টাব্দে যখন মুহাম্মদ বিন কাসেম আরব উপসাগর পেরিয়ে সিন্ধু বিজয় করে তখন এক আরব সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম আমু দরিয়া পেরিয়ে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করে মাত্র দু'বছরে বুখারা সমরকন্দ বিজয় করে প্রাচ্যের সিংকিয়াং ও কাশগর পর্যন্ত পৌছে যান। এটি ছিল এই অঞ্চলের সৈনিকসূলভ বিজয়। মূলত এই অঞ্চলে দীন ইসলাম হযরত কাসেম ইবনে আব্বাস এবং হযরত সাঈদ ইবনে উসমান ইবনে আফফান রহ.-এর মাধ্যমেই এসেছিল।

যরআফশা দরিয়া পেরিয়ে যখন আমরা শহরে উপকণ্ঠে পৌছি, তখন বড় বড় মিনারের ফাঁকে এক বিরাট গেট দৃষ্টিগোচর হয়। বুখারার চারটি গেটের মধ্যে এটাই নিরাপদ ছিল। এর সাথে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া প্রাচীরগুলোও দৃষ্টিগোচর হল।

নয়শত হিজরীতে বুখারা সাসানী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। যার সীমারেখা আফগানিস্তান হেরাত এবং ইরানের ইস্পাহান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন বুখারার জনসংখ্যা আড়াই লাখ ছিল এবং আড়াইশত দীনী মাদরাসা ছিল। সুদূর ইয়ামান ও উন্দুলুস থেকে এলেম পিয়াসী ছাত্ররা এসে ইলমের পিপাসা মিটাত। তখন বুখারা শুধু দীনী শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যাসমূহের প্রাণ কেন্দ্রও ছিল। সাসানী আমীরের লাইব্রেরীতে প্রায় ৪৫ হাজার কিতাব ছিল। তাই তখন বুখারাকে বাগদাদের সমতুল্য ধরা হত। এই লাইব্রেরী থেকেই হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা ফয়েজ নিয়েছেন। ইবনে সিনাই সর্বপ্রথম এরিস্টটলের ভাষান্তর আরবী ভাষায় করেন। অতঃপর (القانون) আল কানূন কিতাব রচনা করেন। যা আজ পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইনসাইক্লোপিডিয়া হিসাবে বিবেচিত।

মীরে আরব মাদরাসা

আমরা প্রথম বুখারা পৌছলে কারও সাথে আমাদের পরিচয় ছিল না। তবে এতটুকু জানা ছিল যে, এখানে মীরে আরব নামে একটি মাদরাসা আছে। যার পাশেই ইমাম বুখারীর মসজিদ রয়েছে, যেখানে ইমাম বুখারী কোন এক সময় হাদীস শরীফের পাঠদান করতেন। মীরে আরব-এর নাম শুরুতে আমীরে আরব ছিল। অতঃপর তিন শত বছরের ব্যবধানে এটি মীরে আরব হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মীরে আরবের শাহী গেইটে এই হাদীস শরীফ লেখা রয়েছে-

مَنْ كَانَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَتِ الْجَنَّةُ فِيْ طَلَبِهٖ

যে ব্যাক্তি জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে বের হয়, জান্নাত তাকে তালাশ করে।

এই মাদরাসায় প্রায় দু'শত ছাত্র আবাসিক থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। দু'ভবন বিশিষ্ট এই সুন্দর মাদরাসা কমিউনিস্টদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। বর্তমানে উজবেকিস্তানের বড় বড় মাদরাসাসমূহের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাদরাসা।

আমরা যেদিন মাদরাসায় যাই সেদিন শুক্রবার থাকায় ছাত্ররা যার যার বাড়ীতে চলে গিয়েছিল, তবে কয়েকজন উস্তাদ ছিলেন। তাদের সাথে পরিচয় হলে সর্বপ্রথম তারা আমাদেরকে চা পান করার দাওয়াত দিলেন। অতঃপর তাদের একজন আমাকে বললেন– আজ জুমআর খুতবা ইমাম বুখারীর মসজিদে আপনাকেই দিতে হবে।

ইমাম বুখারীর মসজিদে স্মরণীয় খুতবা

নামাযের সময় অতি সন্নিকটে, তাই আমরা মাদরাসার সামনে নির্মিত হাউজের পাশ দিয়ে মসজিদে আসি। এই মসজিদে প্রায় ৫০ হাজার লোক এক সাথে নামায আদায় করতে পারে। এটির নির্মাণ এমনভাবে করা হয়েছে যে, মাইক ছাড়া বয়ান করলে আওয়াজ দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়ে সকল লোকদের কানে পৌঁছে যায়। কিছু সময় মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা জান মুহাম্মদ–এর কামরায় বসি। তিনি পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন এবং মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেবের সাথে পরিচয় করান। যিনি উজবেকিস্তানের মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান। বাচ্চাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এখানে এসেছেন।

আমাদের ইচ্ছা ছিল জুমআর নামাযের পূর্বের বয়ান মাওলানা দিবেন। কিন্তু তিনি আমার চেহারা প্রতক্ষ্য করে আমাকেই বয়ান করার অনুরোধ জানালেন। বয়ান করতে মসজিদে গিয়ে দেখি মসজিদ নামাযীদের দ্বারা টইটুম্বুর। আমি কুরআন মজীদের আজমত সম্পর্কিত আয়াত তেলাওয়াত করি এবং কুরআন মজীদ আমার মাথায় রেখে বলি যে এই কুরআন আমানত। তখন মসজিদে পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে। লোকজন বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে, মাওলানা আব্দুল লতীফ আমার চেহারা খুব গভীরভাবে অবলোকন করছেন যেন তিনি অনেক তালাশের পর আমার সন্ধান পেয়েছেন। বয়ানে এত প্রতিক্রিয়া ছিল যে, শ্রোতামণ্ডলী তন্ময় হয়ে বয়ান শুনছে এবং আবেগাপ্লুত হচ্ছে।

মাওলানা আব্দুল লতীফ অত্যন্ত আবেগ ও জোশ সহকারে অনুবাদ করছেন এবং কাঁদছেন। কুরআন মজীদ মানুষের অন্তরে নিজেই তার রাস্তা করে নেয়। আরবী খুতবা দেয়ায় সোনায় সোহাগা হয়ে গেল। নামাযের পর এক আরবী যুবক আমাকে সম্বোধন করে বলল, হযরত! আপনি আমাদেরকে ইমাম বুখারী রহ. এর জামানা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এক উজবেকী যুবক ক্রন্দনরত অবস্থায় এগিয়ে

এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে এমন জোরে চাপ দিল যে কিছুক্ষণের জন্য আমার শ্বাস নেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। অতঃপর বলল, আপনি আহলে বুখারার হৃদয় জয় করে নিলেন।

প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে আমার শরীর থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছিল। মাওলানা জান মুহম্মাদ খান কতিপয় যুবককে ইশারা করলেন, তারা আমাকে বেষ্টনী দিয়ে রাখে এবং লোকদেরকে শুধু মুসাফাহা করতে বলে।

আলহামদুলিল্লাহ! সকলের সাথে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য হয়। মীরে আরব মাদরাসার নাজিম সাহেব আমাকে বলেন, হযরত! দুপুরের খাবার প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি খানা খেয়ে নিন।

নাজিম সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখি তিনি প্রায় পঁচিশজন লোকের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন।

পাতলা কোট পরিহিত ও দাড়িবিহীন এক তুর্কী আলেম আমার পাশেই বসল। নাজিম সাহেব সবার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেখানে মীরে আরব মাদরাসার অর্থসচিব ও শিক্ষা সচিব আগমন করেন।

আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আমি উত্তর দেওয়ার পূর্বেই মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব বলে উঠেন– "তিনি গোটা পৃথিবীর নকশবন্দীয়াদের নেতা। তুর্কী আলেম এই উত্তর শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।" অতঃপর বলল– "পাকিস্তানের না গোটা পৃথিবীর?"

মাওলানা বললেন, "গোটা পৃথিবীর। এতে কোন সন্দেহ নেই।"

তখন আমি আমাকে তিরস্কার করি, ওহে! তোমার আমলী অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অথচ তোমার পরওয়ারদেগার তোমার উপর অনুগ্রহশীল। তোমার উচিৎ তোমার রবের নামের উপর কুরবান হয়ে যাওয়া।

বকরীর গোশত অত্যন্ত পরিপক্কতার সাথে ভুনা করা হয়েছিল। ফলে এর সুগন্ধে সবাই মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছিল। মেজবান আমাদের খাবার খেতে বললেন। সবাই তৃপ্তি সহকারে খাবার খেয়ে নেয়।

শায়খে বুখারা হযরত তিশা বাবার সাথে সাক্ষাৎ

দাওয়াত শেষে মাওলানা জান মুহাম্মদের কাছে কালা মসজিদে ফিরে আসি। মাওলানা বললেন, আমার পীর ও মুর্শিদ বর্তমান বুখারার সকল ওলামা ও বুযুর্গদের পীর। সে কারণেই তাকে শায়খে বুখারা বলা হয়। মূলতঃ তার নাম হযরত কাবিল খান, কিন্তু তিনি তিশা বাবা নামে প্রসিদ্ধ। আমি তাকে ফোন করেছি। তিনি এখনই এসে যাবেন। গত বিশ বছর থেকে বুখারার রূহানী জগতে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত। আর তিনি নকশবন্দীয়া সিলসিলার সম্রাট।

একথা শুনে আমার অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেল। আমরা বসা থাকতেই তিশা বাবা তাশরীফ আনেন। আমার সাথে খুব আন্তরিকতার সাথে মোলাকাত করেন। পরিচয় পর্ব শেষে বলেন যে, আজ রাতে আমি স্বপ্নে আমার ঘরে একটি নূরের টুকরা প্রবেশ করতে দেখেছি। স্বপ্ন দেখে পেরেশান হয়ে যাই যে, এর তাবীর বা ব্যাখ্যা কি? এখন আপনার সাথে মোলাকাত করে আমার ধারণা এ নূরের টুকরা আপনিই।

আপনি অনুগ্রহ করে আমার বাসায় তাশরীফ আনুন। আমি আপনাকে সিলসিলায়ে আলীয়ার সকল বুযর্গানে দীনের মাজার যিয়ারত করাব। আমি তো প্রথমেই চিন্তিত ছিলাম যে, বুযর্গানে দীনের মাজারে কীভাবে উপস্থিত হবো? তাই তার কথা শুনে খুশীতে বাগা বাগ হয়ে যাই। আমি বললাম, আপনার নির্দেশ পালন করতে আমি সদা প্রস্তুত। মসজিদে কালা থেকে তিশা বাবার বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। সেখানে জিকিরকারী কিছু লোক পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। পৌঁছে প্রথমেই আমরা চা পান করি। চা পান শেষে আসরের নামায আদায় করি। আসরের নামাযান্তে কয়েকজন আলেম তাশরীফ আনেন। তারা আমাকে সিলসিলায়ে আলীয়া সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। আমি তাদের প্রশ্নাবলীর জওয়াব দেই। এদিকে তিশা বাবা আমাদের প্রশ্নোত্তরের দৃশ্য অবলোকন করে অত্যন্ত খুশী হন।

ইতিমধ্যে মসজিদে শাহ নকশবন্দের ইমাম ও খতীব আলহাজ্জ মোখতার তাশরীফ আনেন। পরিচয় পর্ব শেষে তিনি মোজাদ্দেদে আলফে সানী রহ. এর মাকতুবাত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে সুলূকে নকশবন্দীয়া থেকে সুলূকে মুজাদ্দেদিয়া পর্যন্ত পৌঁছে। আলোচনা শেষে হাজী মোখতার বলেন, হযরত! অদ্যবধি আমরা যেসব বিষয়াদি নিয়ে সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম আজ আপনি অল্প সময়ে তা নিরসন করে দিয়েছেন। ফলে আমাদের কোন প্রশ্ন অবশিষ্ট নেই। এই মাহফিল মাগরিব থেকে ইশা, ইশা থেকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবসাদ ও ক্লান্তির কারণে সবার চোখে ঘুম এলে তিশা বাবা মাহফিল শেষ করে দু'আ করে দেন।

রাতে ঘুমানোর জন্য তিশা বাবা তার ঘরের একটি কামরায় ব্যবস্থা করে দেন। পূর্ব থেকেই আমি ক্লান্ত ছিলাম। তাই গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাই। ঘুম থেকে জেগে ওযু করার জন্য কামরার বাইরে বের হই। বের হয়ে দেখি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও তিশা বাবা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম, বাবা আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভিতরে আসেননি কেন? তিনি বলেন, আপনি ভিতরে আরাম করছেন। তাই আমি বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছি। একথা বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন যে, আপনার কাছে যা কিছু আছে তা থেকে আমাকে কিছু দান

করেন। আমি বললাম আপনি তো বিরাট বড় শায়খ। তাহাজ্জুদ শেষে মুরাকাবায় বসলে তিশা বাবা আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে গেলেন। আমাকে বলেন, আমার লতীফাসমূহ তাজা করে দিন। আমি আমার শায়খ থেকে মুরাকাবায়ে মা'ইয়্যত পর্যন্ত সবক আদায় করেছি, এখন আপনি আমার শায়খ মুজাদ্দেদীর আসবাক অতিক্রম করিয়ে দিন। একথা বলে তিশা বাবা কান্না জুড়ে দেন। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আমারও একই অবস্থা হল, অনেকক্ষণ যাবত আমরা উভয়ে কাঁদি। অবশেষে তাকে বায়আতের কালিমাত পড়িয়ে আসবাক বলে দেই।

মসজিদে আবু হাফস কবীর রহ.

সকালের নাস্তা খেয়ে আমরা মসজিদে আবু হাফস কবীর রহ. এ আসি। আবু হাফস কবীরে হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর এক শাগরিদ ছিলেন। এই মসজিদ তার স্মরণার্থে নির্মাণ করা হয়। তিনি এই মসজিদের সন্নিকটে এক উঁচু টিলায় শায়িত আছেন। তার পাশেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বংশের বারজন শায়খকে দাফন করা হয়। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ইসালে সওয়াব করি।

মসজিদের ইমাম পান করার জন্য চা এবং খাওয়ার জন্য এক জাতীয় ফল পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর সাক্ষাৎ করার জন্য লোকজন আসতে শুরু করল। হযরত তিশা বাবা নিজেই আমার পরিচয় দিলেন। ফলে আমার জন্য কিছুটা সহজ হল। মাওলানা আব্দুল্লাহর খুশীর সীমা ছিল না। হযরত তিশা বাবা নিজেই বললেন, আমি তার কাছে নতুন করে বায়আত হয়েছি। একথা শুনে মাওলানা আব্দুল্লাহর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। বুখারার লোকজন একথা জেনে চুপ চাপ বসে আমার চেহারার পানে তাকিয়ে ছিল। এত মহব্বত ও সম্মানের দৃষ্টিতে আমাকে সম্ভবত কমসংখ্যক লোকই দেখেছে। হযরত তিশা বাবা বললেন 'আমাদেরকে বুযুর্গানে দীনের মাজারসমূহ যিয়ারত করতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'টি গাড়ী এসেছে। চলুন যিয়ারত করতে, যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হবে।

হযরত সাইয়েদ আমীর কালাল রহ.

দু'গাড়ীতে চড়ে বুখারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। সর্বপ্রথম হযরত সাইয়েদ আমির কালাল রহ. এর মাজারে উপস্থিত হই। মাজারটি এক সাধারণ কবরস্থানে বিদ্যমান। কমিউনিস্টরা এই কবরস্থানে বুলডোযার চালিয়ে সমতল করে দেয়। শুধু টিলার উপরের কবরগুলো নিরাপদ ছিল। কবরের পাশে দাঁড়ানোর অল্প একটু স্থান ছিল। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে ইসালে সওয়াবের পর মুরাকাবা করি।

হযরত কাবে আহবার রহ.

তার কবর একটি টিলার উপরে অবস্থিত। কবর কয়েক মিটার লম্বা করে নির্মাণ করা হয়েছে। চারদিক জনমানবহীন দেখা যাচ্ছিল। উপরে উঠার সিড়ি কমিউনিস্টরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। মাজারসংলগ্ন মসজিদে দু'রাকাআত নামায আদায় করে বন্ধু-বান্ধবদের জন্য বিশেষ দু'আ করি। নিচে নামলে হযরত তিশা বাবা বলেন, এখানে একটি 'পানির কুয়া রয়েছে, যার পানি খুবই সুমিষ্ট ও ঠাণ্ডা। আমাদের বুযর্গানে দীন এখানে আগমন করলে এই কুয়ার পানি পান করতেন। আমারও আগ্রহ হয়, পানি পান করে বাস্তবিকই অন্য এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব হয়, যেন মিষ্টি দুধ পান করেছি।

কাসরে আরেফা

বুখারা থেকে প্রায় বিশ কি. মি. দুরে কাসরে আরেফা অবস্থিত। প্রসিদ্ধ আছে যে, শুরুতে এর নাম কাসরে হিন্দুয়া ছিল। একবার খাজা বাবা সামাসী রহ. ও আমীর কালাল রহ. এখানে এক দাওয়াতে আসেন, মেজবান তার শিশু ছেলেকে তাদের কাছে দু'আর জন্য নিয়ে আসেন। হযরত বাবা সামাসী রহ. তাকে দেখে হযরত কালাল রহ. কে বলেন 'আমি তার মধ্যে সৌভাগ্যের নিদর্শন দেখছি। যদি জীবিত থাকি তাহলে এর তারবিয়ত করব। আর যদি জীবিত না থাকি তাহলে এর তাবরিয়ত আপনি করবেন। এই শিশু একদিন বড় হয়ে আমাদের সিলসিলার বড় শায়খ হবে এবং তার কারণেই কাসরে হিন্দুয়াকে কাসরে আরেফা বলা হবে। পরবর্তীতে হযরত বাবা সামাসী রহ. এর কাশফ সঠিক প্রমাণিত হয়। আজ সেই স্থানকে কাসরে আরেফা বলা হয়।

আমরা কাসরে আরেফা পৌঁছে দেখি মসজিদে নামায হচ্ছে। নামায শেষে মসজিদের ইমাম ও খতীব হাজী মোখতার সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদেরকে তার হুজরায় নিয়ে গেলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ আপ্যায়ন করলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের প্রোগ্রাম কি? আমি বললাম এক সপ্তাহ বুখারা ও তার আশপাশের জন্য নির্ধারণ করেছি। হাজী মোখতার মুচকি হেসে বললেন এর জন্য এক মাস সময় অতি নগণ্য।

অবশেষে তিনি প্রাচীনকালের ইতিহাস শুনাতে লাগলেন–

কমিউনিস্টরা তাদের সময় কাউকেই এই মাজারে আসতে দিত না, মসজিদকে গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হত। একজন পুলিশ সর্বদাই পাহারারত থাকত। কাউকে এদিকে আসতে দেখলেই তাকে ধরে জেলে পাঠিয়ে দিত। তার কথা শুনে আমি বললাম, অনুমতি প্রদান করলে আমরা মাজার শরীফে উপস্থিত হব। হাজী মোখতার বললেন যে, আমরা মসজিদ ও খানকা মেরামত করাচ্ছি। মেরামত

করা শেষ হলে আমি আপনাকে দাওয়াত দিব। তখন আপনি আপনার মুরীদানসহ মসজিদ ও খানকায় আগমন করবেন।

আমি আমার বন্ধু-বান্ধব মাজারে উপস্থিত হয়ে দেখি মাজারটি একটি উঁচু টিলার ন্যায় তৈরি করা হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! মন ভরে মুরাকাবা করলাম। প্রথম সবক থেকে শুরু করে "দায়েরায়ে লা'তাঈন" পর্যন্ত সবকগুলো শাহ নকশবন্দ রহ. এর সামনে এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করলাম, যেমনভাবে কোন বড় শিক্ষকের সামনে এক ছোট বাচ্চা আলিফ, বা শুনিয়ে আনন্দিত হয়।

আল্লাহর ওপর ভরসা

দু'আ শেষে এক ব্যক্তি মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের সাথে কানাকানি করতে লাগল। মাওলানা আমাকে বললেন, হযরত! মাওয়ারাউন্নাহারের সূফিদের এক জামাত মসজিদে বসে আছেন। আপনাদের সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। আমি বললাম তাদেরকে আমার ব্যাপারে কে অবগত করালো? মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ জানেন, আমি বললাম 'তাদেরকে এখানে নিয়ে আসুন, প্রায় ২১ জন লোকের একটি জামাত, যাদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত হচ্ছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুন্নত দ্বারা সজ্জিত। কপালে সেজদার চিহ্ন, চেহারায় বিনয়-নম্রতার নিদর্শন, মুখে আল্লাহর জিকির, অধিকাংশের বয়স ৪০ এবং ৬০ এর মাঝামাঝি। তারা এমন আদবের সাথে আগমন করল যে, তাদেরকে দেখে অন্তর প্রভাবিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আল্লাহওয়ালাদের এই জামাত অতিরিক্ত মহব্বতের কারণে আমাকে জড়িয়ে ধরল, প্রাণ ভরে মিলিত হল। আমি তাদের অবস্থা দেখে আশ্চার্যান্বিত হলাম। বসার পর আমির সাহেব বললেন, আমরা কিছুদিন পূর্বে এক শায়খের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। তবে ইন্তেকালের পর আমরা চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে ঘুরছিলাম কীভাবে আমাদের একজন পথ প্রদর্শক পাব। অনেকদিন ইস্তেখারা ও দু'আ করলাম। অবশেষে আমরা শাহ নকশবন্দ রহ. এর মাজারে উপস্থিত হয়ে দু'আ করার জন্য প্রোগ্রাম করলাম। এখানে পৌছে যখন আপনাকে বন্ধু-বান্ধবসহ মুরাকাবা করতে দেখলাম, তখন অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, অন্তরের নৌকা এই শায়খের হাওয়ালা করে দেওয়া দরকার। এখন আমরা সকলেই বায়আত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি এবং অনেক দেরী করে এসেছি। আমাদেরকে কবুল করে নিন।

আমি তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিনি এবং চিন্তা করি যে, হতে পারে তাদের কেউ কিয়ামতের দিন আমার জন্য ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমও হতে পারে। সে

কারণেই তাদের সবাইকে বায়আতের কালেমা পাঠ করাই। একদিকে শাহ নকশবন্দ রহ. এর মাজারের নূর, অপর দিকে তাদের আলোকজ্জ্বল চেহারা। এক চমৎকার দৃশ্যের অবতারণ হয়। মুরাকাবা শেষে তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার এক ভিন্ন মজা উপভোগ করি। যেমনভাবে সুন্দর পরিষ্কার পাত্রে দুধ ঢালতে আনন্দ উপলব্ধি হয়, তেমনিভাবে তাদেরকে তাওয়াজ্জুহ দিতে আনন্দ উপলব্ধি হল। মুরাকাবা শেষে তারা মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের কাছে ঠিকানা লিখে দেয় এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় গ্রহণ করে।

এই জামাত চলে যাওয়ার পর জিয়ারতকারীদের অনেকেই বায়আত হওয়ার জন্য একত্রিত হয়ে গেলেন। মসজিদের মুয়াযযিন আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবও বায়আত হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাদেরকে বায়আতের কালেমা পাঠ করিয়ে আমি তাদেরকে সিলসিলায়ে আলীয়ার আমলসমূহ বর্ণনা করছি। ইতোমধ্যে কতগুলো মেয়েদের একটি জামাত বের হয়ে মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে ইশারা করে ডাকল এবং কিছুক্ষণ বিভিন্ন প্রশ্ন করল। আমলসমূহ বলে দেওয়ার পর মাওলানা আমার কাছে এসে আশ্চর্য! আশ্চর্য! বলতে লাগল এবং সাথে সাথে মাথাও নাড়াতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মাওলানা কী হয়েছে? তিনি বললেন, মেয়েদের এই জামাত তুর্কমিনিস্তান থেকে এসেছে। প্রথমত তারা আমাকে ডেকে আপনার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। অতঃপর বায়আত হওয়ার আবেদন পেশ করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কী কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে? মাওলানা বললেন যে, তাদের একজন বলেছে যে, যদি এই ব্যক্তি কোন মাহফিলে উপস্থিত থাকেন তাহলে উপস্থিত সবার দৃষ্টি তার দিকেই থাকবে। দ্বিতীয় জন বলেছে যে, তার চেহারা দেখে প্রশান্তি অর্জিত হয়। অপর আরেকজন বলেছে যে, তার চেহারা দেখেই অন্যের পরিচয় করিয়ে দেয়া ছাড়াই বলা যায় যে, তিনি একজন অলৌকিক শক্তির অধিকারী।

পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক মেয়ে বলেছে যে, তাকে দেখতে তো শাহ নকশবন্দ রহ. এর ছেলে মনে হচ্ছে।

তাদের গ্রুপ লিডার বলেছে যে, আমার দরখাস্ত এই শায়খের নিকট পৌঁছিয়ে দিও যে, তিনি যেন ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে কাসরে আরেফায় অবস্থান করেন, যেন তাকে দেখে আমাদের ঈমান তাজা হয়। কমিউনিজম আমাদের অন্তর কালো করে দিয়েছে। এই ধরনের লোক দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং অন্তরে গোনাহর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহর মাধ্যমে তাদেরকে বায়আতের কালেমা পাঠ করালাম এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ মুরাকাবা ও ওকুফে ক্বালবীর বিস্তারিত আলোচনা রুশ ভাষায় বলে দেন।

এশার নামাযান্তে আমরা গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই। তাহাজ্জুদের সময় কিছু নফল নামায পড়ে ফজরের নামায পর্যন্ত শাহ নকশেবন্দ রহ.-এর মাজারে মুরাকাবা করি। ফজরের নামাযান্তে হুজরায় বসা ছিলাম। তখন ইমাম সাহেব হুজুরায় তাশরীফ আনলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন যে, আপনার চেহারা নূরে জ্বলজ্বল করছে, যেন মনে হয় সারা রাত শাহ নকশবন্দ রহ. এর খাস নূরের প্রভাব আপনার উপর পড়েছে। আপনি আমার ক্বলবে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করুন। আমি লতীফায়ে কলবের উপর আংগুলী দিয়ে চিহ্নিত করে দেই। অতঃপর খতীব সাহেবের উপর এত পাগলামী চড়াও হল যে, সুবহানাল্লাহ! তিনি আত্মভোলা হয়ে যান। পরের দিন আমাদের গাজদান আসার কথা ছিল। তাই আমরা ভগ্ন হৃদয় ও অশ্রুসিক্ত নয়নে দিনের ১২ টার সময় কাসরে আরেফা থেকে রওয়ানা হই।

খাজায়ে জাহানের দেশে

হযরত খাজা আব্দুল খালেক গাজদানী সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার অন্যতম বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত ইমাম মালেক-এর বংশধর। আল্লাহ তাআলা তাকে এত জনপ্রিয়তা দিয়েছিলেন যে, লোকজন তাকে খাজায়ে জাহান বলে সম্বোধন করে থাকে। তাকে হযরত খিজির আ. এক সবক তালকীন দিয়েছিলেন যাকে আমাদের সিলসিলায় 'মাখন' বলা হয় এবং এর নাম তাহলীলে খফী অর্থাৎ 'হাফসে দম' এর যিকির। তার ছয়টি উক্তি যা সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়। তিনি খালওয়াত দর আঞ্জুমান, সফর দর ওয়াতন, নজর বরকদম, হুশে দরদম ইত্যাদি পরিভাষা চালু করেছিলেন।

আমরা দুপুর একটায় গাজদান শহরে পৌছি। শহরে ঢুকেই আমি দু'তিন জনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'আমরা হযরত খাজা আব্দুল খালেক গাজদানী এর মাজারে যেতে চাই, লোকেরা তাদের অজ্ঞতার কথা বলল। চতুর্থজনকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল তিনি "খাজায়ে জাহান" উপাধিতে প্রসিদ্ধ। অমুক স্থানে তার মসজিদ। মসজিদে পৌছে নামায আদায় করি। মাওলানা আব্দুল্লাহ কামরায় গিয়ে ইমাম ও খতীবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আমার পরিচয় দেন। ইমাম সাহেব আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে আসলেন। তার পরনে পাতলা কোট ও চেহারা সুন্নত থেকে মাহরূম ছিল। সে দম্ভভরে আমাকে বলল যে, আমি এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছি যেখানে প্রায় পাঁচশত লোক উপস্থিত হয়েছে। আপনি আমার সাথে আসুন। আমি বললাম, আমরা মসজিদে বসলে সবচেয়ে উত্তম হবে। সে বলল, না না আপনারা অবশ্যই আমার সাথে যাবেন। আমি কর্তৃপক্ষকে দেখাতে চাই যে, দেখ! আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য কেমন কেমন লোকজন আসে। ইমাম সাহেবের হঠকারিতা দেখে তার সাথে যেতে রাজী হলাম।

এক বড় হোটেলের সামনে বিশাল ও প্রশস্ত স্থানে লোকজন দল বেঁধে চেয়ারে বসে আছে। পান করা ও করানো অবিরাম গতিতে চলছিল। অর্ধনগ্ন পোশাক পরিহিত কর্মী যুবতীরা লোকদেরকে গ্লাসের পর গ্লাস ভরে দিচ্ছিল এবং অনুষ্ঠানে একটি মাইকের ব্যবস্থাও ছিল, যাতে কিছু লোক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছিল। আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, এই অনুষ্ঠানের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক, আমাদের ফিরে যেতে দিন। কিন্তু ইমাম সাহেব তার হঠকারিতার উপর অটল রইল এবং আমাদেরকে বিরাট পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিল।

ইতোমধ্যে আল্লাহ তাআলার সাহায্য শুরু হল। ফলে মাইকে গানের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এক লোক ইমাম সাহেবকে বলল যে, আপনার সাথে যারা এসেছে, তারা কিছু বলতে চাইলে মাইকের সামনে চলে আসুক। মূলত আমি মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

অতঃপর আমি মাইকে এসে খুতবা পাঠ করলাম এবং আরবী ভাষায় বয়ান শুরু করে দিলাম। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব অনুবাদ করছিলেন। আমি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনাদের এখানে খাজায়ে জাহানের ন্যায় বিরাট বুযুর্গ রয়েছেন, আমরা তার কবর যিয়ারত করার জন্য হাজার হাজার মাইল সফর করে এসেছি।

আলোচনা করতে করতে আহলুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলার মহব্বতের বিষয় চলে এল। বিষয়বস্তু এমন হয়ে গেল যে, উপস্থিত সকলেই আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সকলেই আমার দিকে মনোনিবেশ করল। পথচারীরা দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তায় চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। নীরবতা বিরাজ করছিল এমন মনে হচ্ছিল যেন বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছিল। কুরআন তার প্রভাব বিস্তার করছিল। তৎকালীন হাকিম (প্রশাসক) এমন মনোযোগ সহকারে আমার আলোচনা শুনছিল, যেন কোন উচ্চপদস্থ অফিসার কোন জরুরী বিষয়ের উপর ব্রিফিং দিচ্ছে। আমি প্রায় আধা ঘন্টা বয়ান করে দু'আ করলাম। তখন চারদিক থেকে সালাম ও ধন্যবাদ আসতে লাগল। কর্তৃপক্ষ আমাকে একটি সুন্দর পোশাক পরিধান করাল। চারদিক থেকে ইমাম সাহেবের প্রতিও ধন্যবাদ আসতে লাগল। তখন তার মনোভাব পরিবর্তন হল। তিনি বললেন আপনারা আমার বাসায় অবস্থান করবেন।

গোয়েন্দা পুলিশের ভয়

রাতে ইমাম সাহেবের বাসায় অবস্থান করি। খাওয়ার সময় এক লোক আমাকে বারবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল। আমি তার দিকে পাল্টা দৃষ্টি দিলে সে বলতে লাগল, আমি এই শহরে গোয়েন্দা পুলিশের চাকুরী করি। আপনি আজ বয়ান করে লোকদের উপর প্রভাব ফেলেছেন। আমি কিছু সময় আপনার সাথে অবস্থান

করব। খানা শেষে দীর্ঘক্ষণ সিলসিলায়ে আলীয়ার বুযুর্গদের সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। রাত বারটায় আমরা মাহফিল শেষ করে ঘুমিয়ে গেলাম।

পরের দিন জুমআর খুতবা আমি প্রদান করি। ইমাম ও খতীব সাহেব আধা ঘন্টা আমার পরিচয় দিলেন। জুমআর নামাযের পর বায়আত হওয়ার জন্য লোকজন সমবেত হল। সমবেত সবাইকে ভীতু দেখাচ্ছিল। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, এই অবস্থা কেন? মাওলানা ইশারা করে বললেন, এই গোয়েন্দা পুলিশের ভয়ে। আমি তাকিয়ে দেখি রাতের সেই গোয়েন্দা পুলিশ। আমি তাকে ইশারা করে আমার কাছে এনে বসিয়ে দিলাম। উপস্থিত সবাই যখন দেখল যে, গোয়েন্দা পুলিশ আমার পাশেই এসে বসেছে, তখন তাদের ভয় চলে গেল।

আমরাও জানি

যখন বয়ান শুরু হল, মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব উজবেকী ভাষায় অনুবাদ করতে লাগলেন। তখন কিছু লোক যাদের চেহারা সূফিদের মত এবং পোশাক পরিচ্ছেদ খানকাওয়ালাদের ন্যায় ছিল; তারা অনুবাদে উচ্চস্বরে লোকমা দিতে শুরু করল। যখন আমি বয়ান করি, তখন চুপ থাকে। কিন্তু যখন মাওলানা আব্দুল্লাহ অনুবাদ করে তখন তারা উচ্চ আওয়াজে বলে, এ কথার উদ্দেশ্য এই এবং এই কথার উদ্দেশ্য এই" ইত্যাদি কথা। আমরা এক আশ্চর্য বিপদে পড়ে গেলাম। আমি বয়ান অব্যাহত রাখলাম। কিন্তু তারা মাহফিলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেই থাকল। আমি ভাবলাম যে, তাদেরকে বাতেনী তাওয়াজ্জুহ না দিলে তারা বিঘ্নতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে না। তাই আমি আমার হাতিয়ার ব্যবহার করলাম। তারা সমবেত সবাইকে বলছিল যে, সে যা কিছু বলছে আমরা তা পূর্ব থেকেই জানি। কয়েক মিনিটের তাওয়াজ্জুর পর তাদের একজন বলল, অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আমাদেরকে বাসায় যেতে হবে। দু'আ করে দিন। আমি দু'আ করার জন্য হাত উঠালাম। দু'আ শেষে তাদের দু'জন দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু মাহফিলে আর সবাই যার যার স্থানে বসে রইল। তারা যাওয়ার সময় পাশের দু' একজনকে ইশারা করে বলে, চল। কিন্তু কেউই তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি। তারা যখন উঠে বাইরে চলে গেল, তখন লোকেরা বলল, হযরত আপনার আলোচনা চালিয়ে যান। এরপর আমি আমার আলোচনা জারী রাখলাম। ফলে রহ্মতের বারি এমনভাবে বর্ষিত হল, যা ছিল কল্পনাতীত। সুবহানাল্লাহ!

বয়ান শেষে সবাই বায়আত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। প্রায় চল্লিশটি পাগড়ী একটির সাথে আরেকটি বাঁধা হল। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব আমল ও অযিফা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দেন। যখন লতীফাগুলোতে আঙ্গুলী দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার সময় হল, তখন আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম। মাওলানা আব্দুল্লাহ আমার হাতের নিচে ধরে হাতে শক্তি যোগালেন। কেননা এত লোকদের কলবকে চিহ্নিত

করতে করতে হাত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। খানকার মুতাওয়াল্লীও বায়আত হলেন এবং রাতে তার বাসায় অবস্থান করার জন্য দাওয়াত দিলেন।

সহকারী প্রশাসকের আগমন

১০ টার সময় মুতাওয়াল্লী সাহেবের বাসায় গাজদান শহর থেকে সহকারী প্রশাসক আগমন করলেন। তার নাম বখশন্দাহ। তার সাথে কয়েকজন পুলিশও ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? আমি বললাম, আমাদের আনন্দের সীমা নেই। কেননা আমরা খাজায়ে জাহানের শহরে সময় ব্যয় করছি। বখশান্দাহ বললেন, আমাকে এবং আমার বাচ্চাদেরকে দু'আয় স্মরণ করবেন। আমরা আপনার আগমনের অপেক্ষায় থাকব। আপনি আমাদের শহরের লোকদের অন্তর জয় করেছেন। আমি গোয়েন্দার রিপোর্ট রাতে পাঠ করেছি। আমি দু'আ করে তাদেরকে বিদায় জানাই। উপস্থিত লোকেরা অবাক হয়ে যায় এই ভেবে যে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃপক্ষের অন্তরসমূহকে আমার জন্য কীভাবে গলিয়ে দিলেন। মুতাওয়াল্লী সাহেব বললেন, আমাদের প্রোগ্রাম ভিডিও করার অনুমতি প্রদান করুন। আমি অস্বীকার করলাম। অতঃপর বললেন, আজ দুপুরের খাবার এক সবুজ শ্যামল স্থানে খাবেন, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হচ্ছে এবং গাছের ডালপালা উপরে ছড়িয়ে আছে। এই নহরের তীরেই কায়লুলা করবেন। আমি বললাম, খুব ভাল হবে।

খাবার খাওয়ার পূর্বে কাপড়সহ নহরে নেমে গোসল করলাম, তখন আমার কলেজ জীবনের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। খাবার খেয়ে কায়লুলা করলাম। আছরের আযানের পর নামাযের জন্য মসজিদে আসলাম।

হযরত গুল বাবার সাথে সাক্ষাৎ

আছর নামাযের পর প্রায় পনেরজন লোকের একটি জামাআত বলখ থেকে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করে। হযরত গুল বাবা তাদের তারজুমানী করছিলেন। সবাইকে বায়আত করার পর অজীফা বাতলে দেওয়া হল। হযরত গুল বাবা কোন এক শায়খের কাছে 'মাশারাবাত' পর্যন্ত সবকসমূহ আদায় করেছেন, এখন সবক পূর্ণ করার জন্য বায়আত হয়েছেন। তার নূরানী চেহারা দেখে আমার আনন্দ অনুভব হচ্ছিল। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, এই নূরানী চেহারার অধিকারী তিনি কিভাবে হলেন? বায়আত শেষে হযরত গুল বাবা বললেন "হযরত! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এখানে অবস্থান করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার সান্নিধ্যে অবস্থান করতে চাই। আমি বললাম, আমরা তো রাত্রেই বুখারায় পৌছতে চাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রওয়ানা দিব।

হযরত গুল বাবার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে এই শের পাঠ করলেন–

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد
بوئے گل سیر نہ دیدم وبہار آخر شد

(আফসোস! নিমেষেই শেষ হয়ে গেল সময় বন্ধুর সাথে বসার।
এখনও ভ্রমণ করে ফুলের চেহারা দেখিনি শেষ হয়ে গেল বসন্তকাল।)

শিকার করতে এসেছে

যখন আমরা গাজদানের জামে মসজিদ থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন পুলিশের এক বড় অফিসার সাক্ষাৎ করার জন্য এল। এসেই সবার সামনে বলতে লাগল, কাল আপনার বয়ানে আসার কারণ ছিল। যদি আপনি রাজনৈতিক কোন কথা বলতেন তাহলে আপনাকে গ্রেফতার করা হত। এত সংখ্যক লোক আপনার হাতে বায়আত হওয়ার ফলে কর্তৃপক্ষ (প্রশাসন) ঘাবগিয়ে যায়। মুতাওয়াল্লী সাহেব একথা শুনে বললেন, আজ বাজারে এমন কাউকে দেখছি না যে, সে এই বুযুর্গের হাতে বায়আত হয়নি। তার উপর আল্লাহ তাআলার বিরাট অনুগ্রহ। পুলিশ অফিসার বলল, আমিতো পিছনে পড়ে গেলাম। আমাকেও বায়আত করে আপনার শাগরিদ বানিয়ে নিন।

আমি তার কলব চিহ্নিত করে তাকে যিকির ও মুরাকাবা শিক্ষা দিলাম। অতঃপর সে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করল। আমি মুতাওয়াল্লী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কে? তিনি বললেন, সে আমাদের শহরের পুলিশ সুপার। আমি বললাম, বেচারা শিকার করতে এসে নিজেই শিকার হয়ে চলে গেল।

মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

গাজদান থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা মসজিদে ইমাম বুখারীতে পৌঁছি। তখন মালেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন। তিনি আমাকে দেখে কাছে এসে সালাম করে দু'আর দরখাস্ত করলেন। আমি উপস্থিত সবার জন্য দু'আ করলাম। মাওলানা জান মুহাম্মদ রাতের খাবারের সময় বললেন, পরবর্তীতে মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে, এই শায়খকে দেখে অন্তরে এক প্রশান্তি অনুভব হয়েছিল। আমি বললাম, মাওলানা! এরূপ প্রশান্তি লাভের প্রত্যাশায় আমীর ওমারাগণ ফকীরদের দ্বারে আগমন করে থাকেন। এরপর মাওলানা জান মুহাম্মদের সাথে হযরত তিশা বাবার খানকায় পৌঁছলাম।

এই সম্রাট অধীন হল

রাত্রে তিশা বাবা আমাকে তার খাস কামরায় শোয়ালেন এবং নিজে বাইরে দরজার সামনে বসে রাত কাটালেন। আমার ঘুমই আসছিল না। একবার বাইরে বের হয়ে তিশা বাবাকে কোন কামরায় গিয়ে আরাম করার জন্য অনুরোধ করলাম।

তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন আমার কপালে এই সৌভাগ্য মিলেছে। আপনি আমাকে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমি চুপ করে কামরায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ি। রাতে তাহাজ্জুদে নফল নামায আদায় করার পর তিশা বাবা আমার সামনে হাঁটু মিলিয়ে বসে গেলেন। হাদীসে জিব্রাঈলে রয়েছে, হযরত জিব্রাঈল রাসূল সা.-এর সামনে এভাবে আদবের সাথে বসেছিলেন। হযরত তিশা বাবা বললেন, হযরত! আপনি আমার উপর তাওয়াজ্জুহ দিন। আমি তাকে মুরাকাবা করার জন্য বললাম এবং কিছুক্ষণ (الله-الله) আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করার জন্য বললাম। সকালে হযরত তিশা বাবা মুরাকাবা অবস্থায় আমার সাথে মিলে গেলেন। মনে হচ্ছিল তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে।

ফযর নামাযান্তে হযরত তিশা বাবা মাওলানা আব্দুল্লাহকে বললেন, ষাট বছর যাবত আল্লাহওয়ালাদের মাহফিলে বসার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু এই শায়খের তাওয়াজ্জুহ এমন কাজ করেছে, যা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। এরপর বললেন, বর্তমানে আমার প্রতি অঙ্গে, শিরা-উপশিরায় আল্লাহ-আল্লাহ্ চালু হয়ে গেছে। দিনের বেলায় হযরত তিশা বাবা মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে তার তাজদীদে বায়আত তথা বায়আত নবায়নের কথা বললেন।

দুশুম্বা থেকে প্রতিনিধি দলের আগমন

পরের দিন হযরত তিশা বাবার বাসায় তাজিকিস্তান থেকে এক প্রতিনিধি দল এল। যখন সেই প্রতিনিধিদলের যুবকদের সাথে সাক্ষাৎ হল তখন দেখলাম তাদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত হচ্ছে।

জামাআতের আমীর বললেন, আমরা বিভিন্ন শায়েখদের মাজার যিয়ারত করার জন্য এসেছি। আমরা কাসরে আরেফায় শাহ্ নকশেবন্দ রহ.-এর মাজারে উপস্থিত হলে সেখানকার মুয়াজ্জিন বললেন, পাকিস্তান থেকে নকশবন্দীয়া সিলসালার এক শায়খ এসেছেন। তাঁর দর্শনে অন্তরের তালা খুলে যায়। একথা শুনে সাক্ষাৎ করতে আমাদের আগ্রহ জাগল। সবাই সিদ্ধান্ত নিল যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তার সাথে সেখানেই সাক্ষাৎ করব। আমরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজ খবর নিয়ে এখানে এসেছি।

হযরত তিশা বাবার আনন্দ লক্ষ্যণীয় ছিল। তিনি সবাইকে চা পান করালেন। অতঃপর ওয়াজ নসীহতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রইল। আমার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, যৌবনকালে ইবাদত করা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস ও মাশায়েখদের বিভিন্ন ঘটনা শুনালাম।

মাহফিলে খুব উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ফলে সবার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। আমি সবাইকে মুরাকাবা করালাম এবং কয়েকটি ফার্সী শে'র আবৃত্তি করলাম।

প্রতিনিধি দলের যুবকরা যেহেতু ফার্সী ভাষা জানত সেহেতু তারা গলাকাটা মোরগের ন্যায় তড়পাতে শুরু করে দিল। আমার অজ্ঞাত, অনেক পূর্বের জানা কবিতাগুলোও মনে হতে লাগল। যার একটি ছিল এমন–

در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری
وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار

যৌবনকালে তওবা করা তরীকায়ে পয়গাম্বরী
বৃদ্ধকালে কট্টর অত্যাচারীও গ্রহণ করে পরহেজগারী।

মুরাকাবা শেষে যুবকরা বলল, হযরত! আমাদের তিনটি দরখাস্ত কবুল করুন। প্রথমতঃ আমাদেরকে আপনার মুরীদানদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। দ্বিতীয়তঃ আমাদের এই কবিতাগুলো কাগজে লিখে দিন, যেন তা বার বার পাঠ করে আত্মতৃপ্তি অর্জন করতে পারি। তৃতীয়তঃ আপনি আমাদের এলাকায় (দুশুম্বা) তাজাকিস্তানে আসার দাওয়াত কবুল করুন। আমি তাদেরকে বায়আত করে মুরাকাবার বিস্তারিত নিয়ম বলে দিলাম, কবিতাগুলো কাগজে লিখে দিলাম এবং বললাম, আমি তাজাকিস্তানে (দুশুম্বা) যাওয়ার দাওয়াত কবুল করলাম। তবে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারা আপনাদের ঠিকানা লিখে দিয়ে যান। যাওয়ার পূর্বে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেওয়া হবে। নতুবা আমি নিজেই একদিন উপস্থিত হব। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বললেন, আমি তাজাকিস্তানে (দুশুম্বা) যাব। ইনশাল্লাহ আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। হযরত তিশা বাবাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সফর করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমি যুবক হলে হরিণের ন্যায় দৌড়াতাম, তার সন্তুষ্টি অর্জন করতাম। এই শায়খের সাথে তাজাকিস্তানে হাজির হতাম। প্রতিনিধি দলের যুবকরা পরের দিন সকালে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল।

হযরত খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনুবী রহ.

নাস্তা সেরে আমরা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। সর্বপ্রথম 'ফাগনা' অঞ্চলে পৌঁছি। বুখারা থেকে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত এক গ্রাম, যেখানে একটি কূপ একটি ঘর ও একটি মসজিদ রয়েছে। পাশেই খাজা মাহমুদ রহ.-এর মাজার মোবারক। আশেপাশে অনেক দূর পর্যন্ত কোন ঘর-বাড়ী ও জনবসতির নাম নিশানা নেই। হযরত তিশা বাবা বললেন, এ অঞ্চলের আঞ্জীর খুব সুস্বাদু হয়। এ কারণেই লোকেরা হযরত খাজা সাহেবকে আঞ্জীরে ফাগনা বলতে শুরু করে দেয়। অতঃপর ইসালে সওয়াব করে কিছুক্ষণ মুরাকাবা করে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

হযরত খাজা মুহাম্মদ আরিফ রহ. মাহ্তাবা

যখন আমরা ফাগনা থেকে 'রামীতন' এর উদ্দেশ্যে রওয়া দেই পথিমধ্যে এক শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন হযরত তিশা বাবা বললেন, এখানে এক বুযুর্গ ছিলেন, যার চেহারায় এত সৌন্দর্য্য বিদ্যমান ছিল যে, লোকজন তাকে 'সাহ্তাবা' বলত। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমরা তার মাজারে ইসালে সওয়াবের জন্য যেতে চাই। জবাবে একটি শের বললাম–

بآں گروہ کہ از ساغر وفا مستند
سلام ما برسانید ہر کجا ہستند

হযরত তিশা বাবা এই শে'র শুনে ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং আমাকে দেখে 'রহমত' 'রহমত' বলতে লাগলেন। মাজার সংলগ্ন স্থানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক বিরাট মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। কেননা ওয়াকফকৃত জমি অনেক বেশি তাই এই মাজার এক কোণায় অবস্থিত। এর চারদিকে বাউন্ডারী দেওয়া হয়েছে। ইসালে সওয়াব ও দু'আ করে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

হযরত খাজা আজীজান আলী রামেতিনী রহ.

হযরত খাজা আজীজান আলী রহ.–এর আসল নাম ছিল আলী। আজীজান তার বিশেষণ। ফার্সী ভাষায় কবিতা পাঠ করতেন বিধায় তিনি আজীজান নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত খাজা রহ.-এর সমকালীন বাদশাহ শাহরিয়ারের সুন্দরী যুবতী কন্যা অসুস্থ হয়ে যায়। পুরো শরীরে গুটি গুটি এক জাতীয় রোগ দেখা দেয়। সকল ডাক্তার চিকিৎসা করে ব্যর্থ হয়ে যায়। কেউ বাদশাহকে পরামর্শ দিল যে, চিকিৎসা তো করিয়েছেন। এখন দু'আ করিয়ে দেখুন। অতঃপর বাদশাহ তার কন্যাকে নিয়ে খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থিত হন। হযরত খাজা সাহেব পানি পড়ে দিলেন এবং তার কন্যাকে পড়া পানি দিয়ে গোসল করাতে বললেন। আল্লাহ্র কুদরতে বাদশাহর কন্যা আরোগ্য লাভ করে। সেই হিসেবে এ স্থানের নাম 'আরামতন' হয়ে গেল। সময়ের আবর্তনে আজ তা 'রামীতন' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।

হযরত খাজা সাহেবের মাজার এক উঁচু দীঘির উপর অবস্থিত। যার সন্নিকটেই একটি নালা প্রবাহিত হচ্ছে। ইসালে সওয়ারের পর মুরাকাবা করে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

হযরত খাজা বাবা সামাসী রহ.

রামীতন থেকে কয়েক মাইলের দূরত্বে হযরত খাজা বাবা সামাসী রহ.-এর মাজার। চারদিকে শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। হযরত বাবা সামাসী রহ. এর লাগানো

বাগান আজও বিদ্যমান। এ স্থানে একসময় পানি পাওয়া দুস্কর ছিল। তখন হযরত বাবা সামাসী রহ. (الله) আল্লাহ্ বলে লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে পানি বের হয়। পরবর্তীতে লোকেরা এটাকে কুয়ার ন্যায় বানিয়ে রাখে। আজও সেই রহস্যময় পানির কুয়া বিদ্যমান। এর চারদিকে উঁচু উঁচু বৃক্ষ রয়েছে। এ স্থান এত আরামদায়ক ও প্রশান্তিময় যে, গোটা সফরে যিকির করার জন্য এমন উপযোগী স্থান আর পাইনি। বন্ধু-বান্ধবের অনেকেরই ধারণা বাগান ও ফুলের কারণে এত মনোরম অনুভব হচ্ছিল। কিন্তু আমার ধারণা হল যে, হযরত বাবা সামাসী রহ.-এর আল্লাহর প্রতি প্রেম ভালবাসা মাত্রাতিরিক্ত থাকার ফলে এর প্রতিক্রিয়ায় আজও এই স্থানে এমনভাবে বিদ্যমান যে, আমাদের ন্যায় গাফেল লোকও এখানে এসে আল্লাহর যিকিরের স্বাদ অনুভব করি। এক লোক বলল, এখানে আসলে এমনিতেই আল্লাহর প্রেম ভালবাসায় আত্মহারা হতে হয়।

হযরত আমীরে কালাল রহ. যখন হযরত বাবা সামাসী রহ.-এর সান্নিধ্যে আসতেন তখন দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন। হযরত সামাসী রহ. যে মসজিদ তৈরী করেছিলেন, সেই মসজিদে কাঠের তৈরী দরজাগুলোর একটি দরজা আজও আপন অবস্থায় বিদ্যমান। ঈসালে সওয়াব ও মোরাকাবার পর খানকার মুতাওয়াল্লী তার বাসায় দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

আমি আর তুমি অন্তরঙ্গ বন্ধু

হযরত তিশা বাবার পরামর্শে আমি দাওয়াত কবুল করলাম। মুতাওয়াল্লী সাহেব নিকটবর্তী সমস্ত ওলামা ও বুযুর্গদেরকেও দাওয়াত করলেন। ধীরে ধীরে সকলে সমবেত হতে শুরু করল। মুতাওয়াল্লী সাহেব আমাকে কিছু বয়ান করতে বললেন। তাই আমি আমাদের পূর্ববর্তী বুযর্গানে দীনের আল্লাহ প্রেমের দাস্তান শুনাতে লাগলাম। মাওলানা জান মুহাম্মদ সাহেব তরজমা করলেন। উপস্থিত সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে গেল। যখন আমি দু'টি ফার্সী শে'র পাঠ করলাম, তখন মাওলানা তরজমা করার সময় কাঁদতে লাগলেন–

قال را بگزار مرد حال شو
پیش مرد کاملے پامال شو
صدکتاب وصد ورق درنار کن
جان ودل راجانب دلدارکن

নিজের উক্তি নিক্ষেপ কর
আহলুল্লাহদের কদমে,
স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন কর
মর্দে কামেলের সামনে।

শত কিতাব শত পৃষ্ঠা
ছুঁড়ে ফেল আগুনে
প্রাণ ও অন্তর হাওয়ালা কর
অন্তরওয়ালার প্রাঙ্গণে।

এরপর তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। ফলে অধিক বয়ান করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। উপস্থিত সবাই বায়আত হওয়ার দরখাস্ত করল। তাই সবাইকে বায়আতের কালেমা পাঠ করিয়ে সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। মুরাকাবা ও দু'আ শেষে স্থানীয় লোকদের সাথে মুলাকাত হয়। তাদের থেকে এক বুযুর্গ হাজী বাবাও তাশরীফ আনলেন। যখন হযরত তিশা বাবা তাকে দেখলেন, তিনিও হযরত তিশা বাবাকে দেখলেন তখন উভয়ে একজন অপরজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। পরে খবর নিয়ে জানা গেল তারা উভয়ে ছোটবেলায় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আজ ষাট বছর পর তাদের মুলাকাত হল। তাদের আলোকোজ্জ্বল চেহারা প্রত্যক্ষ করে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হলাম। অতঃপর এই অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্তরের কী অবস্থা হয়েছে, তা তিনি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করলেন। হাজী বাবা বলেন, এ সব কিছু নকশবন্দী শায়খের বরকত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মিলিয়ে দিলেন এবং পীর ভাইও বানিয়ে দিলেন।

যুবকদের গর্ব ঃ ইস্পাতসম মনোবল

মাওলানা আব্দুল্লাহ এক যুবককে আমার সাথে সাক্ষাৎ করানোর জন্য নিয়ে আসেন এবং বললেন এ সেই ভাগ্যবান যুবক যে রাশিয়ার বিপ্লবের সময় দৈনিক পাঁচবার আযান দিয়ে প্রকাশ্যে নির্ভয়ে নামায আদায় করত। শুনে আমি আশ্চার্যান্বিত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে? এই যুবক তার পেট থেকে কাপড় সরালো। দেখা গেল তার শরীরের প্রতিটি স্থানে আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান। আমি বললাম, এগুলো কী? সে বলল, যখন আমি প্রথমবার আযান দিলাম, তখন পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং প্রচণ্ডভাবে মারপিট করে। ফলে চোখ বুঝে মার সহ্য করে আমি পাগলের ন্যায় হয়ে যাই।

তারা যত বেশি মারে আমি তত বেশি হাসি। এক সময় কয়েকজন পুলিশ আমাকে প্রহার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেত। আমি আল্লাহর নামে মার খেতাম, কিন্তু হতাশ হতাম না। আমাকে বিদ্যুতের শক লাগানো হয়েছে, আমি তা সহ্য করেছি। আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বরফে শোয়ানো হয়েছে, আমাকে পুরো রাত উল্টো করে ঝুলানো হয়েছে। গরম বস্তু দিয়ে গায়ে দাগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এমন আচরণ করতাম, যা সাধারণত কোন পাগল করে থাকে। পুলিশ এক বছর প্রহার করার পর আমাকে পাগলখানায় পাঠিয়ে দিল। সেখানে আমি এক বছর

এভাবেই কাটিয়েছি। এমনকি ডাক্তার লিখে দিল যে, এই ব্যক্তি পাগল। তার মস্তিষ্ক বিকৃত। সে কারও কোন প্রকার ক্ষতি করে না। সে নিজে নিজেই মাতলামী করে। কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তাকে যেন দ্বিতীয়বার গ্রেফতার না করা হয়।

অতঃপর আমাকে স্বাধীন করে দেওয়া হল। আমি এক স্থানে ছোট একটি মসজিদের ন্যায় তৈরী করলাম। দৈনিক পাঁচবার আযান দিতাম এবং পাঁচবার প্রকাশ্যে নামায আদায় করতাম।

আমি তার কপালে চুমো দিলাম এবং বললাম—

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی
ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد

সেই জাতির তরবারীর প্রয়োজন হবে না, যে জাতির যুবকদের গর্ব তাদের ইস্পাতসম মনোবল।

কমিউনিজমের আমলে যখন সাধারণ লোক আত্মগোপন করে থাকত, সেই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর এই বান্দার আযান দেওয়া ও প্রকাশ্যে নামায আদায় করা কুফরী শক্তির বুকে লাথি মারার নামান্তর। সাধারণত মানুষ চিন্তা করে যে, ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। আর কমিউনিস্টদের এটাই অভ্যাস ছিল। কিন্তু রাখে আল্লাহ্ মারে কে?

আমি বার বার এই যুবকের চেহারার পানে তাকাচ্ছিলাম এবং তার ইস্পাতসম মনোবল ও কঠিন দৃঢ়তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলাম।

যখন সাধারণ লোকদের সাথে মুলাকাত হল তখন আবার পাশে বসা এক বুযুর্গ ওঠে আমার সাথে মুলাকাত করার জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। তার চেহারায় এত আলো চমকাচ্ছিল যে, আমি তা দেখে অলক্ষ্যে বলে উঠলাম—

مَا هٰذَا بَشَرًا ۝ اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

সেতো মানুষ নয় বরং সম্মানিত ফেরেশতা।

মাওলানা জান মুহাম্মদ পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি এ অঞ্চলের একজন প্রধান আলেম। তার বয়স ৯৩। তিনি গোটা জীবন বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়ে কাটিয়েছেন। আমি বললাম, রাশিয়ার বিপ্লবের ৭০ বছর সময়ও কি? তিনি মুচকি হেসে বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে? মাওলানা বললেন, হযরত আপনি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। আমি তাকে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, আমরা ঘরে এক কামরা এমনভাবে তৈরী করতাম, যার দু'পাশে দেয়াল ছিল এবং উভয় দেয়ালের মাঝখানে ছয়-সাত ফুট স্থান খালি রাখতাম।

তখন এর মধ্যে লেপ ইত্যাদি ঢুকিয়ে পুরো কামরাকে সাউন্ডপ্রুফ বানিয়ে নিতাম। আমি বাচ্চা ছাত্রদেরকে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করতাম। আর বাইরের লোক এর দরজাকে কাঠ দিয়ে বন্ধ করে দিত এবং সামনে ফার্নিচার ইত্যাদি রেখে দিত। আমরা পুরো শীতকালে এই কামরায় কাটিয়ে দিতাম। আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ভিতরেই পুরো হত।

কখনও কখনও দীর্ঘ চার মাস পর বাইরে বের হওয়ার সুযোগ হত। আমি বললাম, আপনাদের জযবা তো কামালাত দেখিয়ে দিয়েছে। তার চোখে পানি এসে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার বায়আত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনার ওসিলায় আমার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ। যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করেন? কী নিয়ে এসেছ, তাহলে তখন আমি আপনাকে আল্লাহর সামনে পেশ করব। একথা শুনে উপস্থিত সবাই অলক্ষ্যে কাঁদতে লাগলেন। তাদের কান্নার আওয়াজ শুনে হয়ত বাইরের লোকজন ধারণা করবে যে, কেউ মৃত্যু বরণ করেছে, এজন্য তারা কাঁদছে। কিন্তু আমরা তো মৃত দিলের জন্য কাঁদছি। অবশেষে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে হযরত তিশা বাবার ঘরে পৌছলাম এবং ইশার পর বিশ্রাম করলাম।

পথিমধ্যে দাওয়াত

পরের দিন সকাল দশটায় হযরত তিশা বাবার ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে মসজিদে আবু হাফস কাবীরের দিকে গেলাম, যেন খানকায় সমবেত হওয়া বন্ধু বান্ধবদের সাথে মুলাকাত হয়ে যায়। রাস্তায় বুখারার এক লোক, হাবীবুল্লাহ জান দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি হাতে ইশারা করে গাড়ি থামিয়ে দিলেন। প্রথমতঃ হযরত তিশা বাবার সাথে মুসাফাহ করলেন। অতঃপর আমার দিকে এসে আমাকে বের হতে অনুরোধ করলেন, বের হয়ে আসুন। আপনার বুকের সাথে আমাকে লাগান। তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে আমি গাড়ী থেকে বের হয়ে তার সাথে মুলাকাত করলাম। এদিকে তার ঘরের মহিলারা দরজায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছিল। তারা তাদের ছোট বাচ্চাদেরকে পাঠিয়ে দিল যে, এই মেহমানকে কিছুতেই যেতে দিবে না, যতক্ষণ তারা আমাদের ঘরে এসে দুপুরের খাবার না খান। সাথে সাথে তারা আমাদের সামনে একটি বকরী যবেহ করে দিল। মাওলানা জান মুহাম্মদ বললেন, হযরত! এই মহিলারা বিজয়িনী হয়ে গেল। আমি বললাম, কীভাবে? তিনি বললেন যে, বুখারার প্রথা হল, যদি কোন মেহমানকে দেখে বাড়ীওয়ালা কোন জানোয়ার যবেহ করে তাহলে তা না খেয়ে সেখান থেকে যাওয়া যায় না। আপনি যা ইচ্ছা তা করেন, আমি তাদের ঘরে অবস্থান করব।

হযরত তিশা বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি মুচকি হাসছেন এবং বলছেন, দেখলেন তো! মহিলারা কী কৌশল অবলম্বন করল? ইতোমধ্যে তারা বাচ্চাদেরকে পাঠিয়ে সংবাদ দিল যে যদি এই মেহমান আমাদের ঘরে অবস্থান করে তাহলে প্রতিদিন তার মেহমানদারী করার জন্য একটি করে জানোয়ার যবেহ করার জন্য প্রস্তুত আছি।

অনন্যোপায় হয়ে আমরা হাবীবুল্লাহ জানের ঘরে অবস্থান করলাম। আশ্চর্যের কথা হল, মাত্র আধঘন্টা বা পৌণে এক ঘন্টার মধ্যে ভুনা গোশত আমাদের সামনে হাজির করল। আমি তা দেখে আরও হয়রান হয়ে গেলাম। তা কীভাবে সম্ভব? বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই গোশত এত দ্রুত কীভাবে তৈরী করা হল? তিনি মুচকি হেসে বললেন, আজ আমাদের এখানে অবস্থান করুন। কাল আর একটি বকরী যবেহ করে আপনার সামনে গোশত তৈরী করা হবে। তাহলে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন। আমি বললাম, অনেক শুকরিয়া। আমাদের তো জানাই ছিল না যে, বুখারার অধিবাসীদের অন্তরে মেহমানদের কত সম্মান হয়ে থাকে? রাসূল (সা.) বাণী আমার স্মরণ হয়ে গেল–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ـ

যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হতে চায় সে যেন তার মেহমানের ইজ্জত করে।

প্রশান্তির সন্ধানে এক ইংরেজ যুবতী

মসজিদে আবু হাফসে এসে যোহরের নামায আদায় করছিলাম। খতীব সাহেব বললেন, গতকাল এক ইংরেজ যুবতী আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এখানে এসেছিল। কিন্তু আপনি ছিলেন না। কিছুক্ষণ পর গাজদান থেকে ফোন আসল যে, এক ইংরেজ যুবতী হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গাজদান এসেছিল। ইতোমধ্যে মাদরাসায়ে মীরে আরব থেকে এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করতে আসে। তারা বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলল। ইংল্যান্ড থেকে ইংরেজদের এক জামাআত সমরকন্দ-বুখারা ভ্রমণ করতে এসেছে। তাদের দলের এক যুবতী যখন শাহ্ নকশবন্দ রহ. এর মাজারে কাসরে আরেফায় পৌঁছে, তখন সে মসজিদের ইমাম খতীব সাহেবকে কিছু প্রশ্ন করে। খতীব সাহেব তাকে আমার ব্যাপারে বললেন যে, পাকিস্তান থেকে এক নকশবন্দী শায়খ কিছুদিনের জন্য বুখারায় এসেছেন। তিনি আপনার অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। এই যুবতী আমার খোঁজে গাজদানও গিয়েছিল, আবু হাকাম মসজিদেও এসেছিল, মাদ্‌রাসায়ে আরবেও গিয়েছিল। যখন আমরা তাকে বললাম যে, আগামীকাল আপনার শেষ দিন তখন সে খুব অস্থির হয়ে উঠল। কীভাবে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবে? তার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হলে কতই না ভাল হতো।

আজ সে বুখারার টুরিস্ট হোটেলে অবস্থান করবে। সে যদি জানতে পারে যে, আপনি এখানে রয়েছেন। তাহলে সে দৌড়ে চলে আসবে। যেহেতু আপনার চলে যাওয়ার প্রোগ্রাম, সেহেতু আমাদের পরামর্শ হল যে, আপনি যাওয়ার সময় রাস্তায় কিছুটা সময় দেরী করে তার সাথে সাক্ষাৎ করে নিন। তার মধ্যে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছি।

মসজিদের মুসল্লীদের পক্ষ থেকে দেওয়া পোলাও পার্টি আমি সংক্ষেপে সেরে মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে টুরিস্ট হোটেলে পৌছলাম। কাউন্টারে খোঁজ নিলে তারা বলল যে, এত বড় হোটেলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ অবস্থান করে। নাম জানা থাকলে তারা কিছু বলতে পারবে। আমি বললাম, ইংল্যান্ড থেকে এক জামাআত এসেছে। কাউন্টারের এক যুবতী কিছুক্ষণ রেজিস্ট্রি খাতা দেখে বলল, হ্যাঁ। তারা আজ পঞ্চাশ মাইল দূরে এক স্থান দেখতে গিয়েছে। কামরার চাবি আমাদের কাছে রয়েছে। একথা শুনে আমাদের খুব আফসোস হল।

মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত আমাদের বুস্তান ও খোরকান যেতে হবে সেখানে অনেক সময় ব্যয় হবে। তাই সফর শুরু করা দরকার। আমি বললাম, চল। এই যুবতীকে গায়েবানা তাওয়াজ্জুহ দেই। দু'তিন মিনিট পর কাউন্টারের যুবতী ইশারা করে আমাকে আহ্বান করল। মাওলানা আব্দুল্লাহ তার কাছে গেলেন। সে বলল, এক যুবতী কামরায় রয়েছে। সে এখন ফোনে আমার সাথে কথা বলছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করব? খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সে হল সেই যুবতী, যে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী ছিল। আমি তার সাথে ফোনে কথা বললে সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি আমার কামরায় আসবেন? আমি বললাম, যদি আপনি নিচে নেমে আসেন তাহলে লাউঞ্জে কথা বলে নেব।

কিছুক্ষণ পর এক যুবতী মাথায় স্কার্ফ বেধে আরবী পোশাক পরিধান করে নিচে নেমে আসল এবং আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী? আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আজ তিনদিন যাবত আপনার পিছনে পাগলের মত ঘুরছি। কিন্তু আপনার নাগাল পাইনি। আমি বললাম আরবী প্রবাদ আছে (مَنْ جَهَدَ فَوَجَدَ) যে সাধনা করে সে পায়। তিনি খুশিতে নেচে উঠলেন এবং বললেন, এত বড় শায়খের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করে অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী জানতে চান? তিনি বললেন, আমি আত্মার প্রশান্তি চাই।

আমি বললাম আত্মার প্রশান্তি তো প্রশান্তিমূলক কাজের দ্বারাই অর্জিত হবে। তিনি বললেন, আপনি তো ইউরোপের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছেন। আমি আমার সকল মনোবাঞ্ছা পুরো করে দেখেছি। প্রবৃত্তি যা চেয়েছে তাই করেছি। কিন্তু আত্মার প্রশান্তির পরিবর্তে অশান্তিই বেড়েছে। তারপর প্রশান্তি

লাভের জন্য প্রচুর অধ্যয়ন করে অবগত হয়েছি যে, ইসলামের মাশায়েখ সূফীদের অন্তরে আত্ম-প্রশান্তি রয়েছে। তাই আমি যিকির সংক্রান্ত ব্যাপারে অধ্যয়ন করেছি। প্রকাশ্যে যিকর করা তো আমার পরিবেশে দুঃসাধ্য। তবে নকশবন্দীয়া তরীকার যিকির আমার কাছে উত্তম মনে হল। তাই আমি এই তরীকার যিকির আরম্ভ করি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি মুরাকাবা করেন কি? তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, দৈনিক কতক্ষণ মুরাকাবা করেন? তিনি বললেন, দৈনিক কয়েকবার করি। হিসাব করলে সব মিলিয়ে প্রায় তিন ঘন্টা হবে। আমি একথা শুনে হয়রান হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমি খালওয়াত দর আঞ্জুমান, নজর বর কদম, সফর দরওয়াতান, হুশ দর দম ইত্যাদি পরিভাষা বুঝি। তাছাড়াও শাহ্ নকশবন্দ রহ.-এর পরিভাষা ওকুফে কালবী, ওকুফে আদী এবং ওকুফে যামানী সম্পর্কেও সামান্য অবগত আছি। ইংরেজ যুবতীর কাছ থেকে এ জাতীয় কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মূলত বাস্তবিক অনুসন্ধিৎসু হলে এমনই হয়।

এরপর আমি তাকে বিস্তারিত আলোচনা শুনালাম। তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা আমাকে তার জীবন কাহিনী শুনালেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন, অবশেষে বললেন যে, আজ আমার বুখারা সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। আমি আপনার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে চাই। আমি তাকে আমার ঠিকানা লিখে দিলাম এবং সে আমাকে তার ঠিকানা লিখে দিল।

আমাদের প্রচুর সময় ব্যয় হয়ে যাওয়ায় দ্রুত গাড়ীর দিকে গেলাম, সে আমাদের বিদায় দিতে গাড়ী পর্যন্ত এসে সালাম জানিয়ে বিদায় নিল। আমরাও রওয়ানা করলাম।

হযরত খাজা বায়েযিদ বোস্তামী রহ.

হযরত খাজা বায়েযিদ বোস্তামী রহ. সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে হযরত জুনায়েদ বোগদাদী রহ. মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, সকল ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিব্রাঈল আ. এর মর্যাদা যেমন সকল অলী আল্লাহদের মধ্যে হযরত বায়েযিদ বোস্তামী রহ. এর মর্যাদা তেমন।

সমরকন্দ যেতে পথিমধ্যে এক স্থানের নাম 'কারেনটেপা'। এখানে এক শহর রয়েছে। এই শহরের বড় কবরস্থানের এক উচুঁ টিলায় হযরত খাজা সাহেবের আলোকোজ্জ্বল মাজার অবস্থিত। আমরা সেখানে পৌঁছে মসজিদে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করি এবং ইসালে সওয়াবের পর মুরাকাবা করি।

নীরবতা আর নির্জনতার মধ্যে রহমত ও বরকত বর্ষিত হচ্ছিল।

মুরাকাবা শেষে সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। কবরস্থানের গেট কাঠের তৈরী অতি চমৎকার ও কারুকার্যপূর্ণ, যা যে কোন দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কবরস্থানে এক আশ্চর্য বিষয় দেখলাম যা কমিউনিস্টরা চালু করেছিল, আজ তা মুসলমানরাও করে থাকে, তা হলো প্রতিটি কবরের মাথার দিকে পাথরে মৃত ব্যক্তির নাম ও স্পষ্ট ছবি বানিয়ে রাখা হয়।

আমি ওলামায়ে কেরামকে বললাম, যেন তারা জনসাধারণকে শরীয়তবিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু এক লোক জওয়াব দিল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রতিটি কবরে এই পাথর লাগানো জরুরী মনে করা হয়।

আমি চিন্তা করলাম কমিউনিস্টদের জানা ছিল আমাদের ধর্মে এটা জায়েয নেই। তাই তারা দীনের সাথে শত্রুতাবশতঃ এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে।

কাকানে কিছুক্ষণ

যখন বোস্তাম থেকে খেরকানের দিকে রওয়ানা করলাম তখন মাওলানা আব্দুল্লাহ স্মরণ করিয়ে বললেন, হযরত আমরা মসজিদে শাহ্ নকশবন্দ রহ. এর মুয়াযযিনের সাথে ওয়াদা করেছিলাম– বুখারা থেকে সমরকন্দ যাওয়ার পথে তাঁর বাড়ীতে অল্প সময় অবস্থান করে চা পান করে যাব।

আমার চা পান করার অভ্যাস তো ছিল না এবং এখানে অবস্থান করার আগ্রহও হচ্ছিল না, তদুপরি (اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ) (অঙ্গীকার পুরা কর) বাণীটি বিবেককে নাড়া দিল। আমরা এক গ্রাম 'কাকানে' পৌছলাম, যেখানে আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের বাড়ী। এখানে এক বাউন্ডারির ভিতরে মাত্র আট-দশটি ঘর হয়। এখানকার গ্রাম্য পরিবেশ আমাদের দেশের গ্রাম্য পরিবেশের সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কয়েকটি বিষয়ে ব্যবধান রয়েছে। প্রথমতঃ মধ্য এশিয়ার গ্রামগুলোর প্রতিটি নারী-পুরুষ শিক্ষিত। যদি কোন ব্যক্তি ট্রাক্টর চালাচ্ছে আর আপনি তার কাছে কোন স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছেন তাহলে সে পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে ম্যাপ এঁকে আপনাকে ঠিকানা বুঝিয়ে দেবে।

এখানকার কানুন হল আট বছরের সন্তানকে পাঁচ বছরের কোর্সে ভর্তি করা আবশ্যক। যদি পিতা-মাতা তাদের ভর্তি না করায় তাহলে তাদেরকে জেলে প্রেরণ করা হয়। পাঁচ বছরের কোর্স সমাপ্তির পর দুই বছর সৈনিকের ট্রেনিং দেওয়া হয়। তবে পরবর্তীতে লেখাপড়া করা নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সে কারণেই এখানকার সাধারণ একজন রাখালও শিক্ষিত হয়। দ্বিতীয় পার্থক্য হল, এখানে বিদ্যুৎও পানির লাইন গ্রামের রাস্তাগুলোতেও বরং ক্ষেত পর্যন্ত পৌছে দেওয়া হয়েছে। টেলিফোনের ব্যবহারও ব্যাপক।

যখন আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের বাড়ীতে পৌছলাম, তখন দু'জন সূফী ও মুনশী আমাদের সাথে মুলাকাত করতে তাশরীফ আনলেন। একজন বয়স্ক ছিল। তারা বলল, তিনি সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার একজন শায়খের খলীফা, দ্বিতীয়জন ছিল

যুবক। সে স্বপ্নে হুজুর সা. কে বেশি বেশি দেখে থাকে। মাওলানা আব্দুল্লাহ যখন বুখারা ও গাজদানের অবস্থাবলী শুনালেন এবং হযরত তিশা বাবার বায়আত হওয়ার কথা শুনালেন তখন তাঁরাও বায়আত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

চা পান করার পর আমি তাদেরকে বায়আতের কালিমা পাঠ করালাম এবং মুরাকাবা করালাম। এলাকার মসজিদে খতমে খাজেগান চালু করার অনুমতি প্রদান করলাম। আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব বিদায় দেওয়ার সময় মহব্বতের সাথে আমার শরীরে চুমু দিয়েছে। ফলে মাঝে মাঝেই তার কথা স্মরণ হয়।

হযরত খাজা আবুল হাসান খেরকানী রহ.

বোস্তাম থেকে খেরকান যাওয়ার পথে আমি আমার চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। ইতোমধ্যে গাড়ীর টায়ার পাংচার হয়ে গেল। গাড়ী থেকে নেমে দেখি দ্বিতীয় টায়ারটিও পাংচার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে পরামর্শ হল, ড্রাইভারকে বুখারায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হোক এবং বাকী রাস্তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে কোন বাস অথবা ট্যাক্সিযোগে চলে যাব। সুতরাং আমরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তিন মিনিট যেতে না যেতেই একটি গাড়ী আমাদের সামনে আসল। এক যুবক গাড়ী চালাচ্ছে এবং একজন রুশ মেম সাহেব পিছনের সিটে তারা দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করল। মাওলানা বললেন, আমরা খেরকান যাব। ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। ড্রাইভার বলল, মেইন রোডে ট্যাক্সি কীভাবে পাবেন? মেম সাহেব বললেন আমরা তাদেরকে সাথে নিলে অসুবিধা কোথায়? অতঃপর মেম সাহেব সামনের সিটে বসলেন। আমরা আল্লাহর সাহায্য মনে করে মালামাল গাড়ীতে উঠিয়ে পিছনের সিটে উঠে বসলাম।

যখন গাড়ী সামনের দিকে চলছে তখন পরিচয় জানা গেল, গাড়ীর চালক কোন এক শহরের প্রশাসনের বড় অফিসার, মেম সাহেবা তার বেগম। তারা পথিমধ্যে অবস্থিত এক শহর নাওয়ারী'র অধিবাসী, যার নাম উজবেকিস্তানের প্রসিদ্ধ কবি আলশের নাওয়ারী এর নামে রাখা হয়েছে– আমরা ভাবলাম, কিছু রাস্তা তো আরামেই আসলাম। বাকী রাস্তা আল্লাহ ভরসা। নাওয়ারী পৌঁছলে যুবকটি বলল আপনারা আমাদের বাসায় চলুন। আমাদের পিতা আপনাদেরকে পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। তাদের বাসায় গিয়ে দেখি তাদের পিতা বাস্তবেই একজন সৎলোক ও আল্লাহওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা চা পান করালেন এবং দুপুরের খাবার তাদের বাসায় খাওয়ার অনুরোধ জানালেন। আমরা সফরের ওযর পেশ করলাম। তারা বললেন, আমরা আপনাদেরকে আমাদের গাড়ীতে করে নিয়ে যাব। আসা যাওয়ায় দু'ঘন্টা সময় ব্যয় হবে। ততক্ষণে এদিকে খাবার তৈরি হয়ে যাবে।

নাওয়ারী থেকে খেরকান পৌছে দেখি শহরের কবরস্থান এক বড় নদীর তীরে অবস্থিত। কবরস্থানে চাষাবাদ করা হয়। হযরত খেরকানী রহ. এর মাজার একটি বাগানের ভিতর নির্মিত মসজিদের সাথে অবস্থিত। মাজারটি আনুমানিক দশ মিটার লম্বা। আমরা ইসালে সওয়াবের পর মুরাকাবা করলাম। তখন এক প্রশান্তিময় পরিবেশ বিরাজ করছিল।

আমি ভাবছিলাম যে, হযরত সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ. এর মত শাসক এক সাধারণ ফকীরের দরবারে এ স্থানেই উপস্থিত হতেন। আমি সাথীদেরকে হযরত খাজা খেরকানী রহ.-এর কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করলাম। ফেরার পথে নাওয়ারী শহরে দুপুরের খাবার খেয়ে ট্যাক্সিযোগে সমরকন্দ পৌছি।

আরগত সফর

দিনের প্রায় এগারটায় মাওলানা আব্দুল্লাহ ও গাজদানের হযরত গুল বাবার সাথে 'আরগত' এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। আরগত সমরকন্দ থেকে চল্লিশ কিঃ মিঃ দূরে পাহাড়ী উপত্যকায় অবস্থিত একটি শহর। এই শহরে লোহার কাজ খুব বেশী হয়। এই অঞ্চল সজীবতা ও শ্যামলিমায়পূর্ণ এক অপূর্ব অঞ্চল যার দৃষ্টান্ত একমাত্র এটাই। আনুমানিক বারটার সময় কাংগলক জনপদে পৌছি, যা একবারেই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। আমরা যে বাড়ীতে অবস্থান করেছি সে বাড়ীতে কাঁচ নির্মিত একটি ভবন রয়েছে। যার মধ্যে চারপাশের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। আমাকে এটাতে অবস্থান করতে দেওয়া হয়েছিল। যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেদিকে শুধুই সবুজ শ্যামল ও ফুল আর ফল দেখা যায়।

নিকটবর্তী পাহাড়গুলোতে সাদা সাদা বরফও চোখে পড়ে। বড় বড় গোলাপও রয়েছে। হুজুর সা. গোলাপ ফুল বেশি ভালবাসতেন। তাই হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. ও গোলাপ ফুল বেশি পছন্দ করতেন। আমিও এই ফুলগুলো মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখি।

আশ্চর্যের বিষয় হল, এখানকার এক জাতীয় ঘাসে ছোট ছোট সুগন্ধ ফুল হয়। বিভিন্ন রঙের এত সুন্দর ফুল যে সারাক্ষণ শুধু দেখতেই ইচ্ছা হয়। এই ভূমির সাথে সবুজের হয়ত কোন বিশেষ বন্ধন রয়েছে।

শুকনো ফল আমাদের সামনে দেওয়া হল। বড় বড় 'বাদাম' ও 'আখরুট' খুবই মজাদার। পানি এত শীতল যে বারবার পান করতে ইচ্ছা জাগে। এটা জান্নাতের দৃষ্টান্তস্বরূপ এক বিরল অঞ্চল।

মেজবান নিকটবর্তী গ্রামের আলেম ও বুযুর্গদেরকেও দাওয়াত করেছিলেন। যোহরের নামায আদায় করার পর আমি বয়ান করলাম। মাওলানা আব্দুল্লাহ অনুবাদ করেন। প্রায় তিনটার সময় মেজবান বললেন, হযরত! গাড়ী প্রস্তুত রয়েছে।

আপনাকে নিকটবর্তী পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ফিরে এসে আসরের নামায জামে মসজিদে পড়া হবে।

এটা এক আশ্চর্য সফর ছিল। ঝর্ণার পানির উপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় এবং এক স্থানে পৌঁছি, যেখানে এক বুযুর্গের মাজার রয়েছে। নেমে ফাতেহা পাঠ করি। তখন প্রশান্তিময় পরিবেশ বিরাজ করছিল। ফলে অন্তর নিজ থেকেই মুরাকাবা করে নেয়। আমি হযরত গুল বাবাকে এখানে মুরাকাবায়ে মাইয়্যেত পর্যন্ত তালকীন দেই। 'মাশারাবাত' এর সবকসমূহ তিনি অন্য এক শায়খের কাছে তালকীন করেছেন। আমি লতীফায়ে কলব থেকে সবক শুরু করেছি এবং নফী ইসবাতের উপর যথেষ্ট সময় ব্যয় করি। তিনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুজাহাদা করেন। আমার নিষেধাজ্ঞা ও ত্রুটি ধরা সহ্য করে নিতেন। কোন প্রকারের রাগ করতেন না। মাহফিলের ত্রুটি হলে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চেয়ে নিতেন এবং বার বার কাঁদতেন আর আফসোস করতেন, হায়! এই মাহফিল যদি আমার যৌবনকালে নসীব হতো, তাহলে কতইনা ভাল হত।

একবার আমি কোন কথায় রাগ করার ফলে তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে আমার গলায় গলা মিলিয়ে আমার চেহারা ও কপালে চুমু দিতে লাগলেন এবং ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগলেন! হযরত, ভাষা না বুঝার কারণে আমার দ্বারা ত্রুটি হয়ে গেছে। তার ইখলাস দেখে আমার অন্তর থেকে দু'আ আসত।

মাওলানা আব্দুল্লাহ অল্প বয়সী হওয়ার কারণে লতীফা ধীরে ধীরে চালায়। তার মধ্যে খেদমত করার প্রবণতা খুব বেশী।

আরগত এর এই সফরে মাওলানা উজবেকী টুপি ছেড়ে মাথায় পাগড়ী বাঁধতে শুরু করেন। সুন্নত জিন্দা হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হই। আসরের নামায আরগতের জামে মসজিদে আদায় করি। আমি বয়ান করি এবং মাওলানা ভাষান্তর করেন। বয়ান শেষে ইমাম সাহেব বায়আত হওয়ার জন্য আবেদন করলেন। অতঃপর মুসল্লীদের বায়আত হওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। ইশা পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকল। অবশেষে মেজবানের বাড়ীতে এসে ঘুমিয়ে যাই।

সবুজ শহরে সফর

২রা জুন ১৯৯২ ইং সবুজ শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। সমরকন্দ ও সবুজ শহরের মাঝামাঝি এক পাহাড় অবস্থিত। যদি সুরঙ্গ করে রাস্তা করা হয় তাহলে এক শহর থেকে অন্য শহরের দূরত্ব কয়েক মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব হবে। কিন্তু পাহাড়ের কারণে অতিক্রম করতে কয়েক ঘন্টা সময় প্রয়োজন হয়।

পাহাড় সবুজ, কারণেই শহরের নামকরণও এই নামেই করা হয়েছে। এত সবুজ, আমি পৃথিবীর অন্য কোন শহরে দেখিনি। রাস্তার মধ্যেও ঘাস দেখা যায়, কত স্থানে কংক্রিট বিছানো থাকে। তারপরও ঘাস তার মাথা বের করে ফেলে।

আমীরে তৈমুর এই অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শস্য-শ্যামল, সবুজ পাহাড়, অত্যন্ত মনলোভা ঋতু, সুন্দর মানুষ, শহরের ফাঁকা রাস্তার উভয় পার্শ্বে উদ্যান সব মিলিয়ে দেখতে খুবই চিত্তাকর্ষক ও মনোরম।

সফরের সময় ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে মাওলানা আবদুল্লাহ্র অনেক কথাবার্তা চলতে থাকে। শহরে পৌঁছে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, এ শহরে আপনাদের পরিচিতি কেউ আছে? আমরা 'না' বললাম। জিজ্ঞাসা করল তাহলে কেন এসেছেন? আমরা বললাম, বুযুর্গানে দীনের মাজারসমূহ যিয়ারত করতে এসেছি। সে বলল, প্রথমে আমাদের বাসায় চলুন। দুপুরের খাবার খেয়ে আপনারা যেথায় ইচ্ছা যেতে পারবেন।

অতঃপর দুপুরের অবস্থান তার বাসায় হল। আসরের নামায নিকটবর্তী এক মসজিদে আদায় করি। বয়ান শেষে ইমাম সাহেবও কয়েকজন মুসল্লী বায়আত হলেন। কিছু লোক খাবার খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। আমরা বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাদের মেজবান। লোকেরা তার থেকে অনুমতি নেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি শুরু করলেন। ড্রাইভারের স্ত্রী বললেন, আমাদের তো জানাই ছিল না যে, তারা এত সম্মানিত মেহমান, যাদেরকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এত লোক ছোটাছুটি করছে।

পরের দিন সবুজ শহর দর্শন করার জন্য সকালের নাস্তা সেরে রওয়ানা দেই। সাথে ছিল সতেরজন স্থানীয় লোক।

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر

لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

একাকী চলেছি আমি মনযিল পানে

(কিন্তু) কাফেলা হয়েছে লোকদের আসার কারণে।

অর্থাৎ আমি আমার মনযিলে দিকে চলেছিলাম– কিন্তু লোকজন সাথে আসায় তা বিরাট কাফেলায় পরিণত হয়।

কারশীতে আকাশের বাসিন্দা

৩ জুন সবুজ শহর থেকে কারশী শহরে পৌঁছি। এখানে এসে জানতে পারলাম, শহরের মসজিদ এখনও খুলেনি। লোকেরা বাসায় নামায পড়ে নেয়। এক যুবক আমাদের দেখে বলল, আমি আপনাদেরকে আমাদের মসজিদ দেখাব। সে আমাদেরকে মসজিদে বেলালে নিয়ে গেল। মসজিদটির আয়তন প্রশস্ত বটে, তবে এর প্রাচীর ধ্বংস হওয়ার উপক্রম।

চল্লিশজন ছেলে আল্লাহ্ তাআলার এ ঘরটি আবাদ করেছে দেখে যারপরনাই আনন্দিত হই। তাদের ইমাম তের বছরের একটি ছেলে। তার নাম আরিফ বাহ্রাম। মাগরিবের পর বয়ান হলে সকল ছেলে বায়আত হল। এই ছেলেরা যখন বাসায় গিয়ে মসজিদের কারগুজারী শোনাল তখন তাদের বাসার মহিলারা বয়ান শোনার জন্য মসজিদে এসে যায়। ইশার নামাযের পর মহিলাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করা হল। অবশেষে তাদেরকে বায়আত করার পর মুরাকাবা করালাম। এক আরবী যুবকের বাসায় রাত্রে অবস্থান করি। এই বাসার মহিলারা আনন্দের আতিশয্যে রাতে ঘুমায়নি। ফজরের নামাযের পূর্বে আমাদের নেওয়ার জন্য পনেরজন ছেলে আসল। ফজরের নামাযের পর থেকে যোহর পর্যন্ত ছেলেদের সাথে অতিবাহিত করি। ছেলেদেরকে আযান, ইকামত, নামায ও দু'আসমূহ শিক্ষা দিলাম, যিকিরের মাহফিল ও খতীব খাজেগানের পুনরাবৃত্তি করালাম।

আরিফ বাহ্রামকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলাম। যখন ছেলেরা রুমাল দিয়ে পাগড়ী বাঁধে তখন সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা হয়, যেন আকাশ থেকে নেমে আসা ফেরেশতাদের এক জামাত। আমি বললাম, আরশী ফরশী আঁগায়ী (অর্থাৎ আরশী শহরে আকাশের ফেরেশতা এসে গেছে)। মাওলানা এ কথা শুনে খুব খুশী হলেন।

জাযাক রওয়ানা

৫ জুন ১৯৯২ শুক্রবার জাযাক জামে মসজিদে পৌঁছি। এলাকার মুফতী সাহেব বয়ান শুরু করে দিয়েছিলেন। আমরা মসজিদে প্রবেশ করলে মুসল্লীরা আমাদের জন্য রাস্তা করে দিল। ফলে আমরা প্রথম কাতারে চলে যাই। খতীব সাহেব আমাকে দেখেই তার আলোচনা শেষ করে আমার পরিচয় ছাড়াই চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, অবশিষ্ট বয়ান আমাদের মেহমান এই শায়খ করবেন। আমি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বয়ান করলাম। মুসল্লীদের মধ্য থেকে এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হযরত! আপনি আরও বয়ান করুন। আপনার বয়ান আমাদের খুব ভালো লাগছে। অতঃপর আমি বয়ান আরও দীর্ঘ করি। নামায শেষে যথেষ্ট লোক বায়আত হল।

খেতে বসে দেখি মাদ্রাসার ছোট ছেলেরা অত্যন্ত আদব ও এহতেরামের সাথে দস্তরখানা বিছাচ্ছে। প্লেট-গ্লাস ইত্যাদি রাখছে। তাদের মধ্যে তারবিয়াতের রং দেখে খুবই খুশী হই। একটি ছোট ছেলেকে খতীব সাহেব মোল্লা আব্দুল গফুর বলে ডাক দিলেন। ডাক দেওয়ার সাথে সাথে সে দৌড়ে আসল। আমার কাছে বিষয়টি নতুন মনে হল। তাই খতীব সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেন তাকে মোল্লা বলে সম্বোধন করলেন? তিনি বললেন, কমিউনিস্ট জালেমরা যথাসম্ভব দীনকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। এমনকি আমাদের বিভিন্ন উপাধি যা সাধারণত

ইজ্জত সম্মানের জন্য ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে তারা অত্যন্ত মন্দ পন্থায় ব্যবহার শুরু করে দিয়েছিল। যেমন মোল্লা শব্দটি তারা একেবারে অনুভূতিহীন ও বোকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। তাই আমরা একটি নিয়ম করেছি, যে ছেলে মেধাবী ও যোগ্য হবে এবং শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধীকার করবে তাকে মোল্লা উপাধিতে ভূষিত করা হবে এবং সেই নামে ডাকা হবে। ফলে দেখা যায় প্রতিটি ছেলেই এই উপাধি অর্জন করতে চেষ্টা করে এবং মোল্লা উপাধিতে ভূষিত হওয়ার তামান্না করে থাকে। একথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম।

এক মুসলমানের সাথে মুলাকাত

খাবার শেষে একজন আলেমের ব্যাপারে বলা হল যে, তিনি ছয় হাজার মসজিদের ইমাম ও খতীবের ইনচার্জ। তিনি খুব আন্তরিকতা ও মহব্বতের সংগে আমার সাথে মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার বয়ান আমাদের হৃদয় রাজ্য আলোকিত করে দিয়েছে। এ ধরনের নসীহত শোনা আমাদের খুবই জরুরী। আপনি যদি সময় দেন তাহলে জাযাক শহরের সবগুলো মসজিদে আপনাকে দিয়ে বয়ান করাতে চাই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আপনার নাম? তিনি বললেন, মুসলমান। আমি বললাম, মুসলমান তো সবাই। তিনি বললেন, আমার নামই মুসলমান। আমি বললাম, আমি বলতে চাই যে, আপনি নামের মুসলমান।

একথা শুনে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমি উপস্থিত সবাইকে বললাম, দেখুন এর দৃষ্টান্ত হল যে, সব লোকই আল্লাহর বান্দা। কিন্তু কারও নাম আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) রাখা হয়। অনুরূপভাবে সমস্ত নবীদের উম্মতগণই ইসলামের উপর জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু শুধু উম্মতে মুহাম্মদিয়ার দীনের নাম আল্লাহ তাআলা ইসলাম রেখেছেন। এ কারণেই আমরা দু'আ করি

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

আমরা আল্লাহর উপর রাযি হয়ে গিয়েছি তাকে রব হিসেবে পেয়ে, মুহাম্মদ সা. এর উপর তাকে নবী হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামের উপর দীন হিসেবে পেয়ে।

সামান্য স্বাদ আস্বাদন করে দেখুন

পরের দিন খতীব সাহেব বললেন, এখানে বড় মসজিদ দু'টি। প্রথমটি, যেটাতে আপনি গতকাল খুতবা দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি নিকটবর্তী এক মহল্লায় অবস্থিত। সেখানে আপনার যাওয়া খুবই প্রয়োজন। আমি কারণ জিজ্ঞসা করলাম। তিনি বললেন যে, সেই মসজিদের ইমাম সাহেব সউদী আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখেন। এ কারণে তিনি তরীকতপন্থী সবাইকে বেদআ'তী মুশরিক ও গোমরাহ বলে থাকেন। আমি তাকে বন্ধু হিসেবে যথেষ্ট বুঝিয়েছি। কিন্তু তিনি কোন ভ্রূক্ষেপ করেন না।

আমার ভয় হয় যে, এ বিষয়টি যদি জনসাধারণ বুঝতে পারে তাহলে আমাদের মধ্যে পরস্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। আপনি যা ভাল মনে করেন। তিনি ফোনে খতীব সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং বললেন, পাকিস্তান থেকে এক শায়খ তাশরীফ এনেছেন। এখানকার লোকদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। আমার ইচ্ছে তাকে দিয়ে আপনার মসজিদে বয়ান করাবেন। খতীব সাহেব রাজী হয়ে গেলেন।

আমি সকল বন্ধু-বান্ধবসহ যোহরের নামায পড়ার জন্য সেখানে গিয়ে দেখি মসজিদে মুসল্লী ভরপুর। ইমাম ও খতীব মাওলানা উসমান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হল। তাঁর বড় ছেলে আড়চোখে তাকাচ্ছিল, যেমনভাবে কারও দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকানো হয়। নামায শেষে উসমান সাহেব তাকেই অনুবাদক বানিয়ে দিলেন। আমি তাযকিয়াযে নফস (আত্মশুদ্ধি) ও তাসফিয়ায়ে ক্বলব (পরিচ্ছন্ন কলব) সংক্রান্ত বিষয়ে বয়ান শুরু করলাম। দলীল হিসেবে একের পর এক কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলাম। কিন্তু মাহফিলের লোকজন ঝিমাতে শুরু করল। অনুবাদকের মধ্যে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। আমি দশ মিনিট বয়ান করলে সে দু'মিনিটে সারমর্ম বলে শেষ করে দেয়। ইতিমধ্যে মাওলানা আবদুল্লাহ অবস্থা টের পেয়ে গেলেন। নিজে এসে অনুবাদককে বললেন, আপনি যান। অবশিষ্ট বয়ান আমি অনুবাদ করব। আলহামদুলিল্লাহ! মাওলানা এমন অনুবাদ করলেন, যার ফলে অন্তর খুশী হয়ে গেল। বয়ান ও মুরাকাবার পর আমি দু'আ করলাম। মাওলানা চুপিসারে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! বায়আতের ঘোষণা করব কি? আমি বললাম, না। ইমাম ও খতীব বিরোধিতা করবে। আমাদের উৎকৃষ্ট গুড় রয়েছে, তারা নিজেরাই খুঁজে নিবে। মাওলানা তার সফরের প্রতিক্রিয়া ও চাক্ষুষ দেখা ঘটনাবলী বয়ান শুরু করে দিলেন।

লোকেরা যখন জানতে পারল যে বুখারা, সমরকন্দ নামগান ও মারগেনানের বড় বড় মাশায়েখ ও ওলামারা বায়আত হয়েছেন, তখন তারাও বায়আত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল। বায়আতের জন্য কাপড় দেওয়া হলে ইমাম সাহেব ও তার ছেলে কাপড় ধরলেন এবং বায়আতের কালেমা পাঠ করলেন। বায়আতের পর ইমাম সাহেব ও তার ছেলের কলবের উপর আঙ্গুল রেখে ইসমে যাতের খবর লাগিয়ে দিলাম এবং বললাম এটা এক নিয়ামত। আপনারা এর স্বাদ আস্বাদন করে দেখুন। যে দোকানদারের গুড় উৎকৃষ্ট হয়, সে পরীক্ষামূলক ক্রেতাকে একটু গুড় খাইয়ে দিয়ে স্বাদ আস্বাদন করায়। আর এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

উপস্থিতদের থেকে কিছু লোক তাদের বাড়ীতে দাওয়াত কবুল করার অনুরোধ জানালেন। ইমাম সাহেব যখন দেখলেন প্রত্যেক মুসল্লীর অন্তর জয় করে ফেলেছি, তখন তিনি বললেন, না, তিনি আমার মেহমান হবেন। আমি হ্যাঁ সূচক

জবাব দিলাম। ইমাম সাহেবের বাসায় পৌঁছলাম। চমৎকারভাবে আপ্যায়ন করলেন তার বাসায় জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি, রাজকীয় অবস্থা। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতা দেখাচ্ছিলেন। খাওয়ার সময় তিনি বললেন, এগুলো সৌদি আরবের সাহায্যে প্রাপ্ত। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, (হে শায়খ!) অজীফা করা কেমন? আমি এর বিস্তারিত আলোচনা করলাম, কতক মূর্খ সূফীদের কথাকে ভিত্তি করে সমস্ত বুযুর্গানে দীনকে পথভ্রষ্ট মনে করা কতুটকু ইনসাফের? সউদি আলেমদের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হল যে, তারা কতক বুযুর্গের বিশেষ অবস্থার সময় মুখ নিঃসৃত কথাকে ভিত্তি করে তাসাউফকে শরীয়ত ও ইসলামবিরোধী ফতোয়া প্রদান করে। মূলত তাসাউফই হল ইহসানের অপর নাম। অথচ ভাল-মন্দ পার্থক্য করা আলেমদের দায়িত্ব।

আলহামদুলিল্লাহ! ইমাম মাওলানা উসমান সাহেবের শুভবুদ্ধির উদয় হল, ফলে নিয়মিত মুরাকাবা করার তরীকা শিক্ষা করলেন এবং ওয়াদাবদ্ধ হলেন যে, আগামীতে গোমরাহ সূফীদের বিরোধিতা করবেন, সকল সুফীদের নয়। আমি বললাম যে, গোমরাহ সূফীদের বিরুদ্ধে হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহ. সবচেয়ে বেশি কঠোরও সোচ্চার ছিলেন। আমি তারই একজন ভাবশিষ্য। অতঃপর তাঁর মাকতুবাতের কিছু ইবারত পাঠ করে শোনালাম। ইমাম সাহেব বললেন! হযরত, আপনার আগমন আমাদের রহমতের কারণ হয়েছে। তা না হলে আমরা বুযুর্গানে দীনের তরীকা থেকে দূরে সরে যেতাম।

পরের দিন এক মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবের বাসায় সকালের নাস্তার দাওয়াত ছিল। তার ছেলে কামালুদ্দীনের সহপাঠি এবং নামগানের দাউদ খানের ছাত্র ছিল। ইশরাকের সময় ইমাম মাওলানা উসমান সাহেবও এখানে পৌঁছে গেলেন। আমি তাওহীদ বিষয়ক বয়ান শুরু করলাম। বয়ান শুনে ইমাম সাহেবের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। বয়ান শেষে মাওলানা তার ঠিকানা লিখে দিলেন এবং বললেন, হযরত! আমি আপনার সাথে যোগাযোগ রাখতে চাই। আপনি আমাকে আপনার শাগরিদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। মাহফিলে উপস্থিত লোকদের খুশীর সীমা ছিলনা।

এই মাহফিলে অত্র অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ও বড় বুযর্গ হযরত মাখদুমে আযম রহ. এর দু'আওলাদ উপস্থিত ছিলেন। হযরত সাঈদ আকবর ও হযরত সাঈদ আবরার বায়আত হলেন। বড় ভাই সাঈদ আকবর সূফী ও দরবেশ ব্যক্তি এলাকায় তার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। তারা তাদের বাসায় যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। আমি কবুল করলাম।

যোহরের নামায মসজিদের কালায় আদায় করলাম। নামায শেষে তাকওয়া সংক্রান্ত বয়ান হল। ইমাম, খতীব, সহকারী ইমাম ও অন্যান্য সকল মুসল্লীরা বায়আত হলেন। ইশার নামায ও বয়ান নির্মাণাধীন এক বড় মসজিদের আঙ্গিনায়

হয়। এখানে উপস্থিতির অধিকাংশই ছিল যুবক। মূলতঃ এ দৃশ্য মাদরাসায়ে মীরে আরজ এর উস্তাদ মাওলানা সাঈদ আযমের পরিশ্রমের ফলাফল ছিল। বয়ানের তরজমা তিনিই করলেন এবং বায়আত হওয়ার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম সামনে এগিয়ে আসেন। অতঃপর উপস্থিত সবাইকে বায়আত করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! মাত্র দু'দিনে আল্লাহ তাআলা সিলাসিলার প্রচার-প্রসার এর কাজ খুব নিলেন।

পরের দিন এখান থেকে রওয়ানা হয়ে তাশখন্দের সিয়াহত হোটেলে পৌঁছি। জনাব ইয়াকুব তাবানী বললেন! হযরত, আমরা আপনার বয়ান আপনার মুখ থেকে শুনেছি এখন আপনি তা লিখে সফরনামা তৈরী করেন, যেন অন্যান্য লোকজনও উপকার গ্রহণ করতে পারে। আমি তার কথায় হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। আব্বাস খানের সাথে মুলাকাত হলে তিনি বললেন, হযরত আপনার সংবাদ আমাদের এখানে সবার কাছে পৌঁছে গেছে। এক সাংবাদিক আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য এখানে বারবার যোগাযোগ করছে। এর দ্বারা সাধারণ লোকদেরও উপকার হবে। আপনি আগামীকাল আমার সাথে গিয়ে জরুরী ভিত্তিতে এ কাজ সেরে নিন।

উজবেকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকার

৮ জুন ১৯৯২ ইং আব্বাস খান আমাকে এক অফিসে নিয়ে গেলেন, যেখানে সাংবাদিক ফোরামের প্রতিটি সদস্য উপস্থিত ছিল। আনুমানিক এক ঘন্টা আলোচনা হল। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করল।

পরবর্তী সপ্তাহের পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী সাক্ষাৎকার ছাপানো হয় এবং বিশ লাখ কপি প্রচার করা হয়। এর দ্বারা এই উপকার হয়েছে যে, পরবর্তীতে যত সফর করেছি এই সাক্ষাৎকারের আলোচনা করতে লোকদেরকে দেখেছি। দূর-দূরান্ত অঞ্চলের ওলামায়ে কেরাম শহরে এসে বায়আত হতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা এটাকে তার দীন প্রচার প্রসারের মাধ্যম বানিয়ে দিলেন।

তাশখন্দের রেডিওতে সাক্ষাৎকার

১৬ জুন ১৯৯২ইং আব্বাস খানের সাথে রেডিও তাশখন্দের কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছি। উর্দূ সেকশনের জনাব হাসেম খানের সাথে মুলাকাত হয়। তিনি বললেন, আপনার তেলাওয়াত রেকর্ড করে তা আগামীকাল উর্দূ প্রোগ্রাম আরম্ভ করার পূর্বে সম্প্রচার করা হবে। অপর কয়েকটি সূরার তেলাওয়াত রেকর্ড করলাম। হাসেম খান বললেন, এখন আপনার বয়ান রেকর্ড করা হবে ইতোপুর্বে আমি দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, একটির নাম উজবেকিস্তান কি ইলমী সিতারেই (উজবেকিস্তানের এলমী নক্ষত্রাবলী) যার মধ্যে উজবেকিস্তানের উলামা ও বুযর্গদের হালত ও

ঘটনাবলীর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা ছিল। হাসেম খান তা পড়ে লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন, আপনি এত ভাল লিখতে পারেন? আমরা আপনাকে এখান থেকে কোথাও যেতে দিব না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম ছিল সুকূনে দিল হাসিল কি জায়ে (আত্মার প্রশান্তি অর্জন করা চাই)। এর মধ্যে যিকিরের দ্বারা আত্মার প্রশান্তি কীভাবে অর্জিত হয় তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফেরার পথে জনাব আব্বাস খান বললেন, হযরত! আমি আপনাকে এতদিন ইঞ্জিনিয়ার ও পীর ভাবতাম। আজ জানতে পারলাম, আপনি একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক। আমি বললাম, জনাব সাহিত্য বা আদব শিক্ষা করার দ্বারা তো কিছু অর্জিত হয়, কিন্তু এমন আদব নয়, যা কবিতা ও কবিত্ব প্রকাশ করে। বরং আদব তো সেটা, যা হুজুর সা. বলেছেন-

اَلدِّيْنُ كُلُّهٗ اٰدَبٌ

"দ্বীন পুরোটাই আদব"

কোন আরেফ বলেন–

اَدِّبُوا النَّفْسَ اَيُّهَا الْاَصْحَابُ

طُرُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا اٰدَابٌ

নফসকে আদব শিক্ষা দাও, কেননা প্রেমের পথ সেতো পুরোটাই আদব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাজাকিস্তান সফর

২০ জুন ১৯২১ ইং মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমান সিয়াহত হোটেলে আমার কাছে আগমন করেন।

আবু উসমান জিজ্ঞেস করেন, হযরত! এখানে আপনার খাবার-দাবার ও অন্যান্য বিষয়ে কোন অসুবিধা হয় না তো?

আমি বললাম, কোন অসুবিধা হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাকে উত্তম ও উন্নত খাবার খাওয়াচ্ছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত খাবার খেতে আপনাকে রেস্টুরেন্টে যেতে হয়? আমি বললাম, না। বরং এখানে খাবার পৌঁছে যায়। আবু উসমান আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে দরজায় কড়া নড়ল। আবু উসমান দরজা খুলে দেখেন এক রুশ যুবতী গরম খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে সালাম করে দস্তরখানা বিছানোর অনুমতি চাইল। আমি অনুমতি দিলাম। সে দস্তরখানার উপর খাবার রাখল। পানিও অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা করল এবং জিজ্ঞাসা করল, প্লেট নিতে কখন আসব? আমি বললাম, আধঘন্টা পর। যুবতী চলে যাওয়ার পর আবু উসমান বললেন, হযরত আমি ও মাওলানা আবদুল্লাহ ভাবছিলাম যে, এখানে আপনার খাবারের খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এখন আমরা স্বচক্ষে দেখলাম আল্লাহ তাআলা আপনাকে রাজা বাদশাহদের ন্যায় ইজ্জত সম্মানের সাথে খাবারের ব্যবস্থা করছেন।

আমি বললাম, আসুন, খাবার খান।

দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা অল্প সময় কায়লুলা করি। অতঃপর চারটার সময় রেলস্টেশনে পৌঁছি। ডাক্তার মানসুর আমাদেরকে এগিয়ে দিতে আসেন। এখানে পৌঁছে বুঝতে পারি যে, টিকেটে মস্কোর সময় উল্লেখ রয়েছে, উজবেকিস্তানের সময় এক ঘন্টা পরে হওয়ার কারণে আমাদেরকে এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে লোকজন মোসাফাহ করতে ও দু'আ নিতে ভিড় করতে লাগল। হঠাৎ একদিক থেকে একটি ধ্বনি ভেসে আসল। ভাই যুলফিকার সাহেব! কিয়া হাল হ্যায়? আমি তাকিয়ে দেখি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির এক সহপাঠী দাঁড়িয়ে আছে। তার সাথে মুলাকাত হয়। সে জানালো, বর্তমানে ছাকওয়াল অঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরী করছি।

তাবলীগ জামাআতের সাথে এখানে এসেছি। জামাত দুশোম্বা যাচ্ছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে কী জন্য এলেন? আমি বললাম দুশোম্বা যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি পাকিস্তান থেকে একাই এসেছেন? আমি বললাম, দেখতে তো আমি একাই। তবে আল্লাহ তাআলা সাথে রয়েছেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমানকে পাশে দাঁড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করল, এরা কারা? আমি বললাম এরা আমার সফরসাথী। সে জিজ্ঞাসা করল, তাদেরকে সাথে রাখার জন্য আপনাকে ভিসা দিয়েছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে জামাআত নিয়ে চলার ভিসা দিয়েছে? সে বলল, আমরা তো আল্লাহর রাস্তায় চলছি বিধায় ভিসা দিয়েছে। আমি বললাম, তাহলে আমরা কি শয়তানের রাস্তার চলছি যে, আমাদেরকে ভিসা দেবে না?

সে বলল, আমার উদ্দেশ্য তো এটা জিজ্ঞাসা করা নয়, বরং আমরা তো তাবলীগের কাজে যাচ্ছি আর আপনি তো শুধু রাশিয়া সফর করতে যাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনার ভ্রান্ত বুঝ ছেড়ে দিন। জামাআত হওয়ার জন্য আট দশজন জরুরী নয়। কখনও একজনেও জামাআত হয়। (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً)

(নিশ্চয়ই ইব্রাহীম আ. এক জামাআত ছিলেন)। সে বলল, আপনারা এখানে কি করছেন ? আমি বললাম (اَللّٰه - اَللّٰه) আল্লাহ -আল্লাহ করি এবং মানুষকেও করাই। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, আপনারা আমাদের সাথে সফর করুন। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ একই ট্রেনে প্রায় বিশ ঘন্টার সফর ও মুলাকাত হবে। সে বলল, আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে বলবেন। আমি বললাম, প্রয়োজন পুরাকারী তো সর্বদা সাথেই রয়েছেন। তার তন্দ্রা ও ঘুম আসে না, তিনি ক্লান্তও হন না। একথা শুনে সে মুচকি হেসে বলল, আপনি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালীন এ জাতীয় অর্থবোধক কথা বলতেন। আমি বললাম, নিরর্থক কথা কেন বলব? সে বলল। ঠিক আছে, আস্‌সালামু আলাইকুম। মাওলানা আব্দুল্লাহ উসমান অনুমান করতে পারলেন, আমি এই যুবকের সাথে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কিভাবে কথা বলেছি। তারা জিজ্ঞাসা করল, হযরত! তিনি কে? আমি বললাম, সে আমার ইউনিভার্সিটির সহপাঠী। অপেক্ষার পালা শেষ হয়ে গেল এবং প্লাটফর্মে যাওয়ার জন্য গেট খুলে দেওয়া হল।

দুশুম্বা সফর

মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোতে ট্রেনে সফর করা খুবই আরামদায়ক ও নিরাপদ। ট্রেনের সিট খুবই ভাল। রুমগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রতিটি রুমে চারজন বসা ও শোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং কয়েকটি রুম মিলিয়ে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা আছে, ট্রেনে রেস্টুরেন্টের একটি বড় রুমও থাকে, যাতে খাবার-দাবারের উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে।

যখন আমরা গাড়ীতে আরোহন করি। আমাদের তিনটি সিট ছিল, অপর একটি সিটে এক অর্ধনগ্ন রুশ যুবতী ছিল। যখন সে সহজেই অনুধাবন করতে পারল যে, সে এই সিটে বসতে পারবে না, সে পাশের রুমে গিয়ে এক ব্যক্তির সাথে তার সিট পরিবর্তন করে নিল। ফলে আমাদের অসুবিধা কেটে গেল।

ট্রেনের বগী এমন ছিল যে, ট্রেনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অনায়াসে চলাচল করা যেত। আমরা পরস্পরে নামাযের সময় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করছি। ইতোমধ্যে দুই যুবক আমাদের রুমে প্রবেশ করল। মাওলানা আবদুল্লাহ তাদের দেখে খুশী হন এবং মহব্বতের সাথে আলিঙ্গন করেন। অতঃপর পরিচয় হল, তারা তাশখন্দ অবস্থিত তাল্লাহ্ শায়খ মাদ্‌রাসার ছাত্র। তারা বলল, আমরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র। আজ আমাদের বাৎসরিক ছুটি হয়েছে। তাই আমরা দুশোম্বা যাচ্ছি। ছাত্ররা আপনার সাথে মুলাকাত করতে আগ্রহী। আমি বললাম, আচ্ছা। তাহলে আমাদের সফরের সময় ভালই কাটবে। তবে আপনারা ৬/৭ জন করে আসবেন যেন রুমে আরাম করে বসা যায়। অতঃপর ছাত্ররা ধারাবাহিকভাবে আসতে লাগল। আমি ওয়াজ ও নসীহত অব্যাহত রাখি। কিছুক্ষণের মধ্যে তাবলীগী ভাই আসল। সে রুম ভর্তি দেখে পেরেশান হয়ে গেল। আমি তাকে আমার সাথে বসাই। সে আমার ওয়াজ শুনতে লাগল এবং ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

বয়ান শেষে ছাত্ররা বায়আত হওয়ার আবেদন করল। আমি তাদেরকে বায়আত করে সিলসিলায়ে আলীয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। তাদের পরে দ্বিতীয় গ্রুপ আসল। অতঃপর কিছু সময় বয়ান করে তাদেরকেও বায়আত করি। যথেষ্ট সময় পর্যন্ত এই মাহফিল চলল। আমার সহপাঠী ও তাবলীগী ভাই মন্তব্য করল যে, আমার ধারণাই ছিল না যে, আপনার দ্বারা এত বিরাট খেদমত হচ্ছে। আমি বলি, উদ্দেশ্য আমাদের সবার একই। তবে মেহনত বিভিন্ন পন্থায় হয়। উভয়টাই সাধক। আমাদের পরস্পরে মহব্বত রেখে দীনের কাজ করা উচিৎ। সে বলল, আমাদের জামাআতের সাথীরা আপনার সাথে মুলাকাত করতে চায়। আমি বললাম, তাদের মুলাকাত তো আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। অতঃপর জামাতের সাথীরা আসেন এবং আমাদের সাথে একত্রে খাবার খান। আমরা নামাযের নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করি।

সফর দেখতে তো কষ্টকর, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সৌভাগ্য সফলতার মাধ্যম বানিয়ে দেন। আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে বিশ ঘন্টার এই সফর শেষ হল। দুশোম্বা রেলস্টেশনে অবতরণ করে ট্যাক্সিযোগে নূ শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি।

নূ শহরের তিন ভাই

নূ শহরের তিন যুবক হাবীবুল্লাহ, মুহিব্বল্লাহ ও মুতীউল্লাহ বুখারার হযরত তিশা বাবার বাসায় মুরীদ হয়েছিলেন এবং দুশোম্বা আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমি দাওয়াত কবুল করেছিলাম। তবে সময় নির্ধারণ করে দেইনি। মূলত অঙ্গীকার পুরো করতে তাদের এখানে আসা। চারপাশের পাহাড়ী অঞ্চল, খুবই মনোলোভা। সবুজ শস্য-শ্যামল পরিবেশ। বাড়ীগুলো খোলামেলা। প্রতিটি বাড়ীর আঙ্গিনায় উদ্যান রয়েছে। দেওয়ালগুলোতে আঙ্গুরের গাছ ঝুলছে, যেন কেউ তা সাজিয়ে রেখেছে। ঝর্ণার পানি ছোট ছোট নালা দিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এখানকার লোকদের অন্তরে আত্ম-প্রশান্তি রয়েছে। তারা ইসলামী জীবন যাপনের প্রতি অনুরাগী। পাশ্চাত্যের ন্যায় ভোগবিলাসী জীবন-যাপন, আমোদ ফূর্তি নেই বললেই চলে। ট্যাক্সি একটি বাড়ীর গেটে এসে থামল। মাওলানা আবদুল্লাহ নেমে কড়া নাড়লেন। হাবীবুল্লাহ গেট খুলে আমাদেরকে দেখে জোরে আল্লাহু আকবার বলে আওয়াজ দিলেন। তার আওয়াজ শুনে বাকী দুই ভাইও চলে এলেন। মহিলারা দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছে। আমি বললাম, আপনারা কি টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমাদের আগমনের সংবাদ জানতে পেরেছেন? তারা বলল, না।

আমি বললাম, আমরা আপনাদেরকে অবগত না করে এসে পেরেশানীতে ফেলে দিয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। হাবীবুল্লাহ বললেন, ভিতরে আসুন, তারপর কথা হবে।

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি

বাসায় ঢুকে দেখি এক কামরায় তিনটি বিছানা বিছানো রয়েছে। দস্তরখানে তিনটি প্লেট রাখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, যেভাবে মেহমানদের জন্য সাধারণত সাজানো হয়ে থাকে সেভাবে সাজানো। আমি বললাম, কি ব্যাপার? হাবীবুল্লাহ বললেন, অদূরেই এক বুযুর্গ বাস করেন, কয়েকদিন পূর্বে আমরা তার সাথে মুলাকাত করতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, অমুক দিন তোমাদের বাসায় তিনজন মেহমান আগমন করবে। তাদের একজন নকশবন্দী শায়খ। তোমরা তাকে সম্মান করবে এবং আমাকে অবহিত করবে। আমি তার সাথে মুলাকাত করতে যাব। আজ সেই দিন। তাই আমরা তিন ভাই অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। তা না হলে দিনের বেলায় আমাদেরকে বাসায় পাওয়া খুবই দুষ্কর। আলহামদুলিল্লাহ! আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনটি বিছানা বিছানো এবং খাবারও প্রস্তুত করা আছে। আপনারা অনুগ্রহ করে খাবার খেয়ে নিন। আমাদের বাসায় রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হচ্ছে।

খাবার খেয়ে আমরা ঘুমিয়ে যাই। ঘুম থেকে জেগে যোহরের নামায আদায় করি, অপরদিকে চা প্রস্তুত করা ছিল।

আমি হাবিবুল্লাহকে বললাম, আমাকে তাজাকিস্তানের ব্যাপারে কিছু বলুন কেননা এটা আমার প্রথম সফর।

সুন্দর দেশ সুন্দর মানুষ

হাবীবুল্লাহ বলেন যে, কমিউনিস্ট আগ্রাসনের পূর্বে তাজাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল ১৮৬৮ ইং থেকে রুশ সম্রাটের করায়ত্বে ছিল। তখন দক্ষিণাঞ্চল আমীরে বুখারার রাষ্ট্রের অংশ ছিল। আগ্রাসনের পর কয়েক বছর পর্যন্ত এই অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তানের অংশ ছিল। অতঃপর ১৯২৯ইং ষ্টালিন তাজাকিস্তানকে প্রজাতন্ত্রের রূপ দেয়। এর সীমারেখা এত বিস্তৃত ছিল যে, বুখারা এবং সমরকন্দ সহ অর্ধেক তাজাকিস্তান উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং বাকী অংশকে নতুন প্রজাতন্ত্র বানিয়ে দেয়। তখন উজবেকিস্তানে আশি লাখ তাজেকী বসবাস করত, যখন তাজাকিস্তানে মাত্র দশ লাখ উজবেকী ছিল।

তাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের আয়তন মাত্র ১ লাখ ৪৩ হাজার বর্গ কিঃ মিঃ। কিন্তু এর পশ্চিমে উজবেকিস্তান উত্তরে কিরগিস্তান, পূর্বে চীন এবং দক্ষিণে আফগানিস্তান হওয়ার ফলে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তাজাকিস্তান সুন্দর সুন্দর পাহাড়বিশিষ্ট এক মনলোভা দেশ। এর অধিবাসীরাও খুব সুন্দর। যার দৃষ্টান্ত বিরল। তাদের ভাষা ফার্সী, অর্থাৎ তাজেকী ফার্সী। তাজাকিস্তানের জনসংখ্যা প্রায় ৩৩ লাখ। যাদের মধ্যে ১৭ লাখ তাজেকী এবং বাকীরা উজবেকী রুশ ও তাঁতারী।

আমি বললাম, দুশোম্বার ব্যাপারে কিছু বলুন। হাবীবুল্লাহ বললেন, হিসার উপত্যকার এক দরিয়ার নাম দুশোম্বা। এর তীরেই ছোট একটি জনপদ দুশোম্বা নামে পরিচিত। কিন্তু প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর এই জনপদকে শহরে রূপান্তরিত করে। মধ্যখানে এর নাম স্টালিনাবাদ রাখা হয়েছিল। অতঃপর পরিবর্তন করে পুনরায় দুশোম্বা। রাখা হয়। এখানকার একটি বড় সড়ক খিয়াবান রোড পুরো শহর পর চারপাশে।

ইতিমধ্যে নিকটবর্তী জনপদ থেকে মুলাকাত করতে লোকজন আসতে শুরু করল। তাই আমরা তাদের সাথে মুলাকাতে ব্যস্ত হয়ে যাই। মাগরিব নামাযের পর মসজিদে বয়ান হয় এবং লোকজন সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইশার পর বাসায় ফিরে এলে মহিলারা বয়ান শোনার আগ্রহ প্রকাশ করল। বয়ান, মুরাকাবা এবং বায়আত থেকে রাত ১২ টায় অবসর হয়ে গভীর নিন্দ্রায় তলিয়ে যাই।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব চারখী (রহ)

সোমবার দিন মুহিব্বুল্লাহর সাথে দুশোম্বা যাই এবং হযরত মাওলানা ইয়াকুব চারখী রহ.-এর আলোকোজ্জ্বল মাজারে উপস্থিত হই। হযরতের কাছে আফগানিস্তানের লোক বেশি মুরিদ ছিল। ফলে তারা খানকার যাবতীয় খেদমত নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নেয়। আজও আফগানের অধিবাসীরা খানকার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে।

হযরত ইয়াকুব চারখী রহ. বড় আলেম ও আশেক ছিলেন। তিনি কুরআন শরীফের তাফসীর লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু লিখা শেষ করার পূর্বেই ইহধর্মী ত্যাগ করেন। ইসালে সওয়াবের পর মাজার সংলগ্ন মসজিদে গিয়ে আমার সহপাঠী ও অন্যান্য তাবলীগী ভাইদেরকে দেখতে পাই। সবাই আনন্দের সাথে একে অপরের সাথে মিলিত হয়। আমার সহপাঠী বললেন যে, তাশখন্দ থেকে তো আপনারা তিনজন এসেছেন। এখন দেখা যায় প্রায় বিশজন। আমি বললাম, হ্যাঁ। সে জিজ্ঞাসা করল, তারা পূর্বেই আপনার পরিচিত, না এখানে এসে পরিচয় হয়েছে? আমি বললাম এখানে আসার পর তারা আমার কাছে বায়আত হয়েছে। অধিক মহব্বতের ফলে সাথে সাথে ঘুরছে। সে বলল, আমরা আটজন লোক গতকাল পুরো দিন মেহনত করে মাত্র চারজন তৈরী করেছি, অথচ আপনি বিশজন নিয়ে ঘুরছেন। আমি বললাম–

ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

এই সৌভাগ্য বাহুবল দিয়ে অর্জন করা যায় না, যদি আল্লাহ তাআলা দান না করেন।

ইতোমধ্যে মসজিদের মুয়াযযিন এসে বললেন, হযরত! আপনি জুমআর নামায আমাদের মসজিদে পড়াবেন। আমি বললাম! ইনশাল্লাহ।

আমার সহপাঠী বলল, জুমআর দিন আমরা অন্যস্থানে চলে যাব। তাই আজ আমার সাথীদের উদ্দেশ্যে কিছু বয়ান, নসীহত করুন। তার অনুরোধ রক্ষার্থে ইলম ও যিকির সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু বয়ান করি।

মুহিব্বুল্লাহ চুপচাপ বসেছিল। সে কখনও আমার চেহারার দিকে তাকায়, আবার কখনও হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। মূলত এটা তার ইঙ্গিত ছিল যে, আমরা যিয়ারতের জন্য সামনে যাব। কিন্তু সময় দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমি দু'আ করে দেই।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাধারণ জনগণের হিদায়তের জন্য গোটা দুনিয়ায় তাবলীগের নামে যে মেহনত চলছে, তা হযরত নূহ আ. এর কিশতির ন্যায়। আর

যে ব্যক্তি এ মেহনতে শরীক হবে সে আল্লাহর এই আয়াতের মিসদাক হয়ে যাবে–

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا

আর যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করবে, নিঃসন্দেহে সে নিরাপদ হয়ে যাবে।

হযরত খাজা মাখদুম আযম রহ.

দুশুম্বা থেকে রওয়ানা হয়ে হিসার উপত্যকায় পৌঁছি। এটা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বিস্তৃত ও প্রশস্তভূমি। কোন এক সময় এটিকে মূলকে হিসার বলা হত। তৎকালীন বাদশাহ এখানে শাহী কিল্লা নির্মাণ করিয়েছিলেন। সাথেই এক মনোরম উদ্যান তৈরী করেছিলেন। যদিও বর্তমানে জীর্ণ বাড়ীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও জীর্ণ পোড়া বাড়ীই প্রমাণ করে যে, এটা বিশালাকার প্রাসাদ ছিল।

এ সব অট্টালিকার কাছেই হযরত খাজা মাখদুম রহ. এর মাজার। আমীরের অট্টালিকার কাছে এই ফকিরকে শায়িত দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। ধারণা করি যে, তৎকালীন শাহী খান্দানের লোকজন হযরত মাখদুম আযম রহ.-এর কাছে মুরীদ ছিল। তাদের খান্দানের শায়খ হওয়ার সুবাদে তার ইন্তিকালের পর অট্টালিকার পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হয় এবং মাজার নির্মাণ করা হয়।

রাখে আল্লাহ মারে কে?

নূ শহরে তাব্বাশ নামে এক জনপদ রয়েছে, যা মানুষের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার এক নিদর্শন। এই জনপদের লোকজন কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিল এবং নগ্নতা ও বেহায়াপনার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মুহিব্বুল্লাহ বললেন যে, এক রাতে এই জনপদের অধিবাসীরা অলস নিদ্রায় বিভোর হয়েছিল।

হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হয়। সবাই জেগে গেল এবং ঘর থেকে বের হয়ে আঙ্গিনায় চলে আসল। কিছুক্ষণ পর ভূমিকম্প শেষ হয়ে গেল। তাই তারা ঘরে এসে পুনরায় শুয়ে পড়ে। হঠাৎ করে দ্বিতীয়বার ভয়ংকর ভূমিকম্প শুরু হল এবং জনপদ পুরোটা তছনছ করে দিল। সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হল। একটি দুধ পানকারী শিশু ছাড়া সবাই। সত্য ও বাস্তব কথা হলো, রাখে আল্লাহ মারে কে? আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাকে মারার সাধ্য কারো নেই।

আমি মুহিব্বুল্লাহকে বললাম, হুজুর সা. এর সুন্নত হল, যে স্থানে আল্লাহর আযাব গজব নাযিল হয় সে স্থান দিয়ে ইস্তেগফার করতে করতে দ্রুত চলে যাওয়া। সুতরাং আমরা সবাই গাড়ীতে বসে রওয়ানা করি। সে স্থানে গিয়ে এত ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়েছিল যে, তিনদিন পর্যন্ত আমাদের অন্তরে তা অনুভব হয়।

আজও সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ চোখের সামনে ভেসে উঠে শরীরে কাঁপুনি সৃষ্টি হয় এবং মুখ থেকে এই আয়াত নিঃসৃত হয় ঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ

আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহগার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যাক্ত হয়েছে। কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। (সূরা হজ্জ ঃ ৪৫।)

আল্লাহ প্রেমিক রাজমিস্ত্রী

২৩ জুন নূ শহর থেকে প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ দূরে এক কবরস্থানে হাজির হই। এখানে সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার এক বড় বুযুর্গ চিরনিদ্রায় শায়িত। তার নাম ছিল আরিফ এবং এই নামেই তাকে ডাকা হত। সরকার এটাকে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করে রেখেছে। এই ইমারতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এটাকে ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এবং নির্মাণশৈলির নৈপুণ্যতার ক্ষেত্রে এর দৃষ্টান্ত একমাত্র এটাই।

আমি ইমারতের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি, ঐগুলো এমন নিপুণভাবে সাজানো হয়েছে যে, কয়েকটি ইট মিলে আল্লাহ তাআলার নাম (الله) এর নকশা হয়ে রয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আমাদের মাশায়েখগণ কত কামেল ছিলেন যে, তাদের খেদমতে অবস্থানকারী রাজমিস্ত্রীদের অন্তরেও আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রেম এমনভাবে শিকড় গেড়ে ছিল যে, তারা ইমারত নির্মাণ করতে গিয়ে ইটগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নামের নকশা তৈরী হয়ে গিয়েছে। কবি বলেন–

میں نے تو یونہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں
دیکھا جو غور سے تری تصویر بن گئی

"আমি তো শুধু মাটিতে আঙ্গুল ঘুরাই না, যে গভীর দৃষ্টিতে দেখবে সে দেখতে পাবে যে, তোমার ছবি তৈরী হয়েছে।"

কতক স্থানে ইট ছাড়া দিলের নকশা বানানো হয়েছে এবং এর মধ্যে (الله) শব্দ লিখে দেয়া হয়েছে। আশ্চর্য আল্লাহপ্রেমিক ছিল তারা যে, ইট লাগানোর সময় তাদের খালেক ও মালেকের নাম ভুলেনি, বরং ইমারতের গায়ে নকশা করে দিয়েছে।

মসজিদে খাজা মুহাম্মদ আরিফ রেওগরী রহ.

মাজার যিয়ারত করে পাশ্ববর্তী শহর রেওগর এর জামে মসজিদে যোহরের নামায আদায় করি। ইমাম সাহেব বয়ান করার অনুরোধ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ! বয়ানে বহু লোক সিলাসিলায়ে আলীয়ার অন্তর্ভুক্ত হল। স্থানীয় লোকদের মাঝে যিকিরের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। এমন এক ব্যক্তি মুরীদ হন, যিনি সায়েমুদ্দাহর (পুরো বছর রোযাদার) ছিলেন। আমি তাকে সাওমে দাউদী (একদিন অন্তর অন্তর) রোজা রাখার পরামর্শ দেই। যুবকদের মধ্যে জোশ ও স্পৃহা ছিল। বয়ান শেষে খাবার খেয়ে নেই। খাবার শেষে স্থানীয় এক বুযুর্গ হযরত ইশাবাবা মুরীদ হন এবং বললেন, মুরাকাবায়ে মা'আয়্যিত পর্যন্ত সবকসমুহ আমার শায়খের কাছে আদায় করেছি। সামনের সবকসমূহ আদায় করার জন্য আপনার কাছে বায়আত হয়েছি।

আমি বললাম, দূতের কাজতো ডাক পৌঁছিয়ে দেওয়া। আমি তো আপনার জুতার উপর বসারও যোগ্য নই। কথা শুনে ইশাবাবা কাঁদতে লাগলেন। অবস্থা প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত সবাই প্রভাবান্বিত হয়।

আমীরে শুকুরের সাথে মুলাকাত

রেওগর থেকে মুহিব্বুল্লাহ আমাদেরকে এক নওয়াবের বাসায় নিয়ে গেল, যিনি আমাদেরকে রাতের খাবারের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং স্থানীয় আলেম ও বুযুর্গ লোকদেরকেও দাওয়াত করেছিলেন। খাবারের প্রতি আমার এতটুকু চাহিদা ছিল না যতটুকু আগ্রহ ছিল যে, আজ ওলামা মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। সেখানে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। অতঃপর ওঠে আসরের নামায আদায় করি। আসরের নামাযের পর আমি মাশায়েখদের কথা শোনাচ্ছি, ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি দফ নিয়ে আগমন করল এবং পাঠ করতে লাগল–

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ
کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کاچارہ

সে সময় আমার মনে হল যে, এসব লোক আল্লামা ইকবালের কথার প্রেমিক। গজল শেষ হতেই আমীরে শুকুর আমার দিকে তাকিয়ে পাঠ করলেন–

غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا
ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا

আমি বললাম! আমীরে শুকুর, আজ পর্যন্ত আপনি বাইরের গজলের প্রতি আসক্ত হয়ে আছেন। আসুন! আজ আমি আপনার তার ছিড়ে দেই, যেন ভিতরের আওয়াজ শুনতে পান। এ কথা বলে আমি তার লতীফায়ে কালবের উপর হাত

রাখলাম। তখন আমীরে শুকুরের জযবা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তিনি উচ্চ আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ বলতে শুরু করলেন, বাসার মহিলারা আওয়াজ শুনে বাইরে বের হয়ে এল। বাচ্চারা খেলাধুলা ছেড়ে তামাশা দেখতে কাছে এসে গেল। আমীরে শুকুর পাগল হয়ে আল্লাহ আল্লাহ বলতে লাগল। যখন কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল, তখন আমার পা জড়িয়ে ধরে বললেন আপনার বিরাট অনুগ্রহ আজ আমাকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিলেন।

পাশেই বসা এক আলেম একটি শে'র পড়লেন

جَزَاكَ اللّٰهُ که چشمم باز کردی
مرا یا جان جاں همراز کردی

আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আজ আপনি আমার চোখের পর্দা উম্মোচন করে আমার মাহবুবে হাকীকীর আশেক (প্রেমিক) বানিয়ে দিয়েছেন।

স্থানীয় উলামায়ে কেরাম আমীরে শুকুরের অবস্থা দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। রাতের খাবার শেষে মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে বায়আত করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! বহুত শাক্কার মিলা (প্রচুর মিষ্টি মিলেছে)। হযরত মুর্শিদে আলমের কাছে যখন কোন মাহফিলে অধিক লোকজন বায়আত হতো তখন হযরত স্বভাবসুলভ মুচকি হেসে বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ আজ খুব শাক্কার মিলা (আজ খুব মিষ্টি মিলেছে)।

মাকামাতে ফাযলিয়াতে লিখিত আছে যে, হযরত কুরাইশী রহ. একবার অনেক লোককে তওবা করিয়ে মুরিদ করেছিলেন। রাতে স্বপ্নে শয়তানকে দেখেন, সে বলছে, আপনি আমার মেহনতের উপর পানি ঢেলে দিয়েছেন। হযরত স্বপ্নেই শয়তানকে উত্তর দিলেন যে, আগামীতে আরও বেশি লোককে আল্লাহ আল্লাহ শেখাব এবং তোর থেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাব।

শেষ রাতের বাদশাহী

২৪ শে জুন তাহাজ্জুদের নফল নামায আদায় করেই দু'টি গাড়ীতে করে তিরমিয শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। পথিমধ্যে সঞ্জর সাম্রাজ্যের সম্রাটের মহল দেখা গেল। ইসালে সওয়াবের সময় আমার একটি ইতিহাস স্মরণ হয়।

নিমরোজ অঞ্চলে এক বুযুর্গ আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকতেন এবং তার মুরীদদেরকে আল্লাহ আল্লাহ শিক্ষা দিতেন। এমনকি তার দরবারে প্রতি মুহূর্তে দু'তিনশ সালেনীক উপস্থিত থাকেন। ফলে আল্লাহ ওয়ালাদের পদচারণাতেই এলাকা সরগরম হয়ে ওঠে।

যখন সঞ্জরের সম্রাট এই অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন তিনি বিশ্বাস ও ভক্তির বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে তার নিমরোজ অঞ্চল এই বুযুর্গকে দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে তাকে তার মেহমানদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বেগ পেতে না হয়। অতঃপর তিনি তার দূতকে একটি চিরকুট লিখে হযরতের দরবারে পাঠিয়ে দেন যে, আমি আজ থেকে নিমরোজ অঞ্চলের বাদশাহী আপনাকে দান করে দিলাম।

হযরত এই চিরকুট পাঠ করে অপর পৃষ্ঠায় দুটি কথা লিখে দেন (১) আমার ভাগ্য অমাবশ্যার রাতের ন্যায় কালো হয়ে যাক, যদি আমি আপনার আবেদন কবুল করি।

(২) যখন থেকে আমার শেষ রাত্রির বাদশাহী নসীব হয়েছে তখন থেকে নিমরোজের বাদশাহী মশার ডানার সমতুল্যও নয়। মাওলানা রূমী রহ. এই ঘটনার দিকে নিচের কবিতা দিয়ে ইশারা করেছেন–

چون چتر سنخری رخ بختم سیاه باد

در دل اگر بود هوس ملك سنجرم

زانگه به گه یافتم خبرا از ملك نیم شب

من ملك نیم روز بیك جو نمی خرم

আমার চেহারা সঞ্জর সম্রাটের ছাতার ন্যায় কালো হয়ে যাক, যদি আমার অন্তরে নিমরোজের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

যখন থেকে আমার শেষ রাত্রির তথা তাহাজ্জুদের সময়ের বাদশাহী নসীব হয়েছে তখন থেকে নিমরোজের বাদশাহী একটি গমের সমতূল্য মূল্যও মনে হয় না।

আমি সঞ্জর সম্রাটের কবর দেখে উপদেশ গ্রহণ করি যে, জমিনের উপর রাজ্য পরিচালনাকারী আজ মাটির নিচে শুয়ে আছেন। গভীর চিন্তা নিমগ্ন ছিলাম। মহিব্বুল্লাহ কাছে এসে বললেন, হযরত! এখনো সফর অনেক বাকী আছে। এখান থেকে রওয়ানা দেওয়া উচিৎ।

ট্যাংকের সমাধি

দিনের দশটায় আমরা আমু দরিয়ার তীরে অবস্থিত তিরমিয শহরে পৌঁছি। যাকে আফগানিস্তানের প্রবেশদ্বার বলা হয়। আফগান যুদ্ধে রাশিয়ার সৈনিকদের অভিযান পরিচালনা ও যাতায়াতের কেন্দ্র ছিল। রাস্তার উভয়পাশে হাজার হাজার ট্যাংক ও সাজোয়া বাহিনীর গাড়ী সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মহিব্বুল্লাহ বললেন, এসব গাড়ী নষ্ট হয়েছে গেছে।

আফগান যুদ্ধে রাশিয়ার অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। আমি এতগুলো ট্যাংকের সমাধি দেখে ভাবছি, আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন–

كَمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

(কত কত ছোট দল বড় বড় দলের উপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।)

বাস্তব সত্য হল, আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন তখন চড়ুই পাখি দিয়ে বাজপাখিকে শায়েস্তা করেন।

হাকীম তিরমিযি রহ.-এর মাজার

হাকীম তিরমিযি রহ. তার সমকালীন বড় বড় আলেম ও বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মাজার আমু দরিয়ার তীরে অবস্থিত। দরিয়ার অপর তীরে আফগনিস্থানের প্রসিদ্ধ শহর মাজারই শরীফ অবস্থিত। হাকীম তিরমিযি রহ. ছাত্র অবস্থায় কয়েকজন উস্তাদ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন।

অতঃপর চিকিৎসা বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। খানকার মুতাওয়াল্লী আমাকে হাকীম সাহেবের চিকিৎসালয় দেখালেন।

দেখালেন যেখানে হাকীম সাহেব তার কতক রুগীকে রাখতেন। মনে হচ্ছিল যেন ভূগর্ভস্থ হাসপাতাল। আল্লাহ তাআলা তাকে দৈহিক চিকিৎসকের সাথে সাথে আত্মার তথা রূহানী চিকিৎসকও বানিয়েছিলেন। হাজার হাজার লোক তার কাছে এসে অন্তরের মর্মজ্বালার ঔষধ নিয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা তাকে যথেষ্ট দৈহিক সৌন্দর্যও দান করেছিলেন। তার যৌবনকালের একটি ঘটনা–

একবার এক যুবতী মেয়ে তার কাছে এল এবং বলল, আমি আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছি। মুলাকাত করতে এসেছি। শুধুই আমি আর আপনি। আর কেউ নেই। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য পূরণ করুন। একথা শুনে তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয়.বিজয়ী হল। ফলে তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। যুবতী অবস্থা দৃষ্টে লজ্জিত হল এবং চলে গেল। কিছুদিন পর তিনি এই ঘটনা ভুলে যান।

বৃদ্ধ অবস্থায় একবার অযু করছিলেন। হঠাৎ যুবতীর ঘটনা তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল। কল্পনা করলেন যে, আমি তো ইচ্ছা করলে এই যুবতীর ইচ্ছা পূরণ করতে পারতাম এবং পরবর্তীতে গোনাহ থেকে তওবা করলেই হত। এই কুমন্ত্রণা অন্তরে বার বার উদয় হচ্ছিল। হাজার চেষ্টা করেও তা সরাতে পারছেন না। তাই তিনি আল্লাহর দররারে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে

লাগলেন। এ অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে যান। ঘুমের সাথে স্বপ্নে হুজুর সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাকীম তিরমিযী! তুমি এত চিন্তিত কেন? কী হয়েছে তোমার? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যৌবনকালে আল্লাহ তাআলার ভয়-ভীতি অন্তরে ছিল। গোনাহ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গোনাহর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। অথচ এখন বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মনের মধ্যে গোনাহ করার আগ্রহ বিদ্যমান রয়েছে। অন্তর বলছে, তোমার সেই সময় গোনাহ করা উচিৎ ছিল। সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হয়নি। আফসোস! আমি আমার চুল সাদা করে বসেছি। কিন্তু অন্তর কলুষিত করছি। হুজুর সা. বললেন! মূলত তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন আমার যামানার কাছাকাছি সময় ছিল। সে কারণেই তখন কল্যাণ বেশি ছিল। এখন তুমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছ তাই কল্যাণ কমে গিয়েছে। চারপাশের নূরানিয়ত কমে যাওয়ার ফলে তোমার কল্পনা গোনাহর দিকে চলে গিয়েছে। তোমার ক্রন্দন ও আফসোস আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। চোখ মেলে হাকীম তিরমিযী রহ. তার অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করেন।

ইমাম তিরমিযি রহ.-এর মাজারে

তিরমিযি শহর যেহেতু সৈনিকদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ছিল সেজন্য বহিরাষ্ট্রের পর্যটকদের জন্য শহরে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া দুঃসাধ্য। আলহামদুলিল্লাহ! আমি অত্যন্ত আরামের সাথে তিরমিযী শহরের আশপাশে ঘুরে দেখি। তিরমিযি শহর থেকে রওয়ানা করে আমরা শেরআবাদের কবরস্থানে পৌছি। এখানে আবু ঈসা বিন মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযি রহ. এর মাজার রয়েছে।

নকশবন্দীয়া নিসবতের বরকত

গাড়ীতে চড়ে মাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তার এক পাশে চল্লিশজন লোক বসেছিল। তাদের এক লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, খাবার প্রস্তুত। অনুগ্রহ করে আপনারা আসুন।

আমি বললাম, আমরা তো ইসালে সওয়াবের নিয়তে উপস্থিত হয়েছি, তাই সেখানে আগে হাজিরা দিয়ে নেই। সে বলল, ঠিক আছে। আমরা সর্বপ্রথম মসজিদে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করি। অতঃপর মাজারে উপস্থিত হয়ে কুরআন পাকের তেলাওয়াত, মুরাকাবা ও খুব দু'আ করি। এই আমলগুলো করতে প্রায় দু'ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। বাজার থেকে ফিরে যাওয়ার সময় রাস্তায় সেই লোক আবার দৌড়ে এল এবং বলল, খাবার প্রস্তুত। আপনারা তাশরীফ এনে খাবার খেয়ে নিন। আমি বললাম, আমাদের কাছে খাবার রয়েছে। ওলামায়ে কেরামের

জামাআত সাথে রয়েছে। যখন ক্ষুধা অনুভব হবে, তখন খেয়ে নিব। সে খাবার খেতে পীড়াপীড়ি করল। তার পীড়াপীড়ি দেখে মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত! এরা জাকেরীনদের দল। তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবেন না। এরপর আমরা সবাই তাদের কাছে যাই। সাক্ষাতে তাদের নূরানী চেহারা, সুন্নতের অনুসরণ এবং তাকওয়ার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে মন আনন্দে ভরে গেল।

তাদের কাছে বসার পর জামাআতের আমীর সাহেব বললেন, হযরত! কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি জনৈক বুযুর্গ বলছেন যে, অমুক দিন ইমাম তিরমিযি রহ. এর মাজারে সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার এক শায়খ আগমন করবেন। যদি তুমি ফয়েজ ও বরকত অর্জন করতে চাও, তাহলে এই শায়খ থেকে অর্জন করে নিও। আমি এই স্বপ্ন আমার সাথীদেরকে শোনালে তারাও মুলাকাত করতে আগ্রহী হল। প্রায় দুইশ মাইল সফর করে প্রত্যুষে এখানে এসে পৌঁছি। দস্তরখানা বিছিয়ে সকাল থেকে অপেক্ষায় আছি। আপনাদের আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন। আপনি আমাদের উপর ইহসান করুন এবং আমাদেরকে বায়আত করুন এবং আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করে ধন্য করুন।

মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আমি খুতবা পাঠ করে তাদেরকে বায়আত করি। তাদের লতীফাগুলো তাজা করতে গিয়ে সবার লতীফা তাজা পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! এরূপ আল্লাহওয়ালা ও জাকেরীনদের জামাত হয়ত এই দেখেছি। সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীয়ার সম্পর্ক কি এক আশ্চর্য নিয়ামত! এর বরকতেই আমরা অতিরিক্ত উপকার লাভ করি।

এখান থেকে সন্ধ্যা ছয়টা রওয়ানা হয়ে রাত এগারটায় নূ শহরে পৌছে অতঃপর আমরা গভীর নিদ্রায় কখন অচেতন হয়ে যাই তা টেরই পাই নি।

এখনও ধরাপৃষ্ঠে কিছু লোক রয়েছেন

২২ জুন বৃহস্পতিবার আমরা এমন একটি জনপদে পৌঁছি, যা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। যোহরের নামাযের পর বয়ান হয়। মসজিদে লোকজন ভরপুর ছিল। সবাই সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হয়। সহকারী ইমাম মোল্লা আহমদ অত্যন্ত পরহেযগার ও আদর্শবান ব্যক্তি। তিনি বলেন, হযরত! এই জনপদে একজন লোকও বেনামাযী নেই এবং দশ বছরেরও অধিককাল থেকে এখানকার নারী-পুরুষ এমনভাবে আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলে, যেন আরবী তাদের মাতৃভাষা। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে এখনও কি ধরাপৃষ্ঠে এ ধরনের লোক বসবাস করে! সুবহানাল্লাহ!

জমজম বাবা

রাতে এলাকার সদরের বাসায় দাওয়াত ছিল। কিছুক্ষণ বয়ানের পর বায়আত ও মুরাকাবার মাহফিল হল। বাসার মালিকের পিতা হজ্জ সংক্রান্ত দুটি চমকপ্রদ ঘটনা শোনালেন।

(১) যখন আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি, তখন এক লোক তার মালামালের সাথে পানাহারের কিছু দ্রব্য রাখল। রাশিয়ায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয়, এমনকি মধুও জমে যায়। তাই সে প্লাস্টিকের প্যাকেটে মধু নিয়ে মালামালের সাথে রাখল। অতঃপর যখন সৌদি আরবে পৌছল সেখানে তো পুরো বছরই গরম থাকে। তাই মধু তরল হয়ে গেল। যখন কাস্টমসে চেক করার জন্য মাল খোলা হল তখন চারপাশে শুধু মধু আর মধু। সমস্ত মালামাল মধুতে ভিজে যায়। কাস্টমস অফিসার জিজ্ঞাসা করল (مَا هٰذَا) এগুলো কী? উত্তরে সে বলল (هذا عسل مصفى) এগুলো খাঁটি মধু। তার কথা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে লুটোপুটি খেল।

(২) তার ব্যক্তিগত একটি ঘটনা শোনাল। সে বলল, যখন আমরা হজ্জ থেকে ফিরে আসি, তখন আমি জমজমের পানি দিয়ে দুটি গ্যালন ভর্তি করি। জিদ্দা বিমানবন্দরে পৌছে যখন মালামাল প্যাকেট করতে দেই তখন কর্তৃপক্ষ দু'গ্যালন পানি আনতে নিষেধ করল। তারা বলল, শুধু এক গ্যালন নিতে পারেন। আমি তাদেরকে অনুনয় বিনয় করলাম। কিন্তু তারা কেউ আমার আবেদনের প্রতি কর্ণপাত করেনি। যখন বিমান রওয়ানা হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল, তখন আমি বললাম, আমরা রাশিয়া থেকে এসেছি, সেখানে এক ফোটা জমজম পানি পান করাতে মানুষ ছুটে আসে। আমাকে দ্বিতীয় গ্যালন নেওয়ার অনুমতি দিন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুমতি দেয়নি।

অতঃপর যখন দেখলাম, কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। তখন আমি বললাম, শেষবারের মত আমাকে বলে দিন যে, জমজম পানির গ্যালন দুটো নেওয়ার অনুমতি দিবেন কি না?

তারা অস্বীকার করল। তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে গ্যালনের ঢাকনা খুলে সব পানি আমার মাথায় ঢেলে দিলাম এবং সবার সম্মুখে কাপড়সহ একেবারে গোসল করে ফেললাম। আরবী লোকজন আমার পাগলামী প্রত্যক্ষ করে পেরেশান হয়ে গেল। ভিজা কাপড় নিয়ে পুরা সফর করলাম।

আমি এই ঘটনা শ্রবণ করে তাকে বললাম, ঠিক আছে। এখন থেকে আমি আপনাকে জমজম বাবা বলে সম্বোধন করব। তিনি এ উপাধিকে এত পছন্দ করলেন যে, সেদিন থেকে তিনি জমজম বাবা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

কবিতা ও সাহিত্য সভা

আমীরে শুকুর-এর কিছু কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু বান্ধব ছিল। তারা যখন জানল যে, আমীরে শুকুর এক সাধারণ ফকীরের সামনে নতজানু হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে তখন তারা খুব বিষ্ময়বোধ করল। তারা আমীর সাহেবকে বলল যে, আপনার হযরতকে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করান। যেহেতু পরের দিনের খাবারের দাওয়াত আমীর সাহেবের বাসায় ছিল, তাই তাদেরকে সেই পার্টিতে দাওয়াত করা হল। খাবার শেষে কবি ও সাহিত্যিকরা তাদের আলোচনা শুরু করল। ফার্সী ভাষায় এত সুন্দর ও অর্থবহ কবিতা শোনাল যে, আমি তা শুনে হতভম্ভ হয়ে যাই। যখন তারা তাদের আলোচনা শেষ করল, তখন আমীর সাহেব বললেন, হযরত আপনি কিছু শোনান।

তখন আমি ইশক ও মারেফত সম্পর্কিত কিছু ফার্সী কবিতা, যা মুরব্বীদের কাছে শুনেছিলাম সেগুলো পাঠ করলাম। কবিতা হবে প্রায় ত্রিশটি। কবিতাগুলো শুনে তারা এত প্রভাবিত হলো যে, তা লিখে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ফলে তারা আবেদন করতে বাধ্য হল যে, হযরত আমাদেরকে বায়আত করে অনুগ্রহ করুন। আল্লাহর শোকর আমি তাদের সবাইকে বায়আত করে সিলাসিলায়ে আলীয়ার অন্তর্ভুক্ত করি। হযরত খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দিকী রহ. তার শায়খ সম্পর্কে বলতেন, শায়খ যখন ওয়াজ ও নসীহত করেন তখন এর দৃষ্টান্ত ডুগডুগি বাজানোর ন্যায়। আর যখন মুরাকাবা করান তখন প্রদর্শনীর ন্যায় মনে হয়। বানর বা সাপের খেলা প্রদর্শনকারী যখন প্রদর্শনী দেখায় তখন লোকজন তা প্রত্যক্ষ করে যেমন আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি হযরত শায়েখের মুরাকাবা ও বয়ানের দ্বারা সালেকীনদের অন্তর আনন্দ উপভোগ করে। এই কথা ভাবতেই আমি চিন্তা করলাম বাহ আজ তো ফার্সী ভাষায় ডুগডুগী বাজানো হল। যদি একথা কবুল হয়ে যায়, তাহলে তো বড় ইজ্জত ও সম্মানের কথা।

হযরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার রহ.

হযরত খাজা রহ. ছিলেন হিসার উপত্যকার এক বড় শায়খ। তিনি হযরত নকশবন্দ রহ.-এর জামাতা ও হযরত খাজা ইয়াকুব চারখী রহ.-এর পীর ও মুর্শিদ ছিলেন। তৎকালীন বড় বড় ওলামা মাশায়েখ তার মুরীদ ছিলেন।

হযরত আব্দুল কাদের জুরজানী রহ. তার মুরীদ ছিলেন। তিনি তার সম্পর্কে লিখেন–

وَاللّٰهِ، مَا عَرَفْتُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى مَا لَمْ اَصِلْ فِى خِدْمَتِ الْعَطَّارِ

আল্লাহর কসম! হযরত আত্তার রহ. এর দরবারে না যেতাম, তাহলে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারতাম না।

তাঁর মাজারে ইসালে সওয়াব করার পর মুহিব্বুল্লাহ আমাকে এক স্থানে নিয়ে গেলেন, যেখানে বসে তিনি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতেন।

পাথরে পদচিহ্ন

এ স্থানে অনেক বরকতময় বস্তু দেখার সৌভাগ্য হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বস্তু ছিল, একটি পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি নামায আদায় করতেন। এর মধ্যে হযরত খাজা সাহেব রহ. এর পা ও সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান। আমি এখানে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করি। বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল যে, আমাদের মাশায়েখগণ কত বেশী ইবাদত করতেন যে, পাথর পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে যেত। আজ তো আমাদের কাপড়ের জায়নামাযও ক্ষয় হয় না।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, যে ব্যক্তির জায়নামাযে বসতে কষ্ট হয়। মনে করবে তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত কম। মূলতঃ জায়নামাযে বসার সুযোগ হওয়া আল্লাহ তাআলার এক বিরাট বড় নিয়ামত।

সাধারণ নিয়ম হল, প্রথমত যিকিরে বসার অভ্যাস করা এমনকি যিকিরের জন্য দেহ নরম করে দেওয়া। যে সমস্ত সালেকীনরা তরীকতের পথে পা বাড়াবে, তাদের জন্য এক ঘন্টা দু'ঘন্টা মুরাকাবার আমল করা। কুরআন শরীফে রয়েছে –

ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

অতঃপর তাদের অন্তর ও চামড়া আল্লাহ তাআলার স্মরণে নরম হয়। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, (تلين جلود) চামড়া নরম হওয়া) প্রথম স্তর। অতঃপর (تلين قلوب) অন্তর নরম হওয়ার স্তর আসে। যে সালেক দৈনিক দশ পনের মিনিট মুরাকাবা করে না, সে ধারণা করে যে, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে সালেকীনগণ ইশক ও মহব্বতের দাবী করে ঠিকই, কিন্তু যিকির ও মুরাকাবায় কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারে না।

অনেকে তো বাহানা করে যে, অবসর পাওয়া যায় না। তার দৃষ্টান্ত হল যে মজনু বলে লাইলিকে স্মরণ করার সময় আমার নেই।

সর আসিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

২৬ জুন মুহিব্বুল্লাহর বাসায় সর আসিয়ার প্রসিদ্ধ মুফতী দামলা আহমদ জান তার সাথীবর্গসহ তাশরীফ আনেন এবং বায়আত হন। হাবীবুল্লাহ বললেন, তিনি খুব জনপ্রিয় আলেম এবং এলাকায় তার তাকওয়ার প্রভাব বিদ্যমান। আর চেহারা দেখেও তা অনুভূত হয়।

তিনি সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার সবকসমূহ অতিক্রম করেছেন। কিন্তু তার শায়খের ইন্তেকালের ফলে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

হাজার হাজার লোক তার দরসে অংশগ্রহণ করত। তিনি আমাকে কিছুদিনের জন্য সর আসিয়া যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। অতঃপর মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের পরামর্শে প্রোগ্রাম ঠিক করা হয়।

সর আসিয়া উজবেকিস্তানে অবস্থিত এবং সমরকন্দ দরীয়া প্রজাতন্ত্রের অংশ। এখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত দীনদার, আলেমদেরকে মূল্যায়ন করেন। তারা কমিউনিজমের সময় দীনের হেফাজত করেছে, যার চিহ্ন তাদের চেহারার নূর থেকে পরিলক্ষিত হয়। কয়েক ঘন্টা সফর করে আমরা লংগর এলাকায় পৌছি। এখানকার জামে মসজিদে দামলা আহমদ জান ছিলেন। নিকটেই বাচ্চাদের দীনী তালীমের মাদরাসাও রয়েছে। দামলা আহমদ জানের তিন ছেলে আলেম, মাদরাসার বাচ্চাদেরকে তালীম দেন।

দু'কন্যাও আলেমা এবং তাদেরকে আলেম ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরের দিন তার জামাতার বাড়ীতে দাওয়াত ছিল। তার বাড়ি পাহাড়ী অঞ্চলে। সবুজ ও শস্য-শ্যামল এলাকা। চারপাশে ফুল আর সবুজের সমারোহ। মনোমুগ্ধকর পরিবেশে। অত্যন্ত সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে। এক বালাখানা এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, এর পাদদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। পানির কল, কল শব্দ, চারপাশের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, ঠাণ্ডা ও মৃদু মন্দ বায়ু, পাখীদের মিষ্টি কলরব। জীবনে কোনদিন এত সুন্দর পরিবেশ দেখার সুযোগ হয়নি। আমি ভাবলাম, জান্নাতের বালাখানা কেমন হবে এবং এটা কেমন নিয়ামত, যা ঈমানদারদের চক্ষুকে শীতল করার জন্য আল্লাহ তাআলা তৈরী করে রেখেছেন।

আমি এখানে দামলা আহমদ জানকে মাশারাবাতের সবকসমূহ পরিপূর্ণ করালাম। মুরাকাবায়ে মাইয়েত-এর নিয়ম পূর্বে থেকেই তার জানা ছিল।

দিনভর মুরাকাবা করেও করানোর ফলে আমার উপর মহব্বতে ইলাহীর বিরাট প্রভাব পড়েছিল।

মাওলানা আহমদ জানকে খেলাফত প্রদান

আসরের নামাযের পর পার্শ্ববর্তী এক মসজিদে যিকরে ক্বালবী সম্পর্কে বয়ান করি এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ অনুবাদ করেন। মাহফিল শেষে মাওলানা দামলা আহমদ জানকে খেলাফত প্রদান করি। গোটা মাহফিলে এক আশ্চর্য অবস্থা বিরাজ করছিল। লোকজন এমনভাবে কান্না জুড়ে দিল যে, কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। মাওলানা আব্দুল্লাহ কাঁদছিলেন। আমার মধ্যেও এক আশ্চর্য অবস্থা সৃষ্টি হল।

মাহফিল শেষে দু'আর সময় লোকজন গলাকাটা মোরগের ন্যায় ছটফট করছিল। দু'আ শেষে লোকজন দামলা আহমদ জানের সাথে মুয়ানাকা করতে লাগল এবং তাকে মোবারকবাদ দিতে লাগল।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দামলা আহমদ জান আমার জুতা উঠিয়ে প্রথমে বুকে লাগালেন, পরে তার দু'গালে জুতা মারতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। লোকজন চিৎকার জুড়ে দিল।

রুবল বৃষ্টি

মসজিদ থেকে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করার সময় লোকজন আমাদের সাথে ছিল। আমি যেই মাত্র বাড়ীর গেটের সামনে পৌঁছি তখন মাথার উপর রুবলের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বাড়ীর মহিলাদের পূর্বেই আমার আগমনের সংবাদ জানা ছিল, তাই তারা ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশার্থে এভাবে অভ্যর্থনা জানাল। আমি আল্লাহ তায়ালার শোকর জ্ঞাপন করলাম, যিনি পাথর বর্ষানোর পরিবর্তে কাগজের নোট বর্ষণ করেছেন।

হযরত খাজা বায়েজিদ বোস্তামী রহ. সম্পর্কে কিতাবে লিখিত আছে যে, একবার তার নতুন পোশাক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জুমআর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘরের ছাদ থেকে এক মহিলা রাস্তায় ছাই নিক্ষেপ করল। সমস্ত ছাই তার মাথায় পড়ল, সাথী সঙ্গীরা পেরেশান হয়ে গেল। হযরত খাজা সাহেব আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন। একজন জিজ্ঞাসা করল, হযরত! এই অবস্থায় আপনি শুকরিয়া আদায় করছেন কেন? তিনি বললেন যে, আমার মাথায় তো আংরা নিক্ষেপ করার কথা। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া যে, ব্যাপারটা শুধু ছাই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রইল।

তোরাগ্রামের মসজিদ

পরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত লোকজন হযরত দামলা আহমদ জানকে মোবারকবাদ দেওয়ার জন্য আসতে লাগল। এত ভীড় হল, যেন লোকজন ঈদের নামায আদায় করে বাড়ীর দিক ফিরছে। প্রত্যেকের চেহারায় খুশী ও আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

নিসবত অর্জন করতে পেরে সমরকন্দ দবিয়ার অধিবাসীরা যে ধরণের আনন্দ প্রকাশ করল তা সত্যিই বর্ণনানীত। বাস্তব সত্য কথা হল, ফুলের কদর শকুনের কাছে কী হতে পারে, যে মরা খায়, বরং ফুলের কদর রয়েছে বুলবুলের কাছে, যার মস্তিষ্ক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

যোহরের নামায তোরাগ্রাম মসজিদে আদায় করার জন্য গাড়ীর এক বহর নিয়ে রাওয়ানা হয়। আমি বললাম, মাওলানা আব্দুল্লাহ! গাড়ীর বহর দেখে মনে হচ্ছে কোন বরযাত্রীর কাফেলা যাচ্ছে। মাওলানা খুব চিৎকার করে জওয়াব দিল বর– তো আপনিই। আমি বললাম, শুকরিয়া! কোন মানুষের বাড়ীর দিকে নয় বরং মহান আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছি। উপস্থিত সবাই এই জওয়াব শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হল।

চিত্তাকর্ষক স্বপ্নের চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা

তোরাগ্রাম মসজিদে যোহরের নামায আদায় করি। মসজিদে স্থানীয় ওলামা মাশায়েখ ও বুযুর্গানেদীন উপস্থিত হলেন। আমি তাকওয়া সম্পর্কে বয়ান শুরু করি। বয়ান চলছিল ইতোমধ্যে এক বৃদ্ধ মসজিদে আগমন করল এবং আমাকে দেখেই এমনভাবে কান্না শুরু করল যে, লোকজন বয়ান শোনা ছেড়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেল। এক যুবক তাকে নেওয়ার জন্য সামনে আসল। আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম, হে আল্লাহ! এ কী অবস্থা? মাওলানা আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, তিনি এই অঞ্চলের এক শায়খ। হাজার হাজার লোক তার মুরীদ। যখন এই বুযুর্গ আরও কাছে এলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে সজোরে কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি তাশরিফ রাখুন। তিনি বললেন, হযরত অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দিন। আমি উপস্থিত সকলকে একটি কথা বলব। আমি অনুমতি দিলাম।

তিনি বললেন, কিছুদিন পূর্বে আমার স্ত্রী স্বপ্ন দেখেন, তাকে এক লোক বলছে যে, অমুক দিন যোহরের নামাযের সময় তোরাগ্রাম মসজিদে তোমার স্বামীর রাসূল সা. এর সুন্নাতের অনুসারী কোন ব্যক্তির সাথে আমার মুলাকাত হবে। স্বপ্ন অনুযায়ী আজ আমি এ মসজিদে এসে এই মেহমান শায়খকে বয়ান করতে দেখলাম। সুতরাং আমার দরখাস্ত হল যে, সর্বপ্রথম আমাকে বায়আত করে আপনার গোলামদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এরপর ওয়াজ শুরু করুন। একথা বলে তিনি পুনরায় কাঁদতে লাগলেন। দামলা আহমাদ জান উঠে দাঁড়ালেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী! সম্মানিত এই মেহমানের কদর করুন এবং প্রবাহিত নদীতে আপনাদের হাত ধুয়ে নিন।

এরপর মুহিব্বুল্লাহও কাঁদতে কাঁদতে তার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলেন, কীভাবে তিন ব্যক্তির সংবাদ পেয়েছিলেন এবং সেই দিনেই তিনজন মেহমান আগমন করেছিল। এ সব কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সবাই আনন্দে ও আগ্রহে মেতে উঠল এবং বলল, হযরত! বায়আত করা আরম্ভ করুন। সুতরাং আমি বায়আত করার জন্য কাপড় বিছিয়ে দেই। আলহামদুলিল্লাহ! কয়েকজন আলেম বায়আত হলেন। পনেরজন এমন মাশায়েখ বায়আত হলেন, যারা পূর্ব থেকেই সিলাসিলায়ে আলীয়ার কোন বুযুর্গ থেকে খিলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। সাধারণ লোক আমাকে দেখে আনন্দ করছিল এবং সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! বলছিল। হযরত আহমদজান বললেন, হযরত আমাদের অঞ্চলে আপনার ন্যায় এত জনপ্রিয়তা কেউ অর্জন করতে পারেনি, যা আল্লাহ পাক আপানাকে দান করেছেন।

আমি বললাম, মাওলানা আমাদের প্রকৃত গ্রহণযোগ্যতা তো তখন যখন আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যাবে।

বর্ণিত আছে যে, এক যুবতীকে বিবাহ দেওয়ার জন্য বধু হিসেবে সাজানো হয়েছিল। যখন তার বান্ধবী তাকে অলংকার পরিধান করিয়ে এবং মেকাপ করিয়ে প্রস্তুত করল তখন তার এক বান্ধবী বলল, মাশাআল্লাহ! তোমাকে কতই না সুন্দর লাগছে। দ্বিতীয় বান্ধবীও তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করল।

একথা শুনে বধুর চোখে পানি এসে গেল। তা দেখে বান্ধবীরা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার! কাঁদছ কেন? বধু উত্তর দিল যে, তোমরা সবাই আমাকে সুন্দর বলছ, আমার অন্তরে এই কথা মনে হল যে, আল্লাহ করুন। আমাকে তার চোখে সুন্দর লাগুক, যার জন্য তোমরা আমাকে এত সুন্দর করে সাজিয়েছ। আল্লাহ না করুন। তার চোখে যদি সুন্দর না লাগে তাহলে তোমাদের চোখে সুন্দর লাগা না লাগা আমার কী আসে যায়? সুবহানাল্লাহ।

প্রশাসকের মেহমানদারী

মাহফিল শেষে প্রায় এক ঘন্টা মুসাফাহা করতে ব্যয় হয়ে গেল। ওলামা মাশায়েখগণ মুয়ানাকা করতে পীড়াপীড়ি করল। কেউ কেউ ফু নিতে লাগল। কেউবা আমার কাপড়ে হাত লাগাতে লাগল, কেউবা চেহারায় চুমো দিতে লাগল ইত্যাদি। এক বিরাট তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। মসজিদ থেকে বের হলে হযরত দামলা আহমদ জান বললেন, হযরত আজ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰه أَفْوَاجًا (তারা দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করবে) এর্র ব্যাপার হয়ে গেল। আমি বললাম ঃ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ) আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন। মাওলানা আমার এই জওয়াব শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, হযরত! আপনার স্থান কাল পাত্র বুঝে জওয়াব দেওয়াই আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে।

আমি বললাম, দু'আ করুন, যেন আল্লাহ তাআলা কবরের জওয়াব দেওয়াও সহজ করে দেন।

মাওলানা বললেন, এখন আমরা প্রশাসকের বাসায় যাব। স্থানীয় প্রায় ৭৫ জন ওলামা ও মাশায়েখকে দাওয়াত করা হয়েছে। অতঃপর প্রশাসকের দাওয়াত খাওয়ার জন্য তার বাসায় পৌছি। রাজকীয় ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। খাবার শেষে আমি নিয়ামতের শুকরিয়া সম্বন্ধে বয়ান করি। প্রশাসক বয়ান শুনে অনুতপ্ত হয়ে গেলেন। ফিরে আসার মুহূর্তে প্রশাসক বললেন, হযরত! আগামীকাল আপনি তাশখন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এয়ারপোর্টের রানওয়েতে আসব। আমি অনুমতি দেই এবং গভীর রাতে আমাদের অবস্থানস্থলে এসে পৌছি।

এই অনাড়ম্বরতা কার....!

৩০ শে জুন মঙ্গলবার সর আসিয়া থেকে তাশখন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার কথা। মুলাকাত করতে আগত সাথীদের এত ভীড় ছিল যে, আমি ক্লান্ত ও

পরিশ্রান্ত হয়ে যাই। অত্যন্ত কষ্টের সাথে ভীড় ঠেলে গাড়ীতে এসে বসি, যেভাবে কোন অসুস্থ ব্যক্তি বিছানার মধ্যে গা এলিয়ে দেয়। এয়ারপোর্ট পৌঁছে আমি মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে বহিরাগতদের টার্মিনালে অবস্থান করি। এক ঘন্টা একাকী ও নিশ্চুপ থেকে আল্লাহ তাআলার যিকির করার অবকাশ পায়। আমি দীর্ঘক্ষণ চোখ বন্ধ করে ইস্তেগফার পড়ছিলাম। শুনেছি আমল করার পর যদি বেশি বেশি ইস্তেগফার করা হয় তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে আমল কবুল হয়ে যায়। আমলের ত্রুটি বিচ্যুতি তিনি ক্ষমা করে দেন।

অতঃপর যখন বিমান রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা হল, তখন আমি দেখতে পেলাম মাওলানা আব্দুল্লাহর গাড়ি বিমান ইমারতের সন্নিকটেই দাঁড়ানো ছিল। প্রশাসককে তার ওয়াদা অনুযায়ী রানওয়েতে উপস্থিত দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই।

তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন– আমি চল্লিশজন লোকের জন্য রানওয়েতে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এসেছি তাদেরকে বলছি যে, আমার পীর ও মুর্শিদ সফর করছেন। তাই চল্লিশজন ওলামার এক জামাত বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য নতুন রানওয়েতে আগমন করেন।

আমি ও মাওলানা আহমদ জান এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সাথে রানওয়েতে সাক্ষাৎ করি। ইতিমধ্যে বিমানের যাত্রীরা আসতে লাগল। হযরত দামলা আহমদ জান সবাইকে বললেন, আজ এক শায়খে কামেল আমাদের এলাকা থেকে বিদায় নিচ্ছে। আপনারা ফায়দা অর্জন করুন এবং আপনাদের অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ নকশা করিয়ে নিন। দামলা আহমাদ জান যেহেতু এলাকার প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, সেহেতু লোকজন আমার কাছে ভীড়তে লাগল। আমি তাদের অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ নকশা করতে লাগলাম। আলহামদুলিল্লাহ! সফর যাত্রীদের অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ যিকির চালু করে দেই। যখন পুরুষরা ফারেগ হয় তখন এক বিমানবালা সামনে এগিয়ে এল এবং আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রথমত আমি ধারণা করি যে, হয়ত বোর্ডিং নেওয়ার জন্য এসেছে। যখন বোর্ডিং পাস দিলাম তখন সে বলল, আমার বুকে এভাবে আঙ্গুল রাখুন যেভাবে পুরুষের বুকে আঙ্গুল রেখেছেন। তার কথা শুনে আমি হতবিহ্বল হয়ে যাই। হযরত দামলা আহমদ জানকে বলি যে, আপনি তাকে বুঝিয়ে দিন যে, আমি গায়রে মাহরাম মহিলার শরীর স্পর্শ করি না। সে বলল, কেন স্পর্শ করেন না। আমি বলি যে, আমাদের শরীয়তে অনুমোদন দেয়া হয়নি। সে বলল, আমি নিজে আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি, একথা বলে আমার কাছে এসে গেল। আমি ভয়ে ছামলা আহমদ জানের কাছে চলে যাই। ইতোমধ্যে এয়ারপোর্টের ইনচার্জ তার গাড়ীতে চড়ে আসল এবং আমার সাথে মুলাকাত করে বলল যে, হযরত! আপনার দু'আর নেওয়ার জন্য এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ! তার আগমনে বিমানবালা মহিলার ঝামেলা শেষ হয়ে যায়।

বাতাসের কাঁধে

যখন আমি সাথীদের সাথে মিলে বিমানে উঠি তখন অধিকাংশের চক্ষু অশ্রুসজল ছিল। অনুভব হচ্ছিল যেন, এক স্বপ্ন দেখছিলাম আর সবেমাত্র তা শেষ হয়ে গেল। তাশখন্দের কথা ভাবতেই আব্বাস খান ও দাদা খান নূরীর কথা স্মরণ হল। ইতোমধ্যে বিমান রানওয়েতে দৌড়াতে লাগল। আমি কালিমা শরীফ পাঠ করলাম এবং চক্ষু বন্ধ করে চিন্তায় ডুবে রইলাম। আধাঘন্টা পর মাওলানা আব্দুল্লাহ আমাকে বললেন, পাশের সিটের যাত্রী বায়আত হতে চাচ্ছে। আমি বললাম, তাশখন্দে অবতরণ করে বায়আত করে নিব। তিনি বললেন, তখন তো তাড়াহুড়া শুরু হয়ে যাবে। এখন অবসর আছেন। সুতরাং এখনই বায়আত করে নিন। আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন মুহূর্তে পিছনের সিটের এক যাত্রী মাওলানা আব্দুল্লাহকে উচ্চ স্বরে কী যেন বলল।

আমি বললাম, সে কি চায়? মাওলানা মুচকি হেসে বললেন, হযরত! তারা সবাই আপনার কাছে বায়আত হতে চায়, আমি বললাম, ঠিক আছে, মাওলানা পাগড়ী বিছিয়ে দিন। আলহামদুলিল্লাহ! রাস্তায় পাগড়ী বিছিয়ে দেওয়া হল এবং উভয় পাশের যাত্রীরা পাগড়ী ধরল। নিকটের যাত্রীরা দু'হাতে এবং দূরের যাত্রীরা এক হাতে ধরল। আমি খুতবা ও বায়আতের কালেমা পাঠ করি। সবাই উচ্চস্বরে বায়আতের কালেমা পাঠ করল। বিমান বালা দরজা খুলে পাইলটকে এ দৃশ্য দেখাল। পাইলট রাশিয়ান মনে হল। সে দৃশ্য দেখে হাসছিল।

আমি ভাবছিলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার মত সম্বলহীন এক ফকিরকে এই তাওফীক দান করেছ যে, বাতাসের উপরেও আমাদের বুযুর্গানে দীনের ফয়েজ ও বরকত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। তওবার কালেমাসমূহ পাঠ করে খুব স্বাদ অনুভব করছি। বায়আতের পর মাওলানা আব্দুল্লাহ্ উজবেকী ভাষায় আমল ও অজীফা সম্পর্কে বিস্তারিত বলে দিলেন। অতঃপর আমি মুরাকাবা করালাম।

বিমানবালার বিশ্বাস

বিমান অবতরণের সময় ঘনিয়ে এলে আবু উসমানের পার্শ্ববর্তী সিটের এক যাত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, তিনি কে? কোত্থেকে এসেছেন? কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? এ সকল লোকদের কী করাচ্ছেন? আবু উসমান জবাবে বললেন, তাদেরকে তিনি যিকির শেখাচ্ছেন। কিন্তু আপনি এত কিছু জিজ্ঞেস করছেন কেন? সে বলল যে, আমি সদরে ইসলাম কারীমুফ-এর বিশেষ লোক। এজন্য আমাকে সব কিছু বিস্তারিত জানতে হয়। আবু উসমান ভাবলেন, হয়ত সে গোয়েন্দা পুলিশ হবে। তাই তিনি কথা বাড়ানো সমীচীন মনে করেননি। অতঃপর যখন বিমান তাশখন্দ এয়ারপোর্টে অবতরণ করল তখন বিমানবালা বলল, সর্বপ্রথম আপনারা অবতরণ করুন। আমি নিচে নামতেই এক প্রটৌকল অফিসারকে দাঁড়ানো

পেলাম। আর সাথে লিমুজিন ক্যাপ ও ছয়জন পুলিশ অফিসার ছিল। তারা আমাকে বলল, আপনার ব্যাপারে বিমান থেকে আমাদের কাছে ফোন করা হয়েছে যে, এক ভি.আই.পি লোক আসছে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। আমরা আপনাকে অভ্যর্থনার সাথে ভিতরে নিয়ে যাব।

আমি গাড়ীতে উঠে দেখি সেভেন ষ্টার হোটেলের মত ঝিলমিল করছে। আমরা তিনজন যখন সিটে উঠে বসি, তখন গোয়েন্দা পুলিশও উঠতে লাগল। যখন প্রটৌকল অফিসার আবু উসমানকে জিজ্ঞাসা করল যে, সে কী আপনাদের সাথী? আবু উসমান না করলেন। তখন প্রটৌকল অফিসার তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিল। নামার সময় আবু উসমানকে জিজ্ঞাসা করল তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আবু উসমান হেসে বললেন, আমরা ইসলাম কারীমুফ এর মুলাকাত করতে যাচ্ছি।

প্রটৌকল অফিসারদের পোশাক এত সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল যে, তা সহজেই মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এয়ারপোর্টের ভি.আই.পি লাউঞ্জে নিয়ে আমাদের নামানো হল এবং বলা হল যে, আপনাদের জন্য চা তৈরী করা আছে, পান করে নিন। এক কামরার মেঝের উপর নাম না জানা অনেক কিছু সাজানো ছিল। আমরা একে অপরের মুখের দিক তাকিয়ে মুচকি হাসছিলাম– "কোথায় আমরা? কোথায় এই ফুলের সুবাস? মৃদুমন্দ হাওয়া তোমারই মেহেরবানী।"

চা পান করে আমরা লাউঞ্জের বাইরে চলে আসি এবং ট্যাক্সিতে বসে আমার সময়গুলোর কথা স্মরণ হচ্ছিল। বুযুর্গানে দীনের কাছ থেকে শুনেছি যে, নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া যদি কোথাও ইজ্জত সম্মান পাওয়া যায়, তাহলে সেটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে বুঝে নিবে। স্বীয় নফসকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, যে সত্তা এই ইজ্জত সম্মান দিয়েছেন, তিনি যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে বেইজ্জত করতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কাজাকিস্তান সফর

১ জুলাই আলমাতা যাওয়ার জন্য তাশখন্দ থেকে রওয়ানা করি। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের সিট কনফার্ম ছিল। কিন্তু আবু উসমান একদিন পরে আসার ফলে তার সিট কনফার্ম হয়নি।

যখন সিয়াহত হোটেল থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যেযাত্রা করি তখন জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! কোথায় যাবেন? নিয়ম অনুযায়ী তো স্বদেশী যাত্রীদের এক টার্মিনালে এবং বিদেশী যাত্রীদের অন্য টার্মিনালে যেতে হয়। যেহেতু ফ্লাইটের সময় ঘনিয়ে এল, তাই আমি বললাম, মাওলানা! আমরা সবাই বিদেশী টার্মিনালে যাব। তখন আমাদের সামনে দু'টি সমস্যা দাঁড়াল।

একে তো টার্মিনালের সমস্যা, দ্বিতীয়ত আবু উসমানের সিট কনফার্ম ছিল না। আমি দু'আ করছিলাম যেন আল্লাহ তা'আলা তার অনুগ্রহে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করে দেন।

আল্লাহর কুদরত

গাড়ী যখন এয়ারপোর্টের কাছে এসে থামল, তখন মাওলানা আব্দুল্লাহ দ্রুত নেমে গেল। আমি ধারণা করলাম মালামাল নামানোর জন্য নেমেছে। আমি ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে নিচে নেমে এসে মাওলানাকে দেখতে পাইনি। আবু উসমানকে জিজ্ঞেস করি, মাওলানা কোথায় ?

তিনি বললেন, মাওলানা দ্রুত দৌড়ে গিয়ে এ বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেছেন। ইতোমধ্যে মাওলানা এসে গেলেন এবং বললেন যে, সিকিউরিটি অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছি। একেতো আমি আপনার টার্মিনালে যেতে পারব না, দ্বিতীয়ত আবু উসমানের সিট কনফার্ম হয়নি। তাই সে আমাদের সাথে যেতে পারবে না। অতএব আপনি আজ চলে যান। আগামীকাল আমরা আপনার সাথে আলমাতায় এসে মিলিত হব। আমি খুব রাগ করলাম এবং শাসিয়ে বললাম যে, আপনি নিজে এমন করতে গেলেন কেন? আমাদের সাথে এসে দেখুন আমি কী করতে পারি?

মাওলানা চুপ থেকে আমার ধমক সহ্য করে নিলেন এবং বললেন, হযরত! আমাকে ক্ষমা করুন। আগামীতে এমন হবে না।

আমি বললাম! ঠিক আছে, আমার সাথে ভিতরে চলুন এবং আমি যেভাবে বলি সেভাবে কাজ করুন। আমরা মালামাল নিয়ে বিল্ডিংয়ের ভিতরে প্রবেশ করি।

সিকিউরিটি অফিসার আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, শুভ সকাল। সাথে সাথে আমাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিল। এভাবে এক সমস্যা কাটিয়ে উঠি। মালামাল বুকিং করার জন্য দ্বিতীয় কোন যাত্রী ছিল না। তাই আমরা অফিসার কাউন্টারে চলে যাই। এক মহিলা আমাদের টিকেট নিয়ে গেল এবং কাউন্টার চেক করল। আমি তিন মিটার দূরে দাঁড়িয়ে তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছি আর মাওলানা তার সাথে কথা বলছেন।

মহিলা বলল, বিদেশীদের জন্য এই টার্মিনাল। দেশী যাত্রীদের জন্য অন্য টার্মিনালে যেতে হবে। মাওলানা বললেন, তিনি আমাদের মেহমান আমি তার দোভাষী। তাই তার সাথে যাওয়া জরুরী। সে বলল, ঠিক আছে, আমি এখান থেকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সমস্যা দেখা দিল যখন টিকেট চেক করছিল। তখন আবু উসমানের সিট কনফার্ম হয়নি। সে বলল, আপনি যেতে পারবেন বটে, কিন্তু আবু উসমান যেতে পারবে না। আমি মাওলানাকে বললাম, আপনি তাকে বলুন, সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আমি তার জন্য দু'আ করব। মহিলা কিছুক্ষণ আমাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করল। অতঃপর টেলিফোনে এক অফিসারের সাথে সিটের ব্যাপারে আলোচনা করল। অপর প্রান্ত থেকে অফিসার বলল, এভাবে সিট কখনও দিবেন না। মহিলা বলল, স্যার আমার সামনে এমন এক ব্যক্তিত্ব দণ্ডায়মান, যাকে ফিরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অফিসার বলল, আমি আপনাকে সিট দিতে নিষেধ করছি। মহিলা বলল, স্যার! আমি আপনাকে শুধু অবগত করে রাখলাম যে, আমি সিট দিচ্ছি। একথা বলে সে আবু উসমানের টিকেটে সীল মেরে দিল। যখন সবাই বোর্ডিং পাস পেয়ে গেলেন, তখন আবু উসমানের চেহারায় আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত! এই তাওয়াজ্জুহ এক আশ্চর্য নিয়ামত। আমি তো হাজার বার এর দৃষ্টান্ত আমার চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছি।

আমরা বোর্ডিং পাস নিয়ে লাউঞ্জে ঢোকার সময় এক্সরে মেশিনে হাতের মালামালগুলো দিয়ে দিলাম। সামনে এগুতেই এক মহিলা আমাদের টিকেট চেক করতে লাগল, আবু উসমানের টিকেট দেখে সে বলল, তার তো টিকেট কনফার্ম নেই, সে কীভাবে যাবে? আমি পেরেশান হয় যে, এই নতুন বিপদ আমার কীভাবে এল? ইতোমধ্যে পাশের কামরা থেকে এক যুবক এসে বলল, কতক্ষণ যাবত তোমার অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি আস। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মহিলা বলল, এই যাত্রীর সীট কনফার্ম নেই, অথচ বোর্ডিং পাস কীভাবে পেয়ে গেল। যুবক বলল, যেতে দাও। এত বাড়াবাড়ি করা তোমার কী প্রয়োজন? একথা বলে তার হাত ধরে কামরায় নিয়ে গেল। আমরা আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। সুবহানাল্লাহ! যা দুঃসাধ্য ছিল তা তিনি অতি সহজ করে দিলেন।

বাস্তব সত্য কথা হল যে, আল্লাহ্ তাআলা যার উপকার করতে চান, গোটা দুনিয়াও তার ক্ষতি করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার অনিষ্ট বা ক্ষতি করতে না চান, গোটা দুনিয়া তার উপকার করতে পারে না।

নৈসর্গিক শহর আলমাতা

যখন আমরা বিমানে রওয়ানা হলাম তখন শূন্যে পৌঁছতেই নিচে বরফ আচ্ছাদিত পাহাড়ের টিলা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এক প্রান্তে পামীরের সুউচ্চ পাহাড়, যাকে দুনিয়ার ছাদ বলা হয়। অপরপ্রান্তে তাইন-শাইন পাহাড় শ্রেণী চীনের সীমান্তে দেয়ালের ন্যায় দণ্ডায়মান। পূর্ব দিকে সাইবেরিয়া এবং এক দিকে রাশিয়ার উলগ উপত্যকা এবং অপরদিকে কাস্পিয়ান উপসাগর। কাযযাক শব্দ উর্দূতে ডাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা হয়ত এই জন্যে যে, চেঙ্গিস খান কাযাকীদের সহযোগিতায় এমন সেনাবাহিনী তৈরি করেছিল, যারা দুনিয়াতে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল এবং রুশদেরকে কাইফ পর্যন্ত কোনঠাসা করে দিয়েছিল। কাযাক শব্দ উপজাতীদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এরা ক্ষেতখামার ও চাষাবাদ এবং পশু পালন করতে অধিক অভিজ্ঞ। শাহেরা রেশম-এর সফরকালীন সম্ভবত তাদের মুসাফিরদের সাথে মোকাবেলা হত। এ কারণেই কাযাক প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। কাযাকিস্তানের আয়তন গোটা ভারত উপমহাদেশের সমান প্রায়। এর ভূমিতে ফ্রান্স এর ন্যায় পাঁচটি রাষ্ট্র সংকুলান হবে। পুরো আয়তন প্রায় ২৭ লাখ বর্গ কিঃ মিঃ। কিন্তু এর অধিবাসী এক কোটি ত্রিশ লাখ মাত্র।

তাজাকিস্তান স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। যার কাছে ধ্বংসাত্মক পারমানবিক অস্ত্র রয়েছে। উপরন্তু মহাশূন্যে থেকে যান প্রেরণ করার জন্য রাশিয়া এখানে এমন এক স্টেশন তৈরী করেছিল যে, যা থেকে ১০০০ মহাকাশযান সফলভাবে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু দুনিয়ার কোন মানচিত্রে এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। প্রসিদ্ধ মহাশূন্য স্টেশন মীর এখান থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় লোকদের রিপোর্ট যখন রাশিয়া সীমিত অঞ্চলে আক্রমণ করার জন্য এটম বোমা তৈরী করেছিল, তখন কাযাকিস্তানের বালুকাময় বিশাল প্রান্তরে এর পরীক্ষা চালিয়েছিল। ধ্বংসাত্মক তেজস্ক্রিয়তা যখন ছড়িয়ে পড়ল, তখন গ্রাম ও জনপদ ধ্বংসের শিকার হল। হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করল। তখনকার সরকার দুনিয়ার কাউকে এই সংবাদ জানতে দেয়নি। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সন্তান-সন্ততি আজও বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যখন স্ট্যালিন নিজের রাষ্ট্র থেকে জার্মান ইয়াহুদীদেরকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল তখন তাদের অধিকাংশই কাযাকিস্তান এসে অধিবাসী হয়ে গিয়েছিল।

আমি মাওলানা আব্দুল্লাহর কাছে জানতে চাইলাম যে, আলমাত অথবা আলমা আতা অর্থ কি? তিনি বললেন এর তিনটি অর্থ অধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ এখানকার আপেল অত্যন্ত সুস্বাদু হয়, তাই বাবায়ে সেপ, (ফাদার অব আপল) বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ এখানকার ২৮ জন সৈনিক দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হিটলারের বাহিনীর আগ্রাসন প্রতিরোধ করেছিল, এদের স্মরণার্থে এখানকার এক বাগানে তাদের নাম লিখে রাখা হয়েছে। সেই হিসেবে আলমাতা অর্থ অনুগতশীল।

তৃতীয়তঃ এখনকার গ্রাম্য অঞ্চলের লোকজন এই অর্থ দিয়েছে, তারা যখন শহরে প্রবেশ করত, তখন চতুর্দিকে সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য তাদের দৃষ্টিগোচর হত। অর্থাৎ ফল ফুল, নতুন নতুন প্রাসাদ, প্রশস্ত সড়ক। তাই তারা এর নাম নৈসর্গিক শহর রেখেছে। আলমাতা শহরের অদূরেই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় স্পোর্টিং পাহাড়ী টিলা যেখানে খেলার আগ্রহীরা পুরো বছর আনাগোনা করে থাকে।

আলমাতা শহরের এক বাগানে এমন একটি আলীশান ভবন বিদ্যমান রয়েছে, যা কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে লোহার কোন পেরেক ব্যবহার করা হয়নি।

স্থানীয় লোকেরা ঘোড়া পালনে প্রসিদ্ধ, বরং ঘোড়া যবাহ করে গোশত খাওয়া এক সাধারণ নিয়ম। এ কথাবার্তা বলার মধ্যে বিমানবালা ঘোষণা করল যে, আমরা এখন আলমাআতা বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি।

আলমাতা জামে মসজিদ

আমরা সবাই ফযরের নামায এয়ারপোর্টে আদায় করি। ট্যাক্সিযোগে জামে মসজিদে পৌঁছি এবং শুয়ে যাই। যোহরের নামায আদায় করার পর মুফতিয়ে আযমের সাথে মুলাকাত হয়। বৃহস্পতিবার ছিল। লোকদের সাথে পৃথক পৃথক মুলাকাত চলছিল। মসজিদ যদিও যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল তদুপরি তুর্কী সরকারের সাথে বিরাট আলীশান ভবন নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার ভিত্তিপ্রস্তর আগামীকাল শুক্রবারে নির্ধারণ করা হচ্ছে।

মসজিদ সংলগ্ন এক আরবী মাদরাসা রয়েছে। যাতে ছাত্ররা অবস্থান করে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয় হল যে, ফজরে ও আসরের নামাযের সময় কোন ছাত্রকে নামায পড়তে ও পড়াতে দেখা যায় না।

আমি এই অবস্থা প্রতক্ষ্য করে খুবই পেরেশান হয়ে যায়। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জানতে পারি যে, এই অধঃপতনের মূল হোতা হল মুফতীয়ে আযম সাহেব। তাকে কমিউনিস্টদের দালাল মনে হল, যদিও সে আরবী ভাষা শিক্ষা করেছে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ঈমানদারী কার্যকলাপ করে ঠিকই, তবে পরোক্ষভাবে কুফুরী কার্যকলাপ সবই ঠিক আছে। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে আমার এই মন্তব্য

শোনালাম। তিনি শুনে বললেন, হযরত! আপনি খুব দ্রুত ও সহজেই আসল রহস্য উদঘাটিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

যখন সে মুফতীয়ে আযম হল, তখন সে সরকার প্রধানের সাথে মিলিত হয়ে একটি কনফারেন্স আহবান করল এবং স্থানীয় আলেম, মুফতী, ইমাম ও খতীব সাহেবদেরকে দাওয়াত দিল। সরকার প্রধান উপস্থিত সবাইকে মুফতী সাহেবের তাবেদারী করার কথা শুনাল। এরপর মুফতী সাহেব বয়ান করলেন। বয়ানের শেষপ্রান্তে এসে তাদের তাবেদারী করার অঙ্গীকার নিলেন এবং তাদেরকে বললেন, আমাকে তোমরা তাজেমী সেজদা কর। যারা সরকারকে ভয় পায়। তারা রুকুর ন্যায় ঝুঁকে গেল এবং যারা আহলে হক ছিলেন তারা তা করেননি। তাদের সেই সময়ই মসজিদ থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয় এবং তাদের স্থানে সরকারের প্রতিনিধি ও তাবেদার আলেমদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বর্তমানে পুরো দেশের ইমাম ও খতীবদের উপর মুফতিয়ে আযমের প্রভাব এবং মুফতিয়ে আযমের অন্তরে সরকার প্রধানের প্রভাব বিরাজ করছে। মুফতী সাহেব জুমআর খুতবা দেন এবং বাকী সবকিছু সহকারী মুফতী সাহেব করেন তাদের নামায তো লোক দেখানো নামায বৈকি? একথা শুনে আমার খুব আক্ষেপ হল এবং মুফতী সাহেবের মুলাকাত করার ইচ্ছা করি।

মুফতিয়ে আযমের সাথে সাক্ষাৎ

শুক্রবার সকাল দশটায় মুফতী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। কিছুক্ষণের আলাপচারিতার পর মুফতী সাহেব বললেন" আমরা এখানে তুর্কীস্থানের ইসলাম কায়েম করতে চাই। পাকিস্তানী লোক ধর্মের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করে এবং ধর্মকে কঠিন করে ফেলে। আমরা উন্নত রাষ্ট্রে বসবাস করি। তাই ইসলামকে আধুনিকায়ন করতে চাই। (اَلدِّيْنُ يُسْرٌ) দ্বীন ধর্ম সহজ। তখন আমি মুফতী সাহেবকে তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে, সে মূলত ফতোয়াদাতা মুফতী না বরং (مفت) মুফত থেকে মুফতী হয়েছে। তার গোটা দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুনিয়ার লোভ বিরাজ করছে। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বললেন, আমাদের শায়খ এখানে সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার নিসবত প্রচার প্রসার করতে আগমন করেছেন। মুফতী সাহেব তার কথা শুনে বললেন, তিনি পুরো দেশের যেখানে যেতে চান এবং যে মসজিদে ওয়াজ করতে চান, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে। আমি তার জন্য দু'আ ও কল্যাণ কামনা করি। হাদীসে রয়েছে ঃ

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ

(যখন তোমাদের কাছে কওমের কোন মেহমান আসে, তখন তোমরা তাকে সম্মান কর) আমি তার কথাকে গনীমত মনে করি এবং মাওলানাকে বলি, আমরা

যাওয়ার অনুমতি চাই। মুফতী সাহেব যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত আসেন। পরবর্তীতে তার সাথে আমার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

নতুন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

জুমআর নামায পড়ানোর জন্য তুর্কী থেকে এক জামাআত এসেছিল। তাদের এক লোক দাড়িবিহীন। পাতলা কোট ও টাই পরিহিত খালি মাথায় বক্তৃতা করল। সে তার বক্তৃতায় বলল যে, আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করে পুরো দেশে এর শাখা মসজিদ নির্মাণ করব। তুর্কী একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল। ইস্তাম্বুলে হাজার হাজার মসজিদ, এবং প্রত্যেক মসজিদে হাজার হাজার লোক নামায আদায় করে। তুর্কী তার আধুনিকতা ও উন্নয়নের দিক থেকে ইউরোপের অংশ। সুতরাং আপনারা তুর্কীকে সহযোগিতা করবেন। খুতবা মুফতীয়ে আযম সাহেব পাঠ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ! নামায এক তুর্কী শায়খ পড়ালেন, যিনি বাহ্যিকভাবে সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন, তা না হলে আমরা জুমআর নামায আদায় করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতাম। নামাযান্তে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। আলমাতা শহর থেকে হাজার হাজার নারী পুরুষ এই কনফারেন্স দেখতে আসল। আমি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দুআ করে মসজিদে ফিরে আসি।

কাযাকে তরুণীর স্বপ্ন

আমরা মসজিদে প্রবেশ করার সময় দু'মহিলা আমাদের দিকে আসতে লাগল। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা বলে কী? মাওলানা বললেন, তাদের একজন মা। অপরজন মেয়ে। মা বলল, তার মেয়ের নাম দীনাহ। তারা এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে বসবাস করে। আজ কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছে। মেয়েটি কিছুদিন পূর্বে এক স্বপ্ন দেখেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে তার মাকে আপনার পুরো দেহের অবয়ব, চেহারা, কাপড় ইত্যাদির বর্ণনা দিল এবং বলল, আম্মা বুযুর্গের চেহারা থেকে নূর ঠিকরে পড়ছে এবং হাতে লাঠি রয়েছে। তার মা তাকে বলল, এ ধরনের লোক তো মসজিদে পাওয়া যায়। অতঃপর তারা মসজিদে যোগাযোগ করে। আজ ফের কনফারেন্সের কথা জানতে পারে। তারা কনফারেন্সে যোগ দিতে এসে আপনাকে দেখতেই দীনাহ বলে উঠল আম্মা! আমি এই বুযুর্গকেই স্বপ্নে দেখেছিলাম। এই দুই মহিলা পুরো সময় আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা আপনার কাছে মুরীদ হতে চায়।

আমি তাদেরকে তওবার কালেমা পাঠ করিয়ে মুরীদ করে নিই। আর এটাই কাজাকিস্তানে নকশবন্দী তরীকার প্রচার প্রসারের প্রারম্ভিকা ছিল। দুই মহিলা বসা অবস্থায় এক দল যুবক ও মহিলা মসজিদে প্রবেশ করল। মসজিদ দেখতে দেখতে ধীরে আমার নিকটবর্তী হতে লাগল। মাওলানা তাদের পরিচয় জানার জন্য উঠে সামনে গেলেন। কয়েক মিনিট পর তারা আমার কাছে এসে গেল। তারা আমার সামনে বসে গেল। মহিলাদেরকে আমি আমার ডান পাশে বসার কথা বলি।

শিল্পীদের আগমন

মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন যে, তারা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তারা ঐ বিভাগে রয়েছে, যে বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ফিল্ম তথা চলচ্চিত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের দলনেত্রী এক যুবতী সে আপনার সাথে সরাসরি কথা বলতে চায়। আমি অনুমতি দেই। আমার ডান পাশে বসা এক যুবতী বলল, হযরত! আমার জীবনে এই প্রথম এমন এক ব্যক্তির সাথে কথা বলছি, যার ফলে আমার অন্তর আন্দোলিত হয়ে গেছে। আমার মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, যদিও আপনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। কিন্তু আমি আপনাকে ঠিকই দেখছি। আমি ইউনিভার্সিটিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। আমি ইউনিভাসিটির প্রথম সারির নৃত্যশিল্পী আমার সাথে আরও কিছু যুবতী রয়েছে, তারাও নৃত্য ও গান শিক্ষা করেছে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী মিউজিক সেকশনে রয়েছে এবং কিছু ছাত্র–ছাত্রী এ শিল্প শিক্ষা করছে। আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে আইসক্রীম খেতে খেতে শহরের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মসজিদের কাছে ভীড় দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে যাই। ইতোমধ্যে আপনাকে মসজিদে প্রবেশ হতে দেখি। আমাদের একজন বলল, বিদেশী মেহমান দেখা যাচ্ছে। চল, তার সাথে মুলাকাত করি। তাই আমরা আপনার সাথে মুলাকাত করতে মসজিদে এসে বসেছি।

এখন আমি আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করি। যখন তারা জানতে পারল যে, আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রি অর্জন করেছি এবং কম্পিউটারেও যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে তখন তারা বিস্মিত হল। বলতে লাগল যে, আপনাকে তো একজন শায়খ মনে হয়?

আমি বললাম, এটাই জীবনের মূল বিষয় এবং সৃষ্টিকুল সৃষ্টির মূল্য উদ্দেশ্য। সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি শুধু পানাহারই হত, তাহলে মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না। মানবকূলের শ্রেষ্ঠত্ব হল চরিত্র ও নৈতিকতার উৎকর্ষের মধ্যে বিদ্যমান।

অতঃপর এক যুবক মাওলানা আব্দুল্লাহর কানে কানে কথা বলল। মাওলানা আমাকে বললেন, হযরত! এই যুবক আপনার সাথে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করছে।

তৃতীয় হীরকের দর্শন লাভ

এই যুবক বলল, আমার নাম আমীরে তৈমুর। আমি ইউনিভার্সিটিতে চিত্র শিল্প শিক্ষা করছি। আপনার আলোচনা শোনে আমার হৃদয়রাজ্যে তোলপাড় সৃষ্টি

হয়েছে। আমি সবকিছু ছেড়ে আপনি যে জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, তা শিক্ষা করব। আমি বললাম, এর জন্য বায়আত হতে হবে। সে বলল, আমি এখনই প্রস্তুত আছি, আমাকে বায়আত করে নিন। যখন সে সামনে আসল, অন্যান্যরা বলতে লাগল যে, আমরা আপনার শাগরিদ হতে পারব না?

মাওলানা বললেন, যে ব্যক্তি নিজের অতীত জীবনের গোনাহ থেকে তওবা করতে চায়, সে যেন সামনে এসে শায়খের কাছে তওবার কালেমা পাঠ করে। একথা শুনে যুবতীরা উঠে আসতে লাগল। মাওলানা তাদেরকে বলল, আপনারা এখানে বসেই কালেমা পাঠ করুন। আমি খুতবা পাঠ করে তওবার কালেমা পাঠ করালাম। যখন দুআ করি, মাহফিলে এক বর্ণনাতীত অবস্থা বিরাজ করছিল। এক তো দীনাহ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। দ্বিতীয়ত ইউনিভার্সিটির সেই নৃত্যশিল্পী (নায়িকা) খুব কাঁদতে শুরু করল।

আলহামদুলিল্লাহ! পরবর্তীতে একথা প্রমাণ হয়েছে যে, আমীরে তৈমুর এবং নায়িকার তওবা সঠিক তওবা ছিল। তারা উভয়ে ইউনিভারসিটিতে যাওয়া ছেড়ে দিল। আমার পরামর্শে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। আমীরে তৈমুর আমার সাথে গোটা রাশিয়া সফর করেছে। মাযা থেকে পা পর্যন্ত গোটা শরীর সুন্নত দ্বারা সজ্জিত করেছে। এলাকার লোকদের উপর তার ভালো কাজের এত প্রভাব পড়ল যে, লোকজন তাকে তাদের মসজিদের ইমাম ও মাদ্‌রাসার মুহতামিম বানিয়ে দিল।

এটাই আমি আলামাআতা পৌছে তৃতীয় হীরকের পরিচয় লাভ করি। নায়িকা আমীরে তৈমুর থেকে কুরআন পাঠ করা শিখেছে। বর্তমানে সে তার গ্রামের বাচ্চাদেরকে কুরআন পড়া শিক্ষা দিচ্ছে। আমীরে তৈমুর তার বন্ধুদেরকে বলেছে, আমি ভাল রাস্তা গ্রহণ করেছিলাম, ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে দুনিয়াতে হুর দান করেছেন। তা না হলে এই নায়িকার হাজার হাজার দর্শক ছিল। বর্তমানে সে যখন দুপাট্টা পরিধান করে কুরআন তেলাওয়াত করে তখন তাকে হুরে ঈন (حُوْرٌ عِيْنٌ) মনে হয়।

ذٰلك فَضْلِ اللّٰه يُؤْ تِيْهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন।"

চীলকে অবস্থান

শুক্রবার আসরের নামাযের পর মাওলানা আব্দুল্লাহ অযু তাজা করার জন্য বাইরে গেলেন। সেখানে আলমাআতা থেকে ১০০ কিঃ মিঃ দূর থেকে আগত এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হল। অল্প পরিচয়ে তার সাথে আমার মুলাকাত হয়। সে তার বাড়ীতে আমাদের দাওয়াত করে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল। মাওলানা

সাহেব পরামর্শ দিল যে, দাওয়াত কবুল করার দ্বারা আমাদের কাজাকিস্তানের গ্রামগুলোতে কাজ করার সুযোগ হবে। আমি ও যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি। অতঃপর পরের দিন আমরা দু'ঘন্টা সফর করে চীলক পৌঁছি।

চীলক একটি বড় গ্রামের নাম। জীবন ধারণের সব উপকরণ সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। প্রশস্ত রাস্তা, বড় বড় বাড়ী। শান্তি ও নিরাপদ জীবন যাপন। লোকজন পরস্পরের আত্মীয়তা, সৌহাদ্যের এক বন্ধনে আবদ্ধ।

মসজিদে যোহরের নামাযের সময় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, মাগরিবের নামাযের পর বয়ান হবে। এই ঘোষণা পুরো গ্রামে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। নারী-পুরুষ মুলাকাত করার জন্য আসতে শুরু করল। বাড়ীর মালিককে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, মহিলারা যেন পর্দা ব্যতীত সামনে এসে কথাবার্তা না বলে। তারা একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। মহিলারা জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আমাদের দীন শিখার কী ব্যবস্থা হবে? আমি বললাম, আগামীকাল এগারটায় শুধু মহিলাদের জন্য এক প্রোগ্রাম হবে। মহিলারা এ প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

মাগরিবের সময় যুবকদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। লোকজন খুব আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে বয়ান শুনতে বসল। কিন্তু বয়ান তরজমা করার জন্য বিরাট সমস্যা দেখা দিল। মাওলানা আব্দুল্লাহ কাজাকী ভাষা জানতেন না এবং স্থানীয় লোকজন উজবেকী ভাষা জানে না। আমীরে তৈমুর যদিও স্থানীয় ছিল এবং কাজাকী ভাষা তার মাতৃভাষা ছিল। কিন্তু সে আরবী ও উর্দূ ভাষা বুঝে না। তাই বয়ানের তরজমা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সেদিন আল্লাহ তাআলার কথার যথার্থতা অনুধাবন হয় যে, তিনি প্রত্যেক নবীকে তার স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

(আমি কোন নবীকে প্রেরণ করিনি, তবে স্বজাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি।)

আমি প্রস্তাব করি যে, আমার আরবী বয়ান মাওলানা আব্দুল্লাহ রুশ ভাষায় তরজমা করবে। তৈমুর রুশ ভাষা থেকে কাযাকী ভাষায় তরজমা করবে। অতঃপর সেদিন আমি আরবীতে বয়ান করি। মাওলানা আব্দুল্লাহ রুশী ভাষায় তরজমা করলেন এবং আমীরে তৈমুর তা কাযাফী ভাষায় তরজমা করল। দুই দোভাষী দ্বারা বয়ান শেষ হল। স্থানীয় লোকজন রুশদের ঘৃণা করার ফলে মসজিদে রুশ ভাষায় কথা বলা (মাকরুহ) অপছন্দ মনে করত। কিন্তু আমাদের কাছে এই সমস্যার দ্বিতীয় কোন সমাধান ছিল না। তাই এ পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

আমি খুব করে বাতেনী তাওয়াজ্জুহ দিলাম। ফলে আমি তাদেরকে যে বিষয়টি বুঝাতে চেষ্টা করেছি তাদের অন্তর সে বিষয়টিই বুঝতে সক্ষম হয়েছে। বয়ান শেষে সবাই সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হল। বাচ্চাদের মাঝে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

মহিলাদের বায়আত

পরের দিন এগারটার সময় বাড়ীর মালিকের ঘর মহিলাদের দ্বারা ভরপুর হয়ে গেল। ফলে মসজিদ থেকে লাউড স্পীকার নিয়ে বয়ান করতে হয়েছে। সিদ্ধান্ত হল যে, আমি গতকালের বয়ান ইংরেজিতে করব এবং আমীরে তৈমুর তা স্থানীয় ভাষায় তরজমা করবে।

কিন্তু মাওলানা আব্দুল্লাহ আপত্তি করলেন। তিনি বলেন যে, পুরুষেরা গতকাল এই বয়ান শুনেছে। সুতরাং আজ পুনরায় সে বয়ান করলে তারা মনোযোগ দিয়ে শুনবে না। আমি বলি, মাওলানা! আল্লাহ তাআলা শরীয়াতের মধ্যে এত আকর্ষণ রেখেছেন যে, এক নসীহত বার বার শোনার দ্বারাও ক্রিয়া হয়। সাথে যদি বাতেনী ফয়েজ আসে, তাহলে তো বার বার চিনি খাওয়ার স্বাদ অনুভব হয়। যে লোক গান শোনে সে একই গান হাজার বার শোনে, তদুপরি সে নতুন স্বাদ আস্বাদন করে। বাচ্চারা চুয়িংগাম মুখে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চিবাতে থাকে তারপরও তারা স্বাদ পায়। অনুরূপভাবে আমি কুরআনের আয়াত বয়ান করব এবং কুরআনের মধ্যে এত আকর্ষণ রয়েছে যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি হবে।

অতঃপর তা-ই করা হল। শেষে উপস্থিত লোকজন যিকির করে এবং অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে মুরাকাবা করে তারা মন্তব্য করে যে, গতকালের তুলনায় আজ খুব মজা লেগেছে।

সম্মিলিত দু'আর সময় মহিলারা উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল। আল্লাহ তা'য়ালার রহমত এমনভাবে অবতীর্ণ হল যে, পুরুষদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। মাওলানা আব্দুল্লাহ খুব আনন্দিত হলেন। বয়ান শেষে তিনি বললেন, আজ আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি বললাম, এটাই ঈমানদারদের নিদর্শন।

وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

যখন তাদের উপর তেলাওয়াত করা হয় আল্লাহর আয়াত তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

নবজাতকের নতুন নাম

ঘরের মালিকের ছেলে বিবাহ করেছে দু'বছর অতিবাহিত হয়েছে, তার বিবি আশাবাদী ছিল যে, আগামীকাল সে বাচ্চা প্রসব করবে। সে আকাঙ্ক্ষা করল যে, আমার বাচ্চার নাম এই সম্মানিত মেহমানের নামে হবে। অতএব তার বাচ্চার নাম যুলফিকার আহমদ চয়ন করা হয়। বাড়ীর সবার খুশীর সীমা ছিল না।

আমি তার বাচ্চার জন্য খুব দু'আ করি। বাচ্চার পিতা আমাকে বললেন, হযরত! আমি আমার বাচ্চাকে দীনের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করার নিয়ত

করেছি। আমি বললাম, হযরত ইমাম গাযযালী রহ. এক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যদি পিতামাতার নিয়ত শুরুতে এই হয় যে, বাচ্চাকে দীন শেখাবে তাহলে বাচ্চা তার জীবনে যত শ্বাস নেয় প্রতি শ্বাসে তার পিতা-মাতাকে সওয়াব দেওয়া হয়।

হযরত খাজা আহমদ ইসুভী রহ.

হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামদানী রহ. সিলসিলায়ে নকশেবন্দীয়ার উচ্চ মর্যাদার শায়খ ছিলেন। তার শাগরিদের তালিকায় হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহ. ও হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী রহ.-এর নাম রয়েছে। তারা উভয়ে বিভিন্ন সময় খাজা সাহেব রহ.-এর সোহবতে থেকে সিলসিলায়ে নকশে বন্দীয়ার উলূম ও মারেফত অর্জন করেছেন। এজন্য খাজা আবু ইউসুফ হামদানী রহ. কে তাদের উভয়ের পীর ও মুর্শিদ বলা হয়ে থাকে।

খাজা আবু ইউসুফ হামদানী রহ.-এর দু'খলিফা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। একজন হলেন– হযরত খাজা আব্দুল খালেক গাজদানী রহ. এবং দ্বিতীয়জন হলেন হযরত খাজা আহমদ ইসুভী রহ.। খাজা আব্দুল খালেক গাজদানী রহ.-এর নাম আমাদের মাশায়েখদের তালিকায় আসে। কিন্তু খাজা আহমদ ইসুভী রহ. থেকে দ্বিতীয় শাখা শুরু হয়েছে। খাজা আহমদ ইসুভী রহ.–এর মাজার তাতারিস্তানে অবস্থিত। আমাকে মাওলানা আব্দুল্লাহ বলেন, কয়েক ঘন্টা গাড়ীতে সফর করলে খাজা আহমদ ইসুভী রহ.-এর মাজারে উপস্থিত হওয়া যাবে। আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম, তাই তিনি প্রোগ্রাম করে নিলেন।

হযরত খাজা আহমদ ইসুভী রহ. বড় মুস্তাযাবুদ্দাওয়াত ছিলেন। যার দিকে চোখ তুলে তাকাতেন তার কলব জারী হয়ে যেত।

হযরত খাজা আহমদ ইসুভী রহ. সুন্নতের অনুসারী এক বিরাট বুযুর্গ ছিলেন। তার উলূম ও মা'আরিফ তথা জ্ঞান-আধ্যাত্মিকতায় লোকদের খুব উপকার হত। যখন তাঁর বয়স ৬৩ হল, তখন তিনি বললেন, আমার মাহবুব (সা) যমীনে ৬৩ বছর কাটিয়েছেন। তাই আমি আর যমীনের উপর থাকব না। বাকী জীবন যমীনের নিচে কাটাতে চাই। সুতরাং তিনি যমীনের নিচে একটি কামরা তৈরী করে নিলেন এবং এর মধ্যেই সবর্দা যিক্‌র ও অন্যান্য ইবাদত করে কাটাতেন। এমনকি অবশেষে এ কামরাতেই তার ওফাত হয়। (هر گلے را رنگ و بوئے دیگر است। (প্রত্যেক ফুলের ভিন্ন ভিন্ন সুবাস)

ওলীদের পাল

যখন আমরা ইসালে সওয়াবের পর মাযারে এরিয়া থেকে বের হয়ে এলাম, তখন আমাদের খুব ক্ষুধা অনুভব হচ্ছিল। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের ইচ্ছা ছিল

কোন হোটেল থেকে রুটি কিনে চা দিয়ে খেয়ে নেব। কিন্তু সামনে অগ্রসর হতেই এক মহিলা মাওলানার কাছে এসে বলতে লাগল, আপনাদেরকে মুসাফির মনে হচ্ছে। মাওলানা বললেন, হ্যাঁ। বলল আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি আমাদের পক্ষ থেকে দাওয়াত কবুল করুন। মাওলানা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! কী করি। আমি বললাম, মাওলানা! যদি এ মহিলা বলে যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, আমার কয়েকটি জুতা খেয়ে যান। তাহলে আমরা জুতা খেতেও রাজী আছি। সে তো খাবার খাওয়ার জন্য বলছে। মাওলানা এই কথা মহিলাকে শোনাল। মহিলা শুনে খিলখিলিয়ে হাসল এবং বলল আমার ভাগ্য খুলে গিয়েছে যে, এ ধরনের বুযুর্গরা আমার বাসায় খানা খাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার বাসা কোথায়? মহিলা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলল, সামনের বাসা। আপনারা দু'মিনিট পায়ে হেটে চলে যাবেন। অতঃপর আমরা তার বাসায় গেলাম। মহিলা বাসায় প্রবেশ করে বাচ্চাদেরকে চিৎকার করে কি যেন বলছিল।

মাওলানা এক কথা শুনে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমি তাকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। মাওলানা বললেন, মহিলা আনন্দিত হয়ে তার মেয়েদেরকে বলছে হে আল্লাহর বান্দিরা! তাড়াতাড়ি কর! দস্তরখানা বিছাও! আমার সাথে আল্লাহর ওলীদের পাল এসেছে। এই সৎমহিলা অত্যন্ত সমাদরের সাথে আপ্যায়ন করল। আমরা খাবার খেয়ে কায়লুলা করি, অতঃপর যোহরের নামায আদায় করে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

চতুর্থ অধ্যায়

কারগিস্তান সফর

কারগিস্তানের একদিকে কাযাকিস্তান অন্য দিকে উজবেকিস্তান, তৃতীয় দিকে চীন অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা চীনের কুতায়ী প্রদেশের সাথে বংশীয় সম্পর্কে রাখে। এই রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ থেকে অর্থনৈতিকভাবে পিছনে রয়েছে। এর অনেক অঞ্চল পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে দীনদারীর ক্ষেত্রে উজবেকিস্তানের পর পরই এর অবস্থান। এখন ওলামাদের সম্পর্ক নামগান ও ফারাগান উপত্যকার ওলামাদের তুলনায় বেশি।

বাশকাক শহরে

কমিউনিস্টরা কারগিস্তানের দারুল খিলাফার নাম ফারুনয রেখেছিল। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা যখন স্বাধীনতা অর্জন করল, তখন এর নাম পরিবর্তন করে বাশকাক রেখে দিল।

এই শহর দুশুম্বার ন্যায় নতুন পুরাতন প্রাসাদ বিশিষ্ট এক শহর। শহরের অধিবাসীরা প্রশস্ত স্থানে বসবাস করা পছন্দ করে। অধিকাংশ উঁচু উঁচু ভবনে সরকারী অফিস আদালত রয়েছে। ৬ জুলাই সোমবার আলমাতা থেকে গাড়িযোগে বাশকাক পৌঁছি। এই শহরে আমাদের পরিচিত কেউ ছিল না। তবে যাওয়ার সময় চীলক মসজিদের ইমাম সাহেব সেখানকার মুফতীয়ে আযম সাহেবের বাসার ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন।

আসরের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে মুফতী সাহেবের বাসায় পৌঁছে জানতে পারলাম, তিনি কোথায় যেন গিয়েছেন। আসতে দেরী হবে। কারগিস্তানের মুফতিয়ে আযমের মেয়ে কীভাবে যেন আমাদেরকে দেখতে পেল। সাথে সাথে মুফতী সাহেবের ছেলেকে পাঠাল, তুমি মেহমানদেরকে বলে আস যে, আব্বু বাসায় নেই তো কী হয়েছে? আপনারা আমাদের বাসায় অবস্থান করুন। আমি মেহমানখানা খুলে দিচ্ছি। আমরা সফরের কারণে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তাই আমরা মাগরিবের নামায আদায় করে ঘুমিয়ে গেলাম।

রাতে অনেক দেরীতে ঘুম ভাঙ্গলো, আমরা ইশার নামায আদায় করি। এতক্ষণে মুফতিয়ে আযম মাওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব বাসায় এসে পৌঁছে যান। তার পিতা সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার বিরাট বড় শায়খ ছিলেন কিন্তু মুফতী সাহেবের যিকির ও সুলুকের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। রাতে অল্প সময় সাক্ষাত হল। আমরা পুনরায় ঘুমিয়ে যাই।

সকালে নাস্তা খেতে বসলে মুফতী সাহেব ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি কিতাব দেখালেন এবং বললেন, এটি আমার পিতা লিখেছিলেন। কিতাবে আলমে আমর–এর পাঁচ লতীফা এবং আলমে খালক— এর দুই লতীফার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আমি মুফতী সাহেবকে বললাম, এই কিতাবে পুরো সুলূকের নয়, বরং প্রথম সাত সবক সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। মুফতী সাহেব হতভম্ব হয়ে আমাকে সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। প্রায় এক ঘন্টা আলোচনার পর মুফতী সাহেব বললেন, আজকের আলোচনা দ্বারা খুব উপকার হয়েছে। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আজ বাদ মাগরিব মসজিদে বয়ান করার প্রোগ্রাম করতে পারি। আমি বললাম, আপনার হুকুম শিরোধার্য। মুফতী সাহেব যোহরের নামাযের পর ঘোষণা করলেন যার ফলে রাতের বয়ানে অনেক লোক একত্রিত হল। আমি বয়ান করি এবং মুফতী সাহেব তরজমা করলেন।

যখন বায়আত করতে শুরু করলাম, তখন মুফতী সাহেব সর্বাগ্রে পাগড়ী আঁকড়ে ধরলেন। বায়আত শেষে আমি অজিফা ও আমল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি এবং মুরাকাবা করাই। যখন প্রোগ্রাম থেকে অবসর হয়ে বাসায় পৌঁছি, তখন মুফতী সাহেব কলারবিশিষ্ট শার্ট খুলে জুব্বা পরিধান করলেন এবং মাথায় টুপীর সাথে পাগড়ী বাঁধলেন এবং বললেন, আমার পিতা এরূপ সুন্নতী পোশাক পরিধান করতেন। আজ থেকে আমিও সুন্নাতী পোশাক পরিধান করব। আলহামদুলিল্লাহ! সিলসিলায়ে আলীয়ার ফয়েজে মুহূর্তের মধ্যে অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়।

বাশকাক দু'দিন থাকার ইচ্ছা ছিল, তাই দ্বিতীয় দিন মুফতী সাহেব তার গাড়ীতে করে আমাদের বিভিন্ন মসজিদ মাদরাসা দেখাতে নিয়ে যান। দু'স্থানে চা পান করি। লোকদেরকে সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত করি। রাতে মুফতী সাহেবের পরিবারের সবাইকে বায়আত করি। পরের দিন আমরা কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক হোটেলের মালিক আমাদেরকে দেখেন এবং দূর থেকে মুচকি হেসে আমাদের সাথে এমনভাবে মিলিত হল যেন পরিচিত কোন বন্ধুর সাথে দীর্ঘদিন পর মিলিত হয়েছে। সে বলল, আমার হোটেলে খাবার ও পোলাও তৈরী রয়েছে। আপনারা তাশরীফ রাখুন। আমরা অস্বীকার করি। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, আমাদের যেতেই হবে। বাধ্য হয়ে আমরা তার হোটেলে যাই। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আরিবিয়াহ রহ. এর উক্তি আমার স্মরণ হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা তাকে ইলহাম করেন। আমি এমন রাযযাক যে, তোমরা যদি না, না কর তবু আমি তোমাদের রিযিক পৌঁছাই! হে আমার বান্দা! যদি তোমরা কেঁদে কেঁদে আমার কাছে রিযিক চাও, তাহলে আমি তোমাদের রিযিক দেব না কেন? অবশ্যই দিব।

নেককারদের জনপদ

মুফতী সাহেব মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে বললেন, বাশকাক থেকে ৫০ কিঃ মিঃ দূরে এক বস্তি রয়েছে। যার অধিবাসীরা রুশ আগ্রাসনের সময় দাগিস্তান থেকে হিজরত করে চলে আসে। এই খান্দান ৭০ বছর পর বর্তমানে এক জনপদে পরিণত হয়। এই এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী আলেম। এখানে একটি বড় মাদরাসাও রয়েছে। মাওলানা আব্দুল্লাহ সেখানে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মুফতী সাহেব ফোনে যোগাযোগ করলেন। মাদরাসার নাজিম সাহেব আমাদেরকে নেওয়ার জন্য তাশরিফ আনলেন। নাজিম সাহেব কথাবার্তায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অন্তরে স্থান করে নিলেন। আমরা সেখানে পৌছে দুইশত ছাত্রকে উপস্থিতপেলাম। প্রত্যেকে ছাত্রের চেহারায় ইলেমের নূর প্রস্ফুটিত ছিল। উস্তাদদের দেখে অন্তর খুশী হয়ে গেল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুন্নত দ্বারা সজ্জিত ছিল। তারা প্রত্যেকেই বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আসরের নামাযান্তে বয়ান করি এবং দু'আ করে মাহফিল শেষ করি। রাতের খাবার নাজিম সাহেবের বাসায় খাই। খাবার শেষে তার ঘরেই অবস্থান করি। তিনি রুশ আগ্রাসনের বিস্তারিত ট্রাজেডী শোনালেন। আমরা শুনে অবাক হয়ে যাই।

রাতে দেরিতে শোয়া সত্ত্বেও আমরা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার জন্য উঠে যাই। আমি তো আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিনই উঠি। আমি কয়েক রাকাত নফল নামায আদায় করে সুবহে সাদেক পর্যন্ত ওযীফা ও যিকির আযকারে ব্যস্ত থাকি। ফজরের নামাযের পর ইশার নামায পর্যন্ত এই অবস্থায় চলতে থাকে। ইশরাকের পর নাজিম সাহেব বললেন, হযরত! আমি আপনার গতকালের বয়ানে প্রভাবিত হয়েছি এবং আপনাকে আমরা চুপিসারে লক্ষ্য করেছি। আপনার ব্যক্তিগত আমলও লক্ষ্য করেছি। এখন আমার বুঝে এসেছে যে, আপনি একজন সুন্নতের খাঁটি অনুসারী। আমি মুহতামিম সাহেবের কাছে পুরো রিপোর্ট পৌছে দিয়েছি। মুহতামিম সাহেব অত্যন্ত দুর্বল। তাই তিনি দিনের দশটায় মাদরাসায় আসেন এবং কয়েকটি ঘন্টা করে চলে যান। আজ তিনি আপনার সাথে মুলাকাত করবেন। তিনি যদি ইঙ্গিত করে দেন তাহলে গোটা বস্তিবাসী আপনার কাছে যিকির ও সুলূক শিখতে এসে যাবে। কিছুক্ষণ পর মুহতামিম সাহেব তাশরিফ আনলেন। তাকে দেখেই স্মরণ হয়ে গেল এই আয়াত।

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

"তাদের নিদর্শন হলো তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান।"

মুহতামিম সাহেব তার ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে আমার পরিচয় জানলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে কীভাবে আসলেন? আমি বললাম, হাদীসে

নেককারদের বস্তির আলোচনা পাঠ করেছি। এক গোনাহগার ব্যক্তি নেককারদের বস্তি অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহও তাকে মাফ করে দেন। আজ আমিও এই উদ্দেশ্যে নেককারদের কাছে চলে এলাম, যেন আপনাদের সাথে মুলাকাত করার কারণে আল্লাহ তাআলা আগেই গোনাহগারকে মাফ করে দেন। মুহতামিম সাহেব আমার কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হযরত! এ অবস্থা তো আপনার বিনয়বোধ। আমাদের তো বিশ্বাস। আপনি ঐ ধরনের লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের চেহারা দর্শনে গাছের পাতা শীতে যেমন ঝরে যায় তেমনিভাবে গোনাহ্গারদের গোনাহ ঝরে যায়।

তার কথা শুনে আমার চোখে পানি এসে যায় এবং উপস্থিত লোকদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ আমরা কাঁদতে থাকি। অতঃপর মুহতামিম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সিলসিলা কোন বুযুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে? আমি হুজুর সা. থেকে নিয়ে আমার পীর ও মুর্শিদ পর্যন্ত সকল বুযুর্গের পরিচয় প্রদান করি। মুহতামিম সাহেব আনন্দের অতিশয্যে– আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! বলতে লাগলেন এবং বললেন, এই সিলসিলার এক স্বার্থক মালা তৈরী হয়ে আছে। আমি বললাম, হবে না কেন? তিনি বললেন, আমাকে আপনার শাগরিদ বানিয়ে নিন এবং অজীফা ও আমল বলে দিন। আমার অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও নিয়মিত অজীফা আদায় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ইনশাল্লাহ! তার সাথে নাজিম সাহেবও বললেন, আমিও এই সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই। পর্যায়ক্রমে সবাইকে সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত করে এবং কলব জারী করে দেই। মুহতামিম সাহেব দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করার পর বাসায় চলে গেলেন। আমরা সবাই মাদরাসায় চলে আসি। মাদরাসার ছাত্ররা পূর্বে থেকেই আমাদের আগমনের সংবাদ জানছিল। তাই তারা বয়ান করার অনুরোধ জানাল। আমি তাকওয়া সম্পর্কে বয়ান করি। ছাত্ররা খুশীতে মেতে উঠল এবং বায়আত হওয়ার আবেদন করল। আমি সবাইকে বায়আত করি এবং অজীফা বলে দেই।

আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করি। আমার পীরও মুর্শিদ এর ফয়েজ নেককারদের বস্তিতে পৌছিয়ে দেওয়া সৌভাগ্য অর্জন হওয়ার কারণ।

এই সৌভাগ্য বাহুবল দিয়ে অর্জন করা যায় না, যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে দান না করেন।

মুকীতে একদিন

মুরাকাবা শেষে আমি নাজিম সাহেব থেকে অনুমতি নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছাত্র–ওলামাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করি। ইসলামের মধ্যে এত আকর্ষণ রয়েছে যে, প্রতিটি অন্তর পরস্পরে মহব্বত ও ভালবাসা দিয়ে টইটম্বুর হয়ে যায়। যা

সাধারণত বংশ ও রক্তের বন্ধনের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। কয়েকজন আলেম পাকিস্তান এসে আমার কাছে ইলমে দীন শিক্ষা করার আগ্রহ প্রকাশ করল। পরবর্তীতে সাতজন তাদের আগ্রহ পুরো করেছে। আমরা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে মুরকি নামক জনপদে আমীরে তৈমুরের বাসায় পৌছে। এই জনপদ জাম্বুল রাষ্ট্রের অংশ। গ্রামের পাশেই ফ্যাক্টরি এরিয়া রয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ লোক ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। আমীরে তৈমুর তার আত্মীয়-স্বজনদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তারা সবাই সিলাসিলায়ে আলীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। যোহরের নামাযের পর মুরকীর মসজিদে বয়ান করি। আমীর তৈমুরের এক নিকটাত্মীয় জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আমীরে তৈমুর আপনার কাছে মুরীদ হওয়ায় তার অবস্থা পরির্বতন হয়ে গেছে এবং সে ইউনিভার্সিটিতে যেতে অস্বীকার করছে। আমি বললাম, ইউনিভারসিটিতে না যাওয়ার কারণ তার কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন। আমীর তার কথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলেন, হযরত! আমি আমার জীবন ধ্বংস করেছি, আমার আমলনামায় পাপাচার ছাড়া কিছুই নেই। আমি চিত্রশিল্প শিক্ষা করি। আমাদের ইউনিভারসিটিতে যুবকদেরকে চরিত্র নষ্ট করতে কোন রকম কসুর করা হয় না। ছেলেমেয়েদেরকে এক রুমে বসবাস করতে দেওয়া হয়। এমনকি হোটেলের বাথরুম পর্যন্ত একত্রে। একই বাথরুম থেকে মেয়ে গোসল করে বের হয়। আর ছেলে বাইরে অপেক্ষায় থাকে। ছেলে মেয়েরা একই স্থানে কাপড় ধৌত করে। পানাহার একই স্থানে, একসাথে করতে হয়। এভাবে সহাবস্থানের ফলে ছেলে মেয়েরা পরস্পরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। পিতা মাতা বা কারো কোন আপত্তি পরোয়া করে না। হযরত! আপনিই বলুন। শয়তানী কাজের মধ্যে কি কোন রকম কম করা হয়? আমাদের বিভাগের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানের দৃশ্যের ছবি তৈরি করতে দেওয়া হয়। সেখানে মানুষ ও প্রাণীর ছবি অধিকহারে তৈরী করা হয়।

যখন বাৎসরিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তখন এক যুবতীকে নির্বাচন করা হয়, সে সকল ছাত্রের সামনে উলঙ্গ হয়ে মেঝেতে বসে থাকে। ছাত্রদেরকে পনের মিনিটের মধ্যে তার ছবি একে দেখাতে হয়। এভাবে চার পাঁচটি ছবি একে দেখাতে হয়। এই দৃশ্য যখন ছাত্ররা অবলোকন করে তখন পরবর্তীতে কি এই দৃশ্য ছাত্রদের সামনে ভেসে উঠে না? অতঃপর যে ছবি সবচেয়ে সুন্দর হয়, তা দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে উলঙ্গ ছবিতে পুরো দেয়াল ভরে যায়। মুসলমান ছাত্ররা কয়েকবার এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছে। কিন্তু শিক্ষকরা বলেন যে, এ ব্যাপারে উপর থেকে নির্দেশ রয়েছে, তাই করা হচ্ছে।

মূলতঃ এগুলো করা হয় ছাত্রদের লজ্জা-শরম উঠিয়ে দেওয়ার জন্য। কমিউনিস্টরা দীনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে,

যে ব্যক্তি লজ্জা শরম রাখে না, সে দীনের কাজ করতে অনীহা করবেই। এজন্যেই তারা একাজ করিয়ে থাকে। আমি তার থেকে কথা টেনে নিয়ে বললাম আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আমাদের নবী মুহাম্মদ সা. ইরশাদ করেছেন–

إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ

(যখন তোমার লজ্জা শরম চলে যায় তখন তুমি যা ইচ্ছা তা কর) আবু উসমান বললেন, হযরত! আমীরে তৈমুরের উচিৎ এখন এ শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে এর পরিবর্তে দীনের শিক্ষা অর্জন করা এবং দীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করা। আল্লাহ তাআলা তার রিযিকের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। আমি তার নিকটাত্মীয়দের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে আছে। তিনি বললেন, একথা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কমিউনিস্টরা দীনের ক্ষতি ও ধ্বংসের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আমাদের এলাকার কাছেই শরাব মদ বানানোর এক কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর কারিগরকে এক মাসের বেতন দেওয়ার পরিবর্তে এক মাসের বেতন পরিমাণ মদের বোতল দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে পান করতে পারে অথবা বিক্রি করে দিতে পারে। এভাবে দেখা যায় মুসলমান কারিগরদের বাসায় ছয় মাস পরপর মদের বোতলের ছড়াছড়ি হয়।

এ ব্যবস্থা এ জন্যই করা হয়েছে যে, যেন লোকজন মদ পানে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং ধর্মবিমুখ জীবন-যাপন করতে শুরু করে। তার কথা শুনে আমীরে তৈমুর বললেন, আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তাই আমরা আমাদের যৌবনকাল দীনের জন্য উৎসর্গ করতে চাই। এজন্য আমি সর্বাগ্রে প্রস্তুত রয়েছি। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আপনার আগ্রহ জোশ বাড়িয়ে দিন এবং দীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। দু'আ করে মাহফিল শেষ করে আমরা ঘুমের জন্য বিছানায় চলে যাই।

বকরীর মগজের খোঁজে

পরের দিন সকালের নাস্তার ব্যবস্থা আমীরে তৈমুরের গ্রামের এক সর্দারের বাড়ীতে করেন। ইশরাকের পর সেখানে গিয়ে দেখি বকরীর গোশত ভুনা করে দস্তরখানে রাখা হয়েছে। যখন খাবার খাওয়া শুরু করি তখন বাড়ির মালিক বকরীর ভুনা করা মাথা একটি প্লেটে করে আমার সামনে নিয়ে আসেন। আমীরে তৈমুর বললেন, বিশেষ মেহমানের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। আমি মাথার কিছু অংশ কেটে খাই। ভাবলাম, মাথার খুপরি খুলে মগজ বের করা দরকার। ধারালো ছুরি দস্তরখানেই ছিল। তাই আগ্রহ ভরে মাথার খুপরি খুলে মাথার মগজ কম দেখে নিরাশ হয়ে যাই। মগজ অল্প দেখে মনে হচ্ছিল, বকরীর আকল বুদ্ধি নিতান্তই কম ছিল।

জীবনে ট্যাবলেট খায়নি

আমরা খাবার খাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে গ্রামের ৯০ বছরের এক বৃদ্ধলোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিল। চেহারায় উজ্জ্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমি তাকে আমার কাছে বসালাম। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, তিনি গোশতের পরিবর্তে শুধু চর্বিযুক্ত গোশত খাচ্ছেন। আমি গ্যাষ্ট্রিক বেড়ে যাওয়ার ভয়ে চর্বিযুক্ত গোশত খাওয়া থেকে বিরত ছিলাম, পক্ষান্তরে তিনি খুঁজে খুঁজে চর্বিযুক্ত গোশত খুব মজা করে খাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চামচ উঠিয়ে বাটির নিচে জমে থাকা চর্বি খেতে শুরু করলেন। আমি অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। চুপ থাকা সম্ভব হল না, তাই আমীরে তৈমুরকে বললাম, তাকে জিজ্ঞাসা করুন, তার কোন রোগ আছে কি না? তিনি বললেন, আমার বয়স প্রায় ৯০ হয়েছে। জীবনে কোন দিন হাসপাতাল ও ডাক্তারের কাছে যাইনি। আনন্দের বিষয় হলো গোটা জীবনে কোনদিন একটি ট্যাবলেটও খাইনি। সুবহানাল্লাহ! রাখে আল্লাহ মারে কে?

জাম্বুলের 'মুফতিয়ে আযমের বায়আত

৯ জুলাই বৃহস্পতিবার যোহরের সময় জাম্বুলের মসজিদে পৌঁছি। মসজিদের খাদেম আবদুর রহমান অত্যন্ত আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, তার এক মেয়ে গাজদানে থাকে। কিছুদিন পূর্বে মেয়েকে দেখার জন্য তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তখন আমার বয়ান শোনার সৌভাগ্য তার হয়েছিল।

তখন তিনি আমার কাছে বায়আতও হয়েছিলেন, কিন্তু মানুষের ভীড়ের কারণে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়নি। এখন আমাকে তার মসজিদে দেখে তার আর খুশির সীমা রইল না। তিনি আমাদেরকে মসজিদের মেহমানখানার অবস্থান করালেন। এবং চা দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। তখনই জাম্বুলের সূফীয়ে আযম আলী হায়দার সাহেব আগমন করেন। আবদুর রহমান সাহেব মুফতী সাহেবের কাছে আমার বিস্তারিত পরিচয় দিলেন এবং গাজদানের মাহফিলে তার স্বচোখে দেখা অবস্থা বর্ণনা করলেন। সেখানকার ওলামায়ে কেরামদের বায়আত হওয়ার তাদের ভক্তি ও ভালবাসার ঘটনাবলী শোনালেন। মুফতী আযম সবকিছু শুনে খুব প্রভাবিত হলেন। আব্দুর রহমান সাহেব আমাদেরকে মেহমানদারী করার আগ্রহ প্রকাশ করালেন। মুফতী সাহেব অনুমতি প্রদান করলেন। একথাও বললেন, আমি আমার গাড়ী দিয়ে তাদেরকে পৌঁছে দেব। অতঃপর মুফতী সাহেবের সাথে আমরা মুফতী আব্দুর রহমানের বাড়িতে পৌঁছি। রাতের বয়ান শেষে সমস্ত লোক মুফতী সাহেবের সাথে বায়আত হয়ে গেল। দিদায়ে কলব চিহ্নিত করার পর তাদেরকে অজীফা ও আমল সম্পর্কে তালকীন করি। মাহফিল শেষে মুফতী সাহেব আগামীকাল জুমআর

নামাযের বয়ান করার অনুরোধ জানালেন। আমি খুশির সাথে তার দাওয়াত কবুল করি।

আপনার দর্শনই সকল প্রশ্নের জওয়াব

পরের দিন ফজরের নামাযের পর মুফতী সাহেব বললেন, আমাদের মসজিদে জুমআর নামায একটার সময় শুরু হয়। কিছু মুসল্লী দশটা থেকেই আসতে শুরু করে। এগারটার সময় মসজিদের ভিতরের অংশ ভরে যায়। বারটার সময় মসজিদের বারান্দা ও সমস্ত মাঠ ভরে যায়।

এরপর আগত মুসল্লীরা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে। আমি বললাম, নামাযের তিন ঘন্টা পূর্বে আসতে শুরু করে কেন? তিনি বললেন প্রত্যেকে সালাতুত তাসবীহ আদায় করে এবং যারা কুরআন শরীফ পাঠ করতে চান, তারা সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করে। ইমাম সাহেব সাড়ে এগারটার সময় লাউড-স্পীকার দিয়ে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করেন। সকল মুসল্লী সূরা কাহাফ তেলাওয়াত শোনার সৌভাগ্য অর্জন করে। জুমআর দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা ও শোনার এত গুরুত্ব কোথাও দেখিনি।

আমরা জুমআর নামাযের জন্য দ্রুত গোসল সেরে প্রায় বারটার সময় মসজিদে পৌঁছি। তখন মসজিদে তিল ধরার মত জায়গা খালি ছিল না। আব্দুর রহমান সাহেব পূর্বে থেকে আমাদের জন্য প্রথম কাতারে জায়গা খালি রেখে দিলেন। জুমআর নামাযের একঘন্টা পূর্বে মসজিদে গিয়ে তেলাওয়াত ও তাসবীহ হাতের স্বাদ অনুভব হয় এবং নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকার এক ভিন্ন স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করি। একটার সময় আমি বয়ান শুরু করি এবং মুফতিয়ে আযম সাহেব বয়ানের তরজমা করেন। নামাযের পর বায়আত ও যিকিরের মাহফিল শুরু হয়। অতঃপর আমি অজিফা ও আমলসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করি।

মুফতী সাহেব আমার কানে কানে বললেন যে, এই শহরে এক আলেম রয়েছেন। যিনি কিছুদিন সউদী আরব অবস্থান করার ফলে তাসাউফের বিরোধিতা করেন। আজ সে মসজিদে এসেছে। মুরাকাবার পর যখন লোকজন মুলাকাত করতে আসল। তখন সেই গায়রে মুকাল্লিদ আলেমের সাথেও মোলাকাত হয়। সে জিজ্ঞাসা করল। আপনি কি লোকদেরকে আপনার পিছনে পরিচালিত করেন? নাকি সুন্নতের পথে পরিচালিত করেন? আমি বললাম, সুন্নতের উপর চলার মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। সে বলল, তাদেরকে আপনি যে অজীফা ও আমল বাতলিয়ে দেন। তার কি আপনার চয়নকৃত না হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমি বললাম সকল অজীফা ও আমল কুরআন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। সে বলল কুরআন শরীফ তো আমরাও পড়েছি, কোথায় লেখা আছে?

আমি বললাম, আপনি পড়েছেন কিন্তু বুঝে পড়েননি। যদি বুঝে পড়তেন, তাহলে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন করতেন না। সে পেরেশানীতে ঘেমে গেল এবং বলল? মুরাকাবায় হুকুম কোথায় পেয়েছেন?

আমি এই আয়াত পড়লাম–

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً

(বিনয় ও ভয়ের সাথে তোমার প্রতিপালককে তোমরা অন্তরে স্মরণ কর)

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, اُذْكُرْ আদেশ সূচকক্রিয়া কি না? সে বলল, হ্যাঁ, আদেশসূচক ক্রিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম। فِيْ نَفْسِكَ অর্থ কি? সে বলল, অন্তরের মধ্যে, আমি বললাম। অন্তরে যিকির করাকেই মুরাকাবা বলে।

সে বলল ওকুফে ক্বালবী (وقوف قلبى) এর যিকির কোথায় পেলেন? আমি এই আয়াত তেলাওয়াত করি–

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ

(অতঃপর দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর) মূলত ওকুফে কালবীর উদ্দেশ্যে এটাই যে, আল্লাহকে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় স্মরণ করা।

সে বলল, হ্যাঁ, আমার আপত্তি দূর হয়ে গেছে। মুফতী সাহেব মুচকি হেসে বললেন, এখন আপনি বায়আত হয়ে যান। সে রাজী হয়ে গেল। আমি তাকে বায়আত করে মুরাকাবার পদ্ধতি বলে দিলাম। মাওলানা আব্দুল্লাহর খুশীর অন্ত ছিল না।

নাস্তিক যুবতীর ইসলাম গ্রহণ

এক রুশ যুবতী আবছার রহমানের প্রতিবেশী। সে এক অফিসে ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকুরি করে। আবদুর রহমান নাশতা খাওয়ার পর বললেন, হযরত! এক নাস্তিক যুবতী সে রূপে গুণে লাখের মধ্যে একজন এবং জ্ঞান বুদ্ধিতে অন্যান্য যুবতীর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণার রক্ষক। আমরা তাঁকে মুসলমান বানাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করছে। আমার বাচ্চাদের আগ্রহ হয়েছে যে, আপনি তার সাথে কিছু সময় ব্যয় করবেন। আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর সেই যুবতী এসে গেল। আমি তাকে বললাম। চাদর মুড়ি দিয়ে বসুন। কোন প্রশ্ন করলে করতে পারেন। সে প্রথমে তার বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করল। কথাবার্তায় বুঝা গেল, সে একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার। সে আমার পরিচয় জানতে চাইল।

আমি আমার ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার হওয়া পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় বললাম। সে আশ্চর্য হয়ে গেল, বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কম্পিউটার সম্পর্কে আপনার পুরো অভিজ্ঞতা রয়েছে কি? যখন আমি সে সম্পর্কে বিস্তারিত বললাম, তখন সে বলল, আমার বিরাট সৌভাগ্য যে, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে কথা বলছি, যিনি ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় জ্ঞানে পারদর্শী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ধর্মের ব্যাপারে আপনার কী বিশ্বাস? সে বলল, আমি ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী। আমি কিছু সময় তাকে কুরআনের আয়াত ও সাইন্সের মাধ্যমে সৃষ্টি জগত সম্পর্কে কিছু কথা বলি। সে আমার কথা শুনে কিছু প্রশ্ন করল। আমি তাকে সন্তোষজনক উত্তর দেই। আনুমানিক এক ঘন্টা আলোচনার পর সে ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। আবদুর রহমানের পরিবারের সবার মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। আমি তাকে আমার রুমাল হাদিয়া দেই, যার দ্বারা সে সাথে সাথে হিজাবের ন্যায় মাথা বেঁধে নিল। কালেমা পাঠ করার পর আমাকে তার সাথে বিকালে ঘুরতে যাওয়ার আবেদন করল। আমি তাকে পর্দা সম্পর্কে বুঝিয়ে দেই যে, তা সম্ভব নয়। অতঃপর সে বলল, তাহলে আমি আপনার সাথে খানা খাব।

আব্দুর রহমান বলল, আমরা আজ বিকালে খাবারের দাওয়াত করব, তুমি এসে মহিলাদের সাথে খাবে সে তাতে রাজী হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সে কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, আপনার আগমনের দ্বারা আমার বড় নিয়ামত নসিব হয়েছে। আপনি আমার উপর অনুগ্রহকারী। আমি আপনাকে জীবনে কখনও ভুলব না। অতঃপর সে আমার বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করল এবং বলল, সেই মহিলা কতইনা সৌভাগ্যবতী আপনাকে স্বামী হিসেবে পেয়েছে। আমি বললাম, না বরং আমি কত সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নেককার স্ত্রী দান করেছেন। সে বলল, আমার ইচ্ছা আপনার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করব। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে সাক্ষাৎ করার কোন সুযোগ হয়ে যেতে পারে। যদি দুনিয়াতে সাক্ষাৎ না হয়, তাহলে জান্নাতে অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর তাকে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় বুঝিয়ে দিব। প্রায় তিন ঘন্টা পর আলোচনা শেষ হয়।

আব্দুর রহমান বললেন যে, আমার মেয়েরা বলছে, এই যুবতী ইসলাম গ্রহণ করার ফলে এত খুশি হয়েছে যে, গোটা জীবনে সে এত খুশী হয়নি। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা আগামীতে তাকে উভয় জাহানে খুশী করুন, অনেক সময় হয়ে গেছে। তাই আমরা জাব্বুল শহরের মাদরাসাগুলো দেখার জন্য বের হই। বিকালে আব্দুর রহমানের বাসায় দাওয়াত খাই এবং পরের দিন চমকনত এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি।

চমকনত শহরে অবস্থান

রবিবার রওয়ানা হয়ে চমকনত পৌঁছি। এটা কাজাকিস্তান ও উজবেকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত এক বড় শহর। এখানে মেডিক্যাল কলেজও রয়েছে। যার মধ্যে পাকিস্তানের কিছু ছাত্র লেখাপড়া করছে। এই শহরের মসজিদে অবস্থান করি। মাগরিব নামাযের পর বয়ান করি। মুসলিম সাহেব ও আবদুল মজিদ সাহেব দুই বন্ধু সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হন। আব্দুল মজিদ সাহেব ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকুরি করেন। তার এক বাসা চমকনত শহরে আর এক বাসা তাশখন্দে রয়েছে।

তিনি অত্যন্ত সমাদরের সাথে আপ্যায়ন করলেন।

কাযী বায়যাবী রহ. এর মাযার

আব্দুল মজিদ সাহেব আসরের নামাযের পর মদিনাতুল বায়যা বা বায়বা শহর দেখার প্রস্তাব করেন। এই শহরে প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির আল্লামা কাযী বায়যাবী রহ. এর মাজার রয়েছে। এই শহরে হাজার হাজার ওলামা জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কাযী বায়যাবী রহ.-এর নাম তাদের সুখ্যাতি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

কাযী বায়যাবী রহ. তার সময়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এক বড় আলেম ছিলেন। একবার কাযীর পদ শূণ্য হয়, তাই তার অন্তরে এই পদ গ্রহণ করার আগ্রহ জাগল। তখনকার বাদশাহ এক শায়খে কামেলের সাথে সম্পর্কে রাখতেন। কাযী সাহেব ভাবলেন, যদি এই শায়খের দ্বারা আমার পক্ষে সুপারিশমূলক কিছু লিখিয়ে নিয়ে যাই তাহলে বাদশাহ আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ দিতে পারে। তাই কাযী সাহেব শায়খের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের চাহিদা ব্যক্ত করলেন। তিনি হাকিমকে উদ্দেশ্য করে একটি চিরকুট লিখে দেন। বাদশাহ পাঠ করে সাথে সাথে কাযী সাহেবকে কাযীর পদে নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন পর বাদশাহ তাকে চিরকুটটি দেখালেন। এর মধ্যে লেখা রয়েছে' পত্রবাহক খুব ভাল মানুষ। জাহান্নামে এক মুসাল্লাহ পরিমাণ স্থান চাচ্ছে। তাকে সাহায্য করুন।

এই শব্দগুলো কাযী সাহেবের উপর বিরাট প্রভাব ফেলল, তার হৃদয় রাজ্যে পরিবর্তন এসে গেল। দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে সরে গেল এবং আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য তৈরি হতে লাগলেন। কাযীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। অতঃপর তাফসীরে বায়যাবী লিখেন, যা ওলামাদের কাছে খুবই সমাদৃত হয়ে গেল। ফেরার পথে আব্দুল মজিদ সাহেব আলেমদের এমন এক স্থানে নিয়ে গেলেন, যেখানে হযরত খাজা আহমদ ইউসুফী রহ.-এর পিতা-মাতা সমাধিস্থ রয়েছেন। ঈসালে সওয়াব করে আমরা চমকত ফিরে আসি। আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার এক নাস্তিক ছিল। সে রাস্তায় মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে তর্ক শুরু করে দিল এবং ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের কটূক্তি করতে লাগল। মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমান

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। এক পর্যায়ে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করে মূল বিষয়টি অনুধাবন করি। আমি বললাম, আপনারা দু'জন চুপ থাকুন এবং আমাকে তার সাথে কথা বলার সুযোগ দিন। আর আপনি শুধু তরজমা করুন। কিছুক্ষণ তার সাথে কথা বলি এবং সাথে সাথে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করি। সে চুপ করে সমস্ত কথা শুনতে লাগল। অতঃপর আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। আমি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাকে সন্তোষজনক উত্তর দেই। ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে গেল। আমি তাকে বললাম ইসলাম গ্রহণ কর। সে বলল, অন্তর দিয়ে ইসলাম কবুল করেছি। কিছুদিন পরে প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করব।

এতদিন আমি নাস্তিক ছিলাম। আর এখন পুরোপুরি মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা আমার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমি বললাম, এখন কালেমা পড়ে নাও এবং কারো কাছে তা প্রকাশ করো না। সে বলল, এই কথা কোথায় কিভাবে লুকিয়ে রাখব? আমি বললাম, এ সুযোগ তো সব সময় আসে না। সে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমানের চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। ট্যাক্সি থেকে নেমে সে আমাদের সাথে এমনভাবে মিলিত হল যে, যেন আমরা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাওলানা বললেন, হযরত! আপনি তো আমাদের জন্য বরকতের কারণ। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার ধারণা অনুযায়ী বানিয়ে দিন আমার কোন বুযুর্গী নেই, বরং তা হচ্ছে নিসবাতের নূর যা পাথরসম অন্তরকেও মোমের ন্যায় গলিয়ে দেয়। পরের দিন আমরা তাশখন্দে সিয়াহত হোটেলে পৌঁছি। মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আবু উসমানকে বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে তিন দিনের ছুটি দেই। এ সময় আব্বাস খানের পরামর্শে মস্কো যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

পঞ্চম অধ্যায়

রাশিয়া সফর

১৭ জুলাই ১৯৯২ইং আমরা বিমানযোগে তাশখন্দ থেকে রওয়ানা হয়ে মস্কো এয়ারপোর্ট পৌঁছি। আমরা চারজন ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী। আমি পাকিস্তান থেকে, মাওলানা আব্দুল্লাহ তাজাকিস্তান থেকে, আবু উসমান উজবেকিস্তান থেকে এবং আমীরে তৈমুর কাজাকিস্তান থেকে।

পাসপোর্ট চেকিংকালে অফিসার আমাদেরকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সে আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে পাশের রুমের অন্য অফিসারের সাথে কথা বলতে চলে গেল। আমরা বিশ মিনিট অপেক্ষমান ছিলাম। অতঃপর সে তার সিটে বসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা চারজন চার দেশের লোক। পরস্পরে কীভাবে বন্ধু হলেন? আমি বললাম, আমি আমাদের বুযুর্গানে দীনের মাজারসমূহ যিয়ারত করতে এসেছি। তাই আমার দোভাষী প্রয়োজন ছিল, পর্যায়ক্রমে চার দেশ থেকে চারজন দোভাষী পেয়ে যাই। অতঃপর আমরা ভাবলাম, মস্কো সফর করে আসি। তাই এখানে আসলাম। সে বলল, কতদিন পর ফিরে আসবেন? আমি বললাম, আনুমানিক একমাস পর। সে পাসপোর্টে সীল মেরে দিল এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। মাওলানা আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আমরা কি ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি? আমি তাকে বলালম, মাওলানা! আমরা নাস্তিককে এমন জওয়াব দিয়েছি, যা তার বুঝে আসে। কুরআন শরীফে তাই ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ سِيْرُوا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

বলে দিন! তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর। অতঃপর প্রত্যক্ষ কর মিথ্যাবাদীদের পরিণাম।

কথা বলার সময় এই আয়াত আমার মস্তিষ্কে ছিল। আমরা পুরো রাশিয়া সফর করে কমিউনিস্টদের অবস্থা পর্যালোচনা করব এবং তাদেরকে দীনে ইসলামের দাওয়াত দিব মাওলানার আমার জওয়াব ততক্ষণে বোধগম্য হল। বাস্তবেই ওলামাদের দৃষ্টিতে প্রতিটি ছোট বড় কথা ধরা পড়ে।

মদখোর যুবতী

পাসপোর্ট চেক করার পর আমরা আমাদের মালামাল নিয়ে এলাম। অতঃপর লাইনে দাঁড়িয়ে কাষ্টমস্ অফিসারদের সামনে এলাম। তারা আমাদের মালামাল খুব

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেক করল। কিন্তু ফকিরদের মালামাল, তাদের কি দেখার আছে? এ সব কাজ সমাধা করে আমরা এয়ারপোর্টের বাইরের গেইটের দিকে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তায় মধ্যে এক যুবতীকে শোয়া অবস্থায় দেখতে পেলাম। যার অর্ধেক শরীর থেকে কাপড় খুলে গেছে। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে বললাম, মাওলানা ! এই মহিলাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। কাউকে বলুন তাকে উঠিয়ে কাপড় ঠিক করে দিতে। মাওলানা বললেন, হযরত! এই যুবতী অতিরিক্ত মদ পান করে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে আছে। তাই এর প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

যখন নেশা কেটে যাবে, তখন সে নিজে উঠে বাসায় চলে যাবে। আমি একথা শোনে হতবাক হয়ে যাই। তখন মাওলানা আব্দুল্লাহকে বললাম, আমার এক উক্তি স্মরণ হয়, মদখোর ঐ বেকুফকে বলে, যে টাকা খরচ করে লাঞ্ছনা খরিদ করে। প্রবাদ রয়েছে যে, মদপান করার অভ্যাস এবং ভদ্রলোকের বন্ধু বৃদ্ধিই পায় কখনো কমে না। মদখোর কেউ লাখপতি হলেও খুব দ্রুত সে দরিদ্র হয়ে যায়। ফলে সে এক সময় সামান্য খাদ্য ও পোশাকের জন্য কাতরাতে থাকে।

ইটলির প্রসিদ্ধ ডাঃ ফারেস এর উক্তি, তিনি বলেন, যদি মদ না হত তাহলে অর্ধেক পাপ ও রোগ কম হত। এ কারণেই মদকে সকল পাপের মূল বলা হয়। মদপান করার ফলে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায় লজ্জা শরম কমে যায়। বোন মেয়ে ও স্ত্রীর পার্থক্য ধ্বংস হয়ে যায়। অসভ্য ভাষায় গালাগালি করা স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। পরিশেষে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে। বাস্তব সত্য কথা হল, সমুদ্রে এত মানুষ ডুবে মারা যায় না। যত মানুষ নেশাগ্রস্থ হয়ে মারা যায়। এ কারণেই ইসলাম মদকে নাপাক বলেছে এবং পান করা হারাম ঘোষণা দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় মসজিদের করুণ অবস্থা

এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে ট্যাক্সিযোগে পার্শ্ববর্তী রেলস্টেশনে পৌছি। মস্কোতে ভূ-গর্ভস্থ রেলগাড়ীর সফর। দুনিয়ার উন্নতি প্রযুক্তিসমূহের মধ্যে এক উন্নত প্রযুক্তি। এটাকে মেট্রিক স্টেশন বলা হয়। আমরা মেট্রোযোগে সফর করে কেন্দ্রীয় মসজিদের কাছে পৌছি। বের হয়ে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাওয়া শুরু করি। একটু সামনে অগ্রসর হতেই এক রুশ লোক আমার কাছে এসে বলতে লাগল, আপনার মালামাল আমার কাছে দিন, আমি উঠিয়ে দিয়ে আসি। আমি তার কথাকে স্বাভাবিক মনে করে পাত্তা দেইনি। কিন্তু এই লোক নাছোড়বান্দা। আমরা সামনে বাড়তে ছিলাম আর সে মালামাল উঠানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এক পর্যায়ে সে আগলে দাঁড়িয়ে গেল এবং রুশ ভাষায় কী যেন বলতে লাগল। মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, এই লোক বলছে, আমাকে মালামাল উঠাতে দিন, আমাকে পয়সা দিতে হবে না। আমি বললাম, তাহলে সে

মালামাল উঠাতে চাচ্ছে কেন? সে বলল, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কিন্তু আপনাদের মালামাল উঠিয়ে আমি খুশি হব।

অতঃপর কিছু মালামাল আমি তাকে দিলাম। সে মাল উঠিয়ে বলল, আপনারা কি মসজিদে যাবেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ! সে বলল, তাহলে আমার সাথে আসুন। আমি আপনাদেরকে মসজিদে পৌঁছে দিব। মসজিদে পৌছে বুঝতে পারলাম জামাআত হচ্ছে। তাই আমরা নতুন অযু করে নিজেদের নামায জামাআতের সাথে আদায় করি। তখন মসজিদের অনেক মুসল্লীরা আমাদেরকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছিল। নামায শেষে মাওলানাকে বললাম, ইমাম ও খতীব সাহেবের সাথে মুলাকাত করে আসুন। তিনি তাদের সাথে মুলাকাত করে এসে জানালেন যে, মসজিদের ইমাম ও খতীব দাড়িবিহীন, গলায় টাই বাঁধা, তবে মাথায় পাগড়ী বাঁধা আছে। মসজিদে শুধু জুমআর নামায ও জোহরের নামায হয়। অন্যান্য নামায গুরুত্ব দেওয়া হয় না, বরং মসজিদে তালা দিয়ে রাখা হয়। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, অন্যান্য নামাযে জামাআতের গুরুত্ব দেওয়া হয় না কেন? ইমাম সাহেব বললেন, আমার ডিউটি সকাল থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত। এ সময়ে যোহরের নামাযের সময় হয় বিধায় যোহরের নামায পড়ে আমার দায়িত্ব আদায় করি। মাওলানা আসতাগফিরুল্লাহ বলে আমাদের কাছে দৌড়ে চলে আসেন এবং বলেন হযরত! আমার সন্দেহ হয় এই ইমাম কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণার লোক। তাকে এখানে নিয়োগ দিয়েছে, তার পিছনে আমাদের নামায হবে না। তাছাড়া মসজিদে অবস্থান করাও সম্ভব নয়। কেননা দুপুর তিনটা থেকে পরের দিন সকাল সাতটা পর্যন্ত মসজিদে তালা লাগানো থাকে। তবে নিকটেই এক ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে। এটাতে পাঁচ ওয়াকতে নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। আপনি অনুমতি দিলে আমরা সেখানে চলে যেতে পারি। আমি মসজিদের বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং আমলের বিপর্যয় দেখে আফসোস করি। এরপর ঐতিহাসিক মসজিদের দিকে রওয়ানা করি।

ঐতিহাসিক মসজিদে অবস্থান

ঐতিহাসিক মসজিদে পৌঁছে জানতে পারি, পাশেই মুসলমানদের বসবাস রয়েছে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। এই মসজিদটি দেড়শত বছরের পুরাতন। আগ্রাসনের সময় কমিউনিস্টরা মসজিদের ইমাম ও চৌদ্দজন লোককে সুযোগ বুঝে শহীদ করে দিয়েছিল। কিছুদিন পর মসজিদে ছাপা মেশিন স্থাপন করল এবং মসজিদের ভিতরের সুন্দর টাইলসগুলো উঠিয়ে রেলওয়ে স্টেশনের বিল্ডিং-এ লাগিয়ে দিল। স্বাধীনতা লাভের পর মসজিদে তা নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। এই মসজিদের কাছেই ক্রেমলীন প্রাসাদ অবস্থিত। যদি লাউড স্পিকার লগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আযানের আওয়াজ কুফরের দূর্গে পৌঁছে যাবে।

মসজিদে প্রবেশ করে ইংল্যান্ডের এক তাবলীগ জামাতকে দেখতে পাই। তাদের দু'জন সাথী আমাদেরকে দেখে অগ্রসর হয়ে আমাদের মালামাল নিয়ে গেল এবং মসজিদের অভ্যন্তরে সীমিত একটি ছোট কামরায় নিয়ে রাখল। আসরের নামাযের সময় ঘনিয়ে এসেছিল, আমরা অযু করে নামাযে শরীক হই। নামাযের পর মুসল্লীরা আমাকে দেখে সংক্ষিপ্ত বয়ান করার আবেদন করল। আমি তাদের অনুরোধ রক্ষা করি। এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল যে, এক শায়খ মসজিদে অবস্থান করছেন। আগত লোকদের ভীড় লেগে গেল।

জামাআতের লোকজন যখন আগত লোকদের ইস্তেকাল করতে গেল তখন তারা বলল, আমরা তো পীর সাহেবের সাথে মুলাকাত করতে এসেছি। ইশার নামায পর্যন্ত এক মাহফিল হয়ে গেল।

লোকজন মাওলানাকে সফরের হালাত জিজ্ঞাসা করতে লাগল এবং মাওলানা অত্যন্ত সুন্দর করে তার প্রত্যক্ষ করা ঘটনাবলী ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে লাগলেন। তাবলীগ জামাতের লোকজন চুপ করে লোকদের আসা-যাওয়া প্রত্যক্ষ করছিল। পরের দিন যোহরের নামাযের পর জামায়াতের আমির সাহেব প্রস্তাব করলেন যে, আজ কিছু সময় তাবলীগ জামায়াতের সাথীদের সাথে কাটাতে হবে। আমি বললাম, "আমাদের চোখ আলোকোজ্জ্বল হোক। আমাদের অন্তর আনন্দিত হোক।"

অতঃপর ইশার নামাযের পর তাবলীগ জামাআতের সাথে মুলাকাত করার জন্য গমন করি। তারা আমাকে হাদিয়া দিল। আমি ভাবলাম এই মহব্বতের জওয়াব 'কালবী ফয়েজ' দিয়ে দিতে হবে। সুতরাং সকল সাথীদেরকে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করি। জামায়াতের আমীর সাহেব বললেন, আমাদের সাথীরা আপনার বয়ান শুনতে আগ্রহী। আমি তার অনুরোধ রক্ষার্থে পরিচ্ছন্ন অন্তর ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার গুরুত্বের উপর বয়ান করি। আলোচনা এত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে, উপস্থিত সবাই কাঁদতে শুরু করে দিল। বয়ান শেষে আমীর সাহেব বললেন, আমাদের সাথীরা আপনার কাছে বায়আত হতে চাচ্ছে। সুতরাং সবাইকে বায়আতের কালেমা পাঠ করিয়ে যিকির ও মুরাকাবার পদ্ধতি বলে দিলাম।

এক সাথী বলল, হযরত! রূহানিয়ত এর প্রতিক্রিয়া তো আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পেরেছি। আজ তিনদিন যাবত আমরা এই মসজিদে অবস্থান করছি, গাশ্ত করেছি, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছি কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যেসব লোক আপনার হাতে তওবা করেছে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোককে মসজিদে আনতে পেরেছি। আমি বললাম, এ কারণেই হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. বলেছেন, যদি তোমরা মাখলুকের উপর এক ছটাক

মেহনত কর, তাহলে নিজের উপর এক মণ মেহনত কর। এক সাথী বলল, হযরত! যিকির তো আমরাও করি, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হয় তাৎক্ষণিক, স্থায়ী হয় না। আমি বললাম, নিজে নিজে যিকিরের দ্বারা ফায়দা বেশি হয় না। এ কারণেই যিকির শিখতে হয়। আমি একবার রায়বেন্ড এর তাবলীগী ইজতেমায় হযরত মুফতি যয়নুল আবেদীন মা. জি. এর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন শায়খ থেকে যিকির না শিখে যিকির করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাবলীগ জামাতে কিছুই পাবে না। জামাতের সবাই সমস্বরে বলে উঠল এ কারণেই তো আমরা আপনার কাছ থেকে যিকির শিখেছি। আমি বললাম, 'আমি তো শুধুমাত্র আপনাদের একজন খাদেম। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এই মাহফিল চলছিল, অবশেষে আমি ইজতেমায়ী দু'আ করে ঘুমাতে চলে যাই।

চতুর্থ হীরকের দর্শন লাভ

রবিবার যোহরের নামাযের পর আমরা খানা খাচ্ছি। ইতোমধ্যে এক সুদর্শন যুবক হাতে একটি বোতল নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। আমি তাকে দেখে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বলে ফেলি, তুমি আমার জন্য পানি আনতে বিলম্ব করেছ। সে মুচকি হেসে আমার সাথে মিলিত হল এবং বলল, হযরত! আমি আপনাকে একটি আশ্চর্যবোধক কথা শোনাব। আমি বললাম, খুব ভাল। সে বলল, শুরুতে আমার পরিচয় দেওয়া সমীচীন মনে করি। আমার নাম রাবেল তাজউদ্দিন, আমি কয়েক বছর এয়ারফোর্সে চাকুরি করেছি। বর্তমান ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিক-এর কাজ করি। শুক্রবারে মসজিদে যাওয়ার পথে আপনাকে দেখেছি, তখন এক রুশ লোক আপনাদের মালামাল উঠিয়ে মসজিদে পৌঁছে দেয়। তখন আমি আপনাদের পিছনে পিছনে গিয়ে আপনার প্রতিটি কাজ কর্ম তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করি। আমি এই রুশ লোককে কখনও কারো সাথে উত্তম আচরণ করতে দেখিনি। আপনাদের সাথে তার আচরণ প্রত্যক্ষ করে তখনই ভাবলাম যে, আপনি কোন কামেল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন এবং নামাযের পর মুলাকাত করার ইচ্ছা করি।

আমি নামায আদায় করার পর আপনারা চলে যান। আমি লোকদের কাছে আপনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইনি। মুলাকাত না করতে পেরে আমার আফসোস হচ্ছিল। ফলে রাতে চোখে একটুও ঘুমও আসেনি। এক সপ্তাহে ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। তাই আজ ঐতিহাসিক মসজিদে নামায পড়ার ইচ্ছা করি। পথিমধ্যে এক লোক পানির বোতল বিক্রি করছিল। আমি একটি বোতল ক্রয় করি। ভাবলাম যদি আপানাদের সাথে মুলাকাত হয়, তাহলে হাদিয়া প্রদান করব। মসজিদে প্রবেশ করতেই আপনি আমাকে দেখে বলতে লাগলেন, তুমি আমার জন্য পানি আনতে বিলম্ব করেছ। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, আপনি এই কথা কীভাবে বলতে পারলেন? ফলে আপনার সাথে আমার আন্তরিক

মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। মাওলানা আব্দুল্লাহ তাকে উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানের সকলের বিভিন্ন ঘটনাবলী রুশ ভাষায় শোনালেন। তখন সে বলল, আমাকেও বায়আত করে নিন। আমি তাকে বায়আতের কালেমা পাঠ করলম। তাতারী বংশোদ্ভূত এই যুবক মস্কোর জামাতে নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয় হাবিবিয়ার প্রথম সালেক (মুরিদ)। তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সিলসিলার অধিক প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করে দেন।

না, না করে ঘনিষ্ঠতা...... !!!

ঐতিহাসিক মসজিদের সংলগ্ন খতীব সাহেবের অফিস ও মেহমানখানা। এতে এক-মহিলা চাকুরি করে। এই মহিলা লোকদের থেকে আমার সম্পর্কে জানতে পেরে তার ছেলেকে মসজিদে পাঠানোর ইচ্ছা করল, যেন তার ছেলে সঠিক পথে ফিরে আসে।

মস্কো যুবকদের জন্য এমন আকর্ষণীয় ফাঁদ পেতে রেখেছে যে, তাতে ফেঁসে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যুবকরা মসজিদে আসতে অস্বস্তিবোধ করে।

মহিলা মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলেন, মাওলানা তাকে তার ছেলেকে যোহরের নামাযের পর মসজিদে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলে দেন।

আমরা যোহরের নামাযের পর মসজিদে বসে উপদেশমূলক আলোচনায় মগ্ন ছিলাম, তখন এক সুদর্শন যুবক মসজিদে প্রবেশ করে আমাদের বৈঠকে বসল। আলোচনা শেষে এই যুবক ইংরেজী ভাষায় তার পরিচয় দিতে লাগল। সে বলল, আমি কম্পিউটারের শিক্ষা অর্জন করেছি, ইংরেজী ভাষা জানি, পাশ্চাত্যের কৃষ্টি কালচার পছন্দ করি, আমার নাম আদ্দার। আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে জীবন অতিবাহিত করছি। আমার মাতা খতীব সাহেবের অফিসে চাকুরি করেন। তিনি আমাকে এখানে জোরপূর্বক পাঠিয়েছেন। আমি ভাল হতে চাই তবে অধিক নই। আপনাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে যে, আপনার কথাবার্তা আমার মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে, যার ফলে আমি আমার গার্লফ্রেন্ডদের ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হব। সুতরাং দু'একদিন আপনার সাথে মুলাকাত করতে আসব। তবে আপনার বেশি নিকটবর্তী হব না।

আমার হাসি পাচ্ছিল এবং তার পাগলামী দেখে আশ্চর্য লাগছিল। তার বৃত্তান্ত শুনে আমি বললাম, তোমার আম্মার নির্দেশে এখানে আগমন করেছ, এখন ফিরে যাওয়া তোমার ইচ্ছাধীন নয়। আল্লাহ তাআলা তোমাকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এখানে প্রেরণ করেছেন।

قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھا یاجاتے ہیں

(নিজের ইচ্ছায় কিছু করা যায় না বরং করানো হয়।)

সে আমার কথা শুনে বলতে লাগল, আমি কি বাস্তবেই অধিক ভাল হয়ে যাব! তাহলে আমার বন্ধুদের কী অবস্থা হবে? আমি বললাম, উত্তম বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যাবে তখন।

সে ঘাবাড়িয়ে গেল এবং বলল, আমার ভয় হচ্ছে যে, বাস্তবেই আমার অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আমি ভাল হয়ে যাব। আমি বললাম, তুমি কি চাও! সে বলল আমি ভাল হতে চাই কিন্তু অধিক ভাল নই। আমি বললাম, অধিক ভাল হওয়ার উদ্দেশ্যে কি? সে বলল নামায আদায় করব বটে কিন্তু গার্লফ্রেন্ডদেরকে ত্যাগ করতে পারব না।

আমি বললাম, তোমাকে কিছু অজীফা পাঠ করতে বলে দিব, তাহলে তোমার আত্মার প্রশান্তি অর্জিত হবে। সে বলল, না। আমি কোন অজিফা পড়তে পারব না, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি অধিক ভাল হয়ে যাব। আমি একটু থেমে বললাম, ঠিক আছে। অল্প সময় মুরাকাবা কর, অতঃপর দু'আ করে চলে যাও। সে বলল, মুরাকাবা কীভাবে হয়? আমি বললাম, এখনই তোমার সামনে করছি। সে বলল খুব ভালো।

যখন মুরাকাবার মধ্যে তার অন্তরে তাওয়াজ্জুহ দিতে লাগলাম, তখন সে ঝিমাতে লাগল এবং জোড়ে জোড়ে আল্লাহ আল্লাহ বলতে লাগল। মুরাকাবা শেষে সে বলল, আপনার সিনা থেকে আমার সিনায় কোন আলো আসছে অনুভব হচ্ছিল। এখনও আমার অন্তরে এক প্রকার প্রশান্তি অনুভব হচ্ছে। আমাকে বায়আত করুন। আমি বললাম, না, তোমাকে বায়আত করা যাবে না। সে বলল, কেন? আমি বললাম, সর্বপ্রথম তোমার গার্লফ্রেন্ডদেরকে ত্যাগ করতে হবে। সে বলল, এখন আমার এত প্রশান্তি অর্জিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করা আমার জন্য সহজ ও সাধারণ ব্যাপার মাত্র।

অতঃপর তাকে বায়আত করলাম। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে দীনের বহু খেদমত গ্রহণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে অনেক তরুণ-তরুণী সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। আমি যখন তার সাথে মিলিত হতাম তখন তার নিঃসঙ্গতা দেখে মুচকি হেসে বলতাম–

نان نان کرتے کرتے پیار کربیٹھے

(না, না, করে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে বসেছ।)

সে রুশ ভাষায় এর জবাবে বলত তার উর্দূ ভাবার্থ এ রকম–

وهی هوتا هے جو منظور خدا هوتا هے

(আল্লাহ তাআলা যা মঞ্জুর করেন তাই হয়ে থাকে।)

আমি তার মাকে বললাম। তোমার ছেলে যুবক, তাকে বিবাহ করিয়ে দাও। অতঃপর এক এম. বি. বি. এস ডাক্তার যুবতীর সাথে তার বিবাহ হয়। যখন স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হত তখন স্বামী তার বায়আত হওয়ার ঘটনা খুব মজা করে স্ত্রীকে শুনাত এবং বলত যখন আমি অশ্লীল প্রেম থেকে তওবা করেছি তখন থেকে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে প্রশান্তি নামক নিয়ামত দান করেছেন। এখন প্রতিনিয়ত আমার অধিক ভাল হওয়ার তামান্না।

এক সাধুর ইসলাম গ্রহণ

১৯ জুলাই ১৯৯২ ফযরের নামাযের পর পাকিস্তানে টেলিফোন করার কথা। এজন্য মস্কো সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জে যাওয়া জরুরী ছিল।

রাশিয়া থেকে বহির্বিশ্বে টেলিফোনে যোগাযোগ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। প্রথমত কল বুক করতে হয়। অতঃপর অপারেটর দিন ও সময় নির্ধারণ করে দেয়। মূলত এত নিয়মনীতি নির্ধারণ করার পেছনে কারণ হল যে, প্রত্যেকটি কল নেগরানী করা হয়, যেন কেউ দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বহির্বিশ্বে প্রচার না করে দেয়। আমরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে প্রবেশ হয়ে দেখি, দু'পাশে ছোট ছোট কেবিন রয়েছে। এক পাশে দশ বারজন অপারেটর বসা আছে। লোকজন কল বুক করার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যখন পালা আসে তখন অপারেটর কেবিন নাম্বার বলে দেয়, সেখানে গিয়ে ফোন করতে হয়। আমার পাকিস্তানী বন্ধু বললেন, হযরত! আপনি অপেক্ষাগারে বসুন, আমি লাইনে দাঁড়িয়ে কেবিন নাম্বার নিয়ে আসি। তখন আপনি কেবিনে গিয়ে কথা বলবেন। আমি অপেক্ষাগারে একটি চেয়ারে বসলাম।

অন্যান্য লোকজনও আমার পাশে বসা ছিল। রাশিয়াতে যদি কেউ গায়রে মাহরাম মহিলাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে চায় তাহলে তাকে পুরুষদের থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে হয়। কেউ যদি পুরুষদের দিকে চোখ তুলে তাকায় তাহলে মহিলাদের থেকে চোখ ফিরানো অসম্ভব। মহিলাদের দিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দৃষ্টি পড়বেই। একমাত্র সর্বদা যার দৃষ্টি নিচের দিকে রাখার অভ্যাস আছে সেই কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম হবে। যার এদিক সেদিক তাকানোর অভ্যাস রয়েছে, সে কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

আমি আমার চারপাশে যখন রুশ বংশোদ্ভূত লোকদের ভীড় দেখলাম, তখন চোখ বন্ধ করে মুরাকাবা করতে লাগলাম। অপেক্ষারত অবস্থায় কুদৃষ্টি থেকে নিজের চোখ হেফাজত হয়ে গেল। মুরাকাবা অবস্থায় কয়েক মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ অনুভব হল, আমার পাশে বসে কেউ আমার অন্তরে তাসাররুফ করছে। কিছুক্ষণ এই অবস্থাটাকে স্বাভাবিক ভাবলাম। কিন্তু তার তাওয়াজ্জুহর প্রতিক্রিয়া অনুভব হচ্ছিল। আমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি পাশের চেয়ারে বসে

এক যুবক সাধু আমার দিকে ফিরে চক্ষু বন্ধ করে তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছে। আমি পাল্টা তাকে তাওয়াজ্জুহ দিলাম সে চোখ খুলে তাকাল। আমি ইশারা করে জিজ্ঞাসা করলাম, কী করছ? সে মুচকি হাসি দিয়ে তাওয়াজ্জুহ দেওয়া ছেড়ে দিল। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে ডেকে বললাম, এই যুবক আমার পাশে বসে ক্ষতি করছে, তার পরিচয় নেন, সে কে?

মাওলানা আব্দুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল আমি চিকুসোলাকিয়ার অধিবাসী। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম প্রচার করি। প্রায় একশত যুবক আমার শিষ্য রয়েছে। আমার স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণ করতে মস্কো এসেছি। এই লোককে বসা অবস্থায় দেখে তার অন্তর তাসাররুফ করার চেষ্টা করি। কিন্তু সে পাল্টা আমাকে এমন তাওয়াজ্জুহ দিয়েছে যে, এখন আমাকে সম্পূর্ণ শূন্য অনুভব হচ্ছে। আপনি এই লোককে জিজ্ঞেস করুন, সে আমার অবস্থা রহিত করেছে কেন? মাওলানা আব্দুল্লাহ আমাকে পুরো বৃত্তান্ত শোনালেন। তখন আমি বললাম, সর্বপ্রথম সেই তো আমাকে তাসাররুফ করার চেষ্টা করেছে তাই আমি তার তাসাররুফ প্রতিহত করেছি মাত্র। সে মাওলানা আবদুল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। আমি মাওলানাকে তার অবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, আপনি তাকে বলুন যে, আমরা মসজিদে অবস্থান করছি, তুমি আমাদের সাথে মসজিদে চল, তাহলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করতে পারব।

সে বলল, 'আমার স্ত্রী আমার সাথে রয়েছে, আমি বললাম, তাকে সাথে নিয়ে চল। ইতোমধ্যে টেলিফোন করার সুযোগ হয়ে গেল। তাই আমি পাকিস্তানে ফোন করে কয়েক মিনিট কথা বলে বাড়ির সংবাদ জেনে নেই।

ফোন করার পর আমরা ঐতিহাসিক মসজিদের দিকে রওয়ানা করি, আমাদের সাথে সাধু ও তার স্ত্রীও রওয়ানা হল। তাদেরকে মসজিদের সংলগ্ন একটি কামরায় বসিয়ে দেওয়া হল। নাশতা শেষে মাওলানাকে বললাম, আমরা যুবককে দীনের দাওয়াত দিব। কিন্তু প্রথম সমস্যা দেখা দিল, সে শুধু চিকুসোলাকিয়ার ভাষা বুঝে তার সাথে রুশ ভাষায় কথা বলা যাচ্ছিল না। আমি মাওলানাকে বললাম, জেনে নিন সম্ভবত তার স্ত্রী রুশ ভাষা জানে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, তার স্ত্রী রুশ ভাষা জানে। দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল, মাওলানা আরবী ও উজবেকী ভাষা বুঝে কিন্তু রুশ ভাষায় এখনও পুরোপুরি দখল আসে নি। অতঃপর আবু উসমানকে ডাকা হল। অবস্থা এই দাঁড়াল যে আমি আরবী ভাষায় কথা বলি, মাওলানা উজবেকী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং আবু উসমান উজবেকী ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদের এই ধারাবাহিকতায় মূল কথা সাধুর অন্তরে কীভাবে পৌঁছে গেল কারো জানা ছিল না-কিছুক্ষণ আলোচনার পর যুবক সাধু দ্বিতীয়বার আমার

দিলে তাসাররুফ করতে লাগল। আমি তাকে বললাম, মিয়া আমাদের সম্পর্ক কামেল বুযুর্গদের সাথে, তাসাররুফ করার যথাসাধ্য চেষ্টা কর। একথা বলে বাইরে চলে এলাম। সাধু এই স্থানে প্রায় আট ঘন্টা বসা ছিল। অবশেষে তার স্ত্রী তাকে পরামর্শ দিল যে, যেহেতু এই লোক তোমার অবস্থায় রহিত করে দিয়েছে এবং আট ঘন্টা পরিশ্রম করার সত্ত্বেও তোমার অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারনি, সেহেত তুমি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাও। সাধু তার সম্মতি ব্যক্ত করল, তার স্ত্রী মাওলানাকে বলল, আমরা উভয়ে এই শায়খের শিষ্য হতে চাই। মাওলানা বললেন, তাহলে তোমাদের মুসলমান হতে হবে। তারা বলল, আমরা মুসলমান হতে প্রস্তুত আছি। মাওলানা খুশীতে নেচে উঠলেন। আমি বললাম তাদেরকে গোসল করে আসতে বলুন। অতঃপর মসজিদে কালেমায়ে শাহাদাৎ পড়ানো হবে। যখন সাধুর স্ত্রী গোসলখানা থেকে গোছল করে বের হল, তখন মাওলানা তাকে তার সাদা রুমাল মাথায় উড়না বাঁধার জন্য দিয়ে দিলেন। সে রুমাল দিয়ে হিজাবের ন্যায় মাথা বেঁধে নিল, তা দেখে মাওলানা আশ্চর্য হয়ে গেল। যখন সে মসজিদে প্রবেশ করল, তখন খতীব সাহেব মসজিদে এসে গেলেন। তিনি এই মহিলাকে ইহরাম বাধা অবস্থায় দেখে পরিচয় জানতে চাইলেন। যখন জানতে পারলেন যে, তারা স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হবে, তখন তিনি সজোরে আল্লাহু আকবার বলতে লাগলেন।

আমি তাদেরকে কালেমা পড়িয়ে দীনের জরুরী কিছু বিষয় বলে দিলাম। স্বামী-স্ত্রী বলতে লাগল, আমরা আপনার সাথে সফর করব। অতঃপর তারা মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত আমাদের সাথে সফর করল। যুবক সাধু বলল, আমি শিষ্যদেরকে চিঠি লিখে দেব যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে আলো দেখিয়েছেন। তোমরাও মুসলমান হয়ে যাও! কিয়ামতের দিন আমি দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাই। এভাবেই এক সাধুর সফর (مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ) অন্ধকার থেকে আলোর দিকে শুরু হল।

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. তার কিতাবে লিখেছেন যে, যখন হিন্দুস্থানে আর্য সম্প্রদায়ের বিপ্লব মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল এবং যুগী ও হিন্দু পণ্ডিতরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে হিন্দু বানাতে শুরু করেছিল, তখন ওলামায়ে দেওবন্দ এই ফেৎনার মূলোৎপাটনের ফায়সালা করলেন। তাঁরা হিন্দুদের কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, তোমরা আমাদের সাথে মুনাজারা কর, যেন হক সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ মুসলমানদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে এবং তাদেরকে বেদীন করার কী অর্থ আছে? হিন্দু পণ্ডিতরা মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল তবে শর্ত সাপেক্ষে। শর্ত ছিল, যখন মুনাজারা শুরু হবে তখন তাদের গুরু ও পণ্ডিত সমাবেশের প্রথম কাতারে বসবে।

ওলামায়ে কেরাম তাদের শর্ত মেনে নিলেন। মুনাজারার দিন এত লোকের সমাগম হল যে, ময়দানে তিল ধারণের জায়গাটুকু অবশিষ্ট ছিল না। যখন মুনাজারা শুরু হল, তখন হিন্দু বক্তারা তাদের ধর্মের স্বপক্ষে ধুয়া-ধায়া বক্তৃতা দিল। যখন মুসলমান বক্তা তাদের বক্তব্যের প্রতিউত্তর দিতে দাঁড়ালেন, তখন ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং থতমত খেয়ে গেলেন।

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, তার জ্ঞান-বুদ্ধির উপর কোন প্রভাব পড়ছে। হিন্দু শ্রোতারা এই অবস্থা দেখে খুব আনন্দ উল্লাস করতে লাগল। মুসলমান এক শ্রোতা স্টেজের পিছনে গেলেন। যেখানে খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বসা ছিলেন, তার চারদিকে কিতাবাদির স্তুপ ছিল; প্রয়োজনবোধে যেন রেফারেন্স বের করে দেখানো যায়। সে হযরতকে বলল, মুসলমান বক্তাতো এমনভাবে ঘাবড়িয়ে গেছে, যেমনভাবে বাঘের সামনে ভয়ে-আতংকে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে। হযরত সাহারানপুরী রহ. সেখানে বসে মুরাকাবা করে কাশফের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, শ্রোতাদের প্রথম কাতারে বসে এক হিন্দু পণ্ডিত মুসলমান বক্তার উপর তাসাররুফ করছে। তাদের মধ্যে এক যুবক সাধু সবুজ কাপড় পরিধান করেছে, সেই এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। হযরত সাহারানপুরী রহ. এই যুবকের উপর তাওয়াজ্জুহ দিলেন। ফলে সে এমন অনুভব করতে লাগল যে, যেন তার শরীরে আগুন ধরে গেছে। অতঃপর সে অস্থির হয়ে সমাবেশ থেকে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হল। সে চলে যাওয়ার সাথে সাথে মুসলমান বক্তার পূর্বাবস্থা ফিরে এল, ফলে তিনি এমন প্রমাণ ও ক্রিয়াশীল বক্তৃতা প্রদান করলেন যে, হিন্দুরা তাদের পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। সমাবেশ শেষে সব সাধু মুখ কালো করে বাড়িতে চলে গেল। এরপর হিন্দু পণ্ডিতদের আত্মবিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে গেল এবং আর্য সম্প্রদায়ের বিপ্লব খতম হয়ে গেল। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغهٗ فاذا هوا ذاهقٌ

ইসলাম ধর্মের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। ফলে ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারীরা আহলে হক মুসলমানদের সামনে দাঁড়ানোর সাহস পায় না। মু'মিনের অল্প সময়ের তাওয়াজ্জুহ বাতিলের মেরুদণ্ডে বিজলীর ন্যায় পতিত হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, হক সালেকের তাওয়াজ্জুহ সাধুদের শত শত বছরের সাধনার উপর পানি ঢেলে দিয়েছে এবং তাদের হৃদয়রাজ্যের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক মসজিদে ঐতিহাসিক খুতবা

সাধুর ইসলাম গ্রহণের ফলে মাওলানা আব্দুল্লাহর খুশীর অন্ত ছিল না। তিনি ঐতিহাসিক মসজিদের খতীব হযরত মাহমুদ সাহেবকে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং সমরকন্দ ও বুখারার হালাত শুনালেন। হযরত মাহমুদ আমাকে

বললেন. আগামীকাল জুমআর নামাযের খুতবা আপনি দিবেন। আমি তার হুকুম শিরোধার্য করে নিলাম। জুমুআর দিন মসজিদ লোকে ভরপুর হয়ে গেল। আমি কুরআনের মর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়ে বয়ান করি, মাওলানা মাহমুদ সাহেব অনুবাদ করেন। আরবী খুতবা দেওয়ার সময় শ্রোতাদের উপর আল্লাহর বড়ত্বের এক আশ্চর্য প্রভাব পড়ল। হযরত মাহমুদ সাহেব তো উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। জুমআর নামাযের পর বায়আত করা হল। মুরাকাবা ও দুআ শেষে হযরত মাহমুদ সাহেব আমার সাথে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন, হযরত! আজ তো আপনি ঐতিহাসিক মসজিদে ঐতিহাসিক খুতবা প্রদান করলেন যদি বড় বড় স্পীকার লাগানো হত তাহলে আওয়াজ ক্রেমলীন পর্যন্ত পৌছে যেত।

ক্রেমলীনের ক্ষমতাবানদের উপর তাওয়াজ্জুহ

হযরত মাহমুদ সাহেব বললেন, হযরত ঐতিহাসিক মসজিদ থেকে একটু দূরেই রাশিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত। এই ভবনকে ক্রেমলীন বলা হয়। আপনি যদি দেখতে চান, তাহলে দেখাতে নিয়ে যাব। আমি সম্মতি জ্ঞাপন করে বললাম, অবশ্যই যাব। অতঃপর জুমআর নামাযের পর খাবার খেয়ে আমরা ক্রেমলীন দেখতে যাই। পাপাচারের পরিবেশ এবং পর্যটকদের ভীড় এত অধিক ছিল যে, আল্লাহ পানাহ দিক; আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে বললাম, আমরা এখানে এক স্থানে দাঁড়িয়ে এভাবে কথাবার্তা বলব, যেন আমরা খোশগল্পে ব্যস্ত আছি। আমি তোমাদের আড়ালে বসে মুরাকাবা করব এবং এখানকার ক্ষমতাশীলদের উপর তাওয়াজ্জুহ দিব, যেন তাদের অন্তরে ইসলামের বড়ত্ব ও মহত্বের অনুভব হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করে। মাওলানা মুচকি হেসে বললেন এখানেই তা করার যথোপযুক্ত স্থান, এর নামই তাসাউফ।

আমি যখন মুরাকাবা শুরু করলাম, তখন এক হিন্দু কৃষ্ণ আমাদের দিকে এল এবং মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এই ব্যক্তি কী করছে? আমি মুরাকাবা করে মাথা উঠানোর সময় সে আমাকে দেখামাত্র তার মাথা ঘুরে গেল। মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, আমাদের শায়খের সাথে মুলাকাত করতে এস। সে দূর থেকে হাত নেড়ে বলল, না। তোমাদের গুরু অত্যন্ত জবরদস্ত ব্যক্তি। মাওলানা হাসতে লাগলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করি। হাদীস শরীফে এসেছে, হুজুর সা. ইরশাদ করেছেন (نُصِرتُ بِالرَّعبِ) আমাকে প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। সেহেতু রাসূল সা.-এর প্রভাব এক মাস দূরত্বের রাস্তা পর্যন্ত অতিক্রম করত। সুন্নতের অনুসরণের বরকতসমূহের একটি এটাও যে সুন্নতের অনুসারী ব্যক্তিত্বের মধ্যেও এক প্রকার প্রভাব ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়।

মূলত এটা আল্লাহতাআলার এক শান যে, যে কেন্দ্রে ও ভবনে সত্তর বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হচ্ছিল, আজ কালের আবর্তনে সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার এক নগণ্য গোলাম এই ভবনের ক্ষমতাবানদের অন্তরে তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছে।

পঞ্চম হীরকের দর্শন লাভ

ক্রেমলীনের গেইটের সামনে এক গীর্জা রয়েছে, যার ইমারত নির্মাণ শিল্পের এক অপূর্বশৈলী। অধিকাংশ ছবির মধ্যে এটাকে দর্শনীয় স্থান হিসেবে দেখানো হয়। আমরা গীর্জার নিকটবর্তী হলে এক সুদর্শন যুবক আমার সাথে মুসাফাহ করল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে বসে কী করছেন? আমি বললাম, প্রথমে আপনি আপনার পরিচয় দিন, তারপর আমার পরিচয় দিব। সে বলল, আমার নাম উদহম। আমি ইউক্রেনের বাসিন্দা, কিছুদিন পূর্বে মস্কোতে এসেছি। আপনাকে এখানে বসা দেখে দূর থেকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করি। অতঃপর অন্তর সাক্ষী দিল যে, এই ব্যক্তির মধ্যে প্রভাব ও আকর্ষণ রয়েছে; তার সাথে মুলাকাত করা জরুরী। আমি বললাম, আমি খান্দানে নকশবন্দীয়ার এক নগণ্য গোলাম। নিজে আল্লাহ আল্লাহ করি এবং অপরকে আল্লাহ আল্লাহ করাই। সে বলল, 'আমাকে তা শিক্ষা দিন।' আমি বললাম, 'কিছুদিন আমাদের সাথে থাক, শিখে যাবে।' সে রাজী হয়ে গেল। অতঃপর মসজিদে পৌঁছে তাঁকে বায়আত করলাম এবং তার উদহম নামটি পরিবর্তন করে ইব্রাহিম আদহাম রেখে দিলাম। সে রুশ বংশদ্ভুত হওয়ার ফলে পুরোপুরি মুসলমান হয়ে গেল এবং কয়েক ডজন তরুণ-তরুণীর সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার মাধ্যম হয়ে গেল।

ইব্রাহিম আদহাম একদিন অত্যন্ত জোশের সাথে আমাকে বলল, হযরত! আপনি ক্রেমলীনের ক্ষমতাবানদের উপর এমনভাবে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করুন, যেন তারা মুসলমান হয়ে যায়, এমন কি যেন লেনিনগ্রাদ নাম পরিবর্তন করে ইসলামাবাদ রাখা হয়। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলার জন্য এ কাজ অসম্ভব কিছু নয়।

লেনিনগ্রাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

২০ জুলাই রাত এগারোটায় লেনিনগ্রাদগামী ট্রেনে আরোহন করি। রাশিয়াতে ট্রেনে দীর্ঘ সফর করা খুবই আরামদায়ক। যাত্রীদের জন্য ট্রেনে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। সীটগুলো অত্যন্ত আরামদায়ক ও পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বগীর যাত্রীদের দেখা-শুনার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা আছে। মনে হয় যেন বিমানে সফর করছি। প্রত্যেক সিটের রেজুলেশন হয়। অতিরিক্ত ভীড়ের কোন সমস্যা দেখা যায় না। গাড়ী নির্ধারিত সময়সূচীতে চলাচল করে। দু'এক মিনিটও ব্যতিক্রম হয় না।

আমরা সারারাত সফর করার পর পরের দিন সকাল আটটায় লেনিনগ্রাদ পৌঁছি। রাজকীয় ইমারত ও অফিসে আদালতের ক্ষেত্রে আমরা মস্কো ও লেনিন গ্রাদের মধ্যে কোন প্রার্থনা খুঁজে পাইনি। আমার বন্ধু মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব আমাদেরকে স্টেশন থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদে নিয়ে এলেন। কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমারত নির্মাণ শিল্পের এক নির্মাণশৈলী বৈ কি?

আমরা মসজিদে ঢুকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ে মাওলানা আব্দুল্লাহকে খতীব সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠাই। তিনি ফিরে এসে বললেন, খতীব সাহেবকে সরকারের চাটুকার অনুমান হচ্ছে। এখানে মসজিদ শুধু যোহর ও আসরের নামাযের জন্য খোলা হয়। খতীব সাহেবের বাসা মসজিদ থেকে কয়েক ফুট দূরে মাত্র। কিন্তু অন্যান্য নামাযের জন্য মসজিদ খোলার অনুমতি দেয় না। মাওলানা আরও বললেন যে, আমি আপনার পরিচয় প্রদান করেছি, সমরকন্দ-বুখারার হালাত শুনিয়েছি কিন্তু সে একটুও ভালবাসার আচরণ প্রদর্শন করেনি, বরং স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, আপনারা মসজিদে অবস্থান করবেন না। তবে আমি মুয়াযযিনকে আপনাদের জন্য মেহমানখানা খুলে দিতে বলে দিব। অতঃপর আমরা মসজিদের মেহমানখানায় স্থানান্তরিত হই। যোহরের নামাযে সহকারী খতীব ইমামতি করলেন। নামায শেষে মুসল্লীরা আমাকে দেখে কিছু সময় বয়ান করার অনুরোধ জানালেন। তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে কিছু সময় বয়ান করি।

শুরুতেই দু'জন লোক বায়আত হওয়ার আগ্রহ জানালেন। যখন খুতবা পড়ে বায়আত করতে লাগলাম, তখন সকল মুসল্লী পাগড়ী ধরে বায়আত হয়ে গেল। বায়আত করার সময় একথা আমার বারবার মনে হচ্ছিল যে, এ শহর লেনিনের নামে প্রসিদ্ধ। কয়েক বছর পূর্বেও নাস্তিকদের কেন্দ্র ছিল, আর আজ নকশবন্দীয়া সিলসিলায় নগণ্য এক গোলাম তওবা ও বায়আতের কালেমা পাঠ করাচ্ছে। মুরাকাবা ও দু'আর মাধ্যমে মাহফিল শেষ হয়। ইব্রাহিম আদহাম ও মাওলানা আব্দুল্লাহকে খাবার আনতে পাঠানো হল। গোটা শহরজুড়ে মুসলমানদের কোন দোকান ছিল না। আমি তাদেরকে ফল কিনে আনতে পরামর্শ দিলাম। তারা উভয়ে বাজার থেকে রুটি ও মাখন নিয়ে এলে, যা সবাই খুব মজা করে খেলাম।

লেনিনগ্রাদে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা মস্কো থেকেও বেশি। এটা নাফরমানদের কেন্দ্রভূমি। চারপাশে শুধু অশ্লীলতা ও ভ্রষ্টতাই বিদ্যমান। আমি আমাদের মাশায়েখদের তরীকায় এখানে বাতেনী তাওয়াজ্জুহর প্রতি খুব জোর লাগালাম। ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের সময় মসজিদ বন্ধ থাকে, আমরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মসজিদের বাইরের দরজার সামনে কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করতাম এবং কেঁদে কেঁদে দু'আ করতাম।

এক যুবক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, আমাদেরকে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কারা? মাওলানা আব্দুল্লাহ তাকে বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করলেন। অতঃপর যখন সে জানতে পারল যে, আমি লোকদেরকে আল্লাহ আল্লাহ শিক্ষা দেই, তখন সে সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করল। আমি তাকে বায়আত করি। তার উপর এত প্রভাব পড়ল যে, সে মাহফিল থেকে উঠে মসজিদের দরজায় গিয়ে চৌকাঠে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করে দিল। এই যুবকের বিনয় ও কাকুতি দেখে আমাদের অন্তরও কাতরাতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমরা সবাই কাঁদলাম। আমি এই যুবকের ওসীলা দিয়ে আমার গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করি। এই সময়টা আমার জীবনের এক স্মরণীয় সময়।

লেনিনগ্রাদের রাত

মাগরিবের নামায পড়ে আমরা অবসর হই। এতক্ষণে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আমাদের মেহমানখানা গ্রাস করে ফেলল। শীতল বাতাস এমনভাবে বইতে লাগল যে, বাইরে বের হলে দাঁতে দাঁতে লেগে আওয়াজ হয়। রাতের খাবার শেষে ইশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে যাই। তিন ঘন্টা পর আমার ঘুম ভাঙ্গে। বাইরে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনুভব হলো যে, ফর্সা হয়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ দেরী করলে ফজরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আমি ওযূ করি এবং সাথীদেরকে ঘুম থেকে জাগাই। মাওলানা বললেন, হযরত! এখানকার নামাযের সময় অনুযায়ী ফজরের সময় হওয়ার আরও সাত ঘন্টা বাকী আছে।

আমি বললাম, মাওলানা! বাইরে এমন আলোকিত হয়েছে যে, ছোট ছোট অক্ষরে লিখিত কিতাব খুব সহজভাবে পাঠ করা যাবে।

মাওলানা বললেন, হযরত! এখানে অন্ধকার রাত আসে না, সূর্য এমনভাবে অস্ত যায় যে, কিছু না কিছু আলো অবশিষ্ট থাকে।

আমি বললাম, ফোকাহায়ে কেরাম কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, ইশার নামাযের সময় হওয়ার নিদর্শন হল, আকাশে নক্ষত্র জ্বলে যাওয়া। মাওলানা বললেন, লেনিনগ্রাদে এই নিদর্শন পুরোপুরি পরিলক্ষিত হয় না। এখানে মাগরিবের সময় হওয়ার সাথে সাথে সুবহে সাদিক হয়ে যায়। বছরে কয়েক মাস এমন হয় যে, বাস্তবে ইশার নামাযের সময়ই হয় না। আমি বললাম, বাস্তবেই ওলামায়ে কেরাম এই অবস্থাকে সত্যায়ন করেছেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, জ্বী, হ্যাঁ! রাবেল তাজউদ্দিন বলে উঠলেন, তাহলে তো ইশার নামায পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বললাম, যেহেতু কুরআন শরীফে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আলোচনা এসেছে, সেহেতু সংখ্যা পুরো করা জরুরী। যদি কোন নামাযের সময় না আসে তবুও অনুমান করে আদায় করতে হবে, যাতে সংখ্যা পুরো হয়ে যায়। রাবেল

তাজউদ্দিনের এই আলোচনা বুঝতে কষ্ট হল। তাই আমি এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করি–

নামাযের সময়ের বিস্তারিত আলোচনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

انّ الصلوة كانت على المؤمنين كتا با موقوتا-

(নিশ্চয়ই মু'মিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে নামায ফরয করা হয়েছে।)

পুরো দুনিয়ায় সময়ের তিন অবস্থা হওয়া সম্ভব।

(১) প্রথম অবস্থা হলো যে, রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় আসে। এ অবস্থায় প্রত্যেক নামায তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা জরুরী।

রাত দিন ছোট বড় হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যদিও দিন বিশ ঘণ্টার হয় এবং রাত চার ঘণ্টা হয় অথবা দিন চার ঘন্টার হয় এবং রাত বিশ ঘণ্টার হয়। যদি সময় পরিবর্তিত হয় এবং নামাযের সময় আসে তাহলে প্রত্যেক নামাযের নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা জরুরী।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা হল যে, রাত দিনের আবর্তন এভাবে যে, কোন নামাযের সময়ই আসে না। যেমন–সূর্য অস্ত গেল এবং এক ঘণ্টা পর সুবহে সাদিক হয়ে গেল, এ অবস্থায় ইশার নামাযের সময় আসে না। যেমন– বুলগেরিয়ার অধিবাসীদের, যা উত্তর মেরুতে অবস্থিত 'নরওয়ে' রাষ্ট্রের এক শহর! সেখানে ছোট রাতের দিনগুলো তেইশ ঘণ্টার হয়। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য সূর্য অস্ত যায়। এ কারণেই সেখানে ইশার নামাযের সময়ই হয় না। এ ব্যাপারে আকাবিরে ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু কুরআন দ্বারা প্রমাণিত যে, নামায তার নির্ধারিত সময়ে ফরয করা হয়েছে, সেহেতু যদি নামাযের সময়ই না আসে, তাহলে নামায ফরযই হবে না। সেখানকার লোকের উপর চার ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। এর দলীল হল, যদি কোন ব্যক্তির পা টাখনু পর্যন্ত কেটে যায় তাহলে তার জন্য ওযুর মধ্যে তিন ফরয। চতুর্থ ফরয পা না থাকার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দলীল হল, যদি কোন অমুসলিম ব্যক্তি সূর্য উদয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা নাবালেগ ছেলে বালেগ হয় অথবা হায়েযা নারী হায়েয থেকে পবিত্র হয় তাহলে এই অবস্থায় তাদের সেদিনের চার ওয়াক্ত নামায ফরয হবে। এই উক্তিকে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন।

ফুকাহায়ে কেরামের দ্বিতীয় মত হল, যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আলোচনা কুরআনে করা হয়েছে সেহেতু কোন নামায ত্যাগ করা যাবে না। যদি কোথাও

ইশার নামাযের সময় না আসে, তবুও তাদেরকে সময় অনুমান করে নিতে হবে এবং মাগরিব নামাযের পরপরই ইশার নামায পড়তে হবে। সতর্কতামূলকভাবে ইশার নামায ফজরের নামাযের পূর্বে এই দিনের ইশার নামাযের নিয়তে আদায় করে নিবে।

(৩) তৃতীয় অবস্থা হল কয়েক মাস পর্যন্ত দিন অথবা রাত থাকে। যেমন– নরওয়েতে উত্তর মেরুর নিকটবর্তী এলাকায় দিন এবং রাত ছয় মাস পর পর আসে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ মেরুতে দিন এবং রাত ছয় মাস পর পর হয়। এই অবস্থায় লোকজন তাদের অফিসের সময়সূচী, ঘুমের সময়সূচী ঘুম থেকে জাগার সময়সূচী এবং পানাহারের সময়সূচী অনুমান করে নির্ধারণ করে নেয়। তাদের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা রাত দিন অনুমান করে নামাযের সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং এতটুকু সময়ের ব্যবধানে নামায আদায় করে নিবে, সাধারণত যতটুকু সময়ের ব্যবধানে নামায আদায় করা হয়। এর দলীল হল রাসূল সা.-এর সেই হাদীস, যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, বড় দাজ্জালের ফেৎনার চল্লিশ দিনের মধ্যে একদিন এক বছরের সমান, একদিন এক মাসের সমান একদিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের ন্যায় হবে। সাহাবায়ে রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা. নামাযের কী অবস্থা হবে? অর্থাৎ এক বছরের সমান দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যথেষ্ট হবে কি? রাসূল সা. তাদের জবাবে বলেন না, অনুমান করে নামায আদায় করতে হবে।

মাওলানা আব্দুল্লাহ সামনে এসে আমার কপালে চুমু দিলেন এবং বললেন, হযরত! আপনি একটি কঠিন মাসআলাকে সহজ ভাষায় বয়ান করে দিলেন।

আমি বললাম, মাওলানা! এখন সুবহে সাদেক উদয় হচ্ছে। চলুন ফজরের নামায আদায় করে ফেলি। যেন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাতে পারি। সবাই ওযু করে ফজরের নামায আদায় করি এবং কিছুক্ষণ যিকির ও মুরাকাবা করে ঘুমিয়ে যাই। প্রায় চার ঘণ্টা ঘুমানোর পর জেগে দেখি এখনও ফযরের সময় আছে। অতঃপর ওযু করে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিন শুরু করি। এরপর নাশতা সেরে নেই। তখন সূর্য উদয় হল। আমরা সূর্যকে এত আগ্রহভাবে দেখি, যেভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে দেখে।

সামুদ্রিক জাহাজে সফর

মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত! মসজিদের দরজা যোহরের সময় খুলবে। আমাদের হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে, যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা সামুদ্রিক জাহাজে লেনিনগ্রাদের কিছু এলাকা সফর করে আসতে পারি। আমি বললাম, খুব ভাল হবে। জমিনে বসে আল্লাহ তাআলার যিকির করি, চলুন এবার

পানির উপর বসে আল্লাহ তাআলার যিকির করব। অতঃপর আমরা নিকটবর্তী নৌবন্দরে পৌঁছি। তখন নৌ বন্দরে প্রচুর জাহাজ ছিল। আমরা টিকেট ক্রয় করে জাহাজে উঠি, তখন সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাওলানা বললেন, হযরত! ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষমান ছিল, আমি বলি আত্মপ্রশান্তির জন্য এরূপ ধারণা পোষণ করা খুবই ভাল। আমরা জাহাজের সিটে বসি। পাশেই রুশ বংশদ্ভুত লোকজন বসা ছিল, তারা আমাদের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে ছিল, যেন কোন আশ্চর্য কিছু দেখছে।

জাহাজ কিছু দূর যাওয়ার পর কাপ্তান ঘোষণা করল যে, আজ রুশ নৌবাহিনীর বিশেষ দিবস। নৌ-বাহিনী সদস্যরা প্রদর্শনীর জন্য নৌবহরের একটি ইউনিট স্থাপন করেছে। আমরা এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছি, যদি কোন যাত্রী প্রদর্শনী দেখতে চান, তাহলে জাহাজের ছাদে চলে আসুন। এই ঘোষণা শোনামাত্র সকল যাত্রী কামরা থেকে বের হয়ে জাহাজের ছাদে উঠে গেল। নিচে উত্তাল সমুদ্র, উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং ডানে-বামে রুশ নৌবাহিনীর জাহাজ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি সেদিনই নৌবহরের ভীড় খুব কাছ থেকে দেখি, জাহাজভর্তি মিসাইল ও তারপিড এর লম্বা সারি দেখার সুযোগ হয়। আমার জন্য এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। আমি আমার চিন্তার সাগরে তলিয়ে যাই এবং অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টাতে থাকি।

রাসূল সা.-এর একটি হাদীস স্মরণ হয়ে যায়, রাসূল সা. বলেন, উম্মতে মুসলিমার মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নৌপথে জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে এবং সে স্থলপথে জিহাদকারীদের তুলনায় দু গুণ সওয়াব পাবে। অতঃপর সাইয়্যেদিনা আমীরে মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে মুসলমান সৈন্যরা সর্বপ্রথম নৌপথে জিহাদ করার সম্মান অর্জন করেন। জেনারেল তারেক বিন যিয়াদ জিব্রালটারের নিকটবর্তী স্থানে খৃস্টান সৈন্যদের সাথে জিহাদ করেন। ইতিহাস সাক্ষী, যখন মুসলমান সৈন্যরা সমুদ্র তীরে অবতরণ করলেন, তখন সেনাপতি নির্দেশ দিলেন যে, সব জাহাজ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। অতঃপর সব জাহাজ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়। তখন সেনাপতি দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। 'তোমাদের সামনে শত্রু পিছনে সমুদ্র। পলায়ন করার কোন সুযোগ নেই। হয়ত তোমরা বিজয় অর্জন করবে। নয়ত মৃত্যু আলিঙ্গন করবে।' মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে জিহাদের এমন জোশ উঠল যে তারা সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুদেরকে কচুকাটা করলেন। এর দ্বারাই স্পেনে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। জিহাদে শেষে এক সৈন্য জাহাজ

জ্বালানোর ব্যাপারে আলোচনা করার সময় তারেক বিন যিয়াদকে জিজ্ঞাসা করল যে, দেশে ফিরে যাওয়ার কথা আপনার মোটেই স্মরণ ছিল না? তিনি জবাব দিলেন–

هر ملک ملک ماست

که ملک خدائے ماست

প্রত্যেক রাষ্ট্র আমাদের

যে রাষ্ট্র আমাদের রবের, সেই রাষ্ট্র আমাদেরও।

এক তরুণীর অবাস্তব তামান্না

আমি এসব নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলাম। ইতোমধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহ কাছে এসে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হযরত! আপনার পাশে এক পনের বছরের তরুণী দাঁড়ানো রয়েছে। সে আমাকে বলল, এই ব্যক্তির মধ্যে কোন আকর্ষণ রয়েছে। ফলে আমার অন্তর তাকে দেখতে চাচ্ছে। আমি তাকে আপনার পরিচয় প্রদান করেছি এবং বলেছি, তুমি এই শায়খের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। সে বলল, শিষ্য নয় বরং তার স্ত্রী হতে চাই। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে বললাম, কাফিরদের কাছে তো এটা নারী-পুরুষের পরস্পর সময় কাটানোর অপর নাম। কিন্তু ইসলাম তো এটাকে জীবনসাথী সাব্যস্ত করেছে। তাকে ইসলামের দাওয়াত দিন। আমি দু'আ করব, হতে পারে আল্লাহ তাআলা তার সীনা ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করে দিবেন।

মাওলানা আব্দুল্লাহ তাকে কিছুক্ষণ ওয়াজ ও নসীহত করলে সে বলল, এই ব্যক্তি তো আমাকে ইসলামের ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য করে দিয়েছে। কিন্তু আমি তো একা। আমার সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কমিউনিস্ট। আমি তাদের কাছে আমার ইসলামের কথা কীভাবে ব্যক্ত করব? আমি এখনও তো খুবই ছোট। মাত্র হাইস্কুলে লেখাপড়া করি। আমি বললাম, মাওলানা! তাকে বলে দিন, তুমি কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যাও এবং ব্যাপারটি আল্লাহর হতে সঁপে দাও, ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ তাআলা তার ঈমানের হেফাজত করবেন। তরুণী আমার কাছে এসে ক্ষীণ আওয়াজে বলল, আমার সকল আত্মীয়-স্বজন এখানে। আমি মুসলমান হতে চাচ্ছি, এখন কী করতে পারি? আমি তাকে কালেমায়ে শাহাদত পড়িয়ে দিলাম এবং বলে দিলাম যে, মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং বিস্তারিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে জেনে নিবে। তরুণী সাথে সাথে তার ঠিকানা লিখে দিল।

আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে বললাম, কোন যুবক মুসলমানের সাথে তাকে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মাওলানা এই তরুণীকে বলল, তোমার ইসলাম

গ্রহণের ফলে আমাদের শায়খ আন্তরিকভাবে খুব খুশী হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠল, তাকে বলুন যে, আমাকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে আমার আশা পূরণ করতে। আমি বললাম, আমার চেয়ে কয়েক গুণ ভাল জীবনসাথী দিতে আল্লাহ তাআলা সক্ষম। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য কী রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন। আমি তোমার জন্য দু'আ করব। একথা বলে আমি হাত উঠিয়ে এই তরুণীর ঈমানের হেফাজতের জন্য কেঁদে কেঁদে দু'আ করি। দু'আর পর তরুণী মাওলানাকে জিজ্ঞেস করল, এই শায়খের চোখ থেকে অশ্রুর মুক্তা ঝরছে কেন? মাওলানা বললেন, তিনি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দু'আ করছেন। একথা শুনে সে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং বলল, যদি আমি ছেলে হতাম, তাহলে গোটা জীবন তার পায়ে লুটিয়ে দিতাম। আমি বললাম, এই সমস্ত অসম্ভব তামান্না পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহকে ভালবাস। তার স্মরণে জীবন অতিবাহিত কর। সে বলল, আপনার কথা আমার অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছে।

তখনই জাহাজের কাপ্তান ঘোষণা করল, যাত্রীগণ! যার যার সিটে চলে আসুন। অতঃপর আমরা আমাদের সিটে এসে বসলাম। আবু উসমান বলল, হযরত! যদি আপনি রাশিয়াতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন, তাহলে অনেক লোক মুসলমান হয়ে যাবে। আমি বললাম, মধ্য এশিয়ার যে সমস্ত লোকদেরকে আমি এজাযত ও খেলাফত দিয়েছি, এর একমাত্রই উদ্দেশ্যই হল যে, তারা এখানে নিয়মিত আলো ছড়াবে। যে পরওয়ারদেগারে আলম মাকড়শা ও মাছি দ্বারা কাজ নেন, তিনিই আমাদের মত মিসকীন ও নালায়েককে দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য কবুল করে থাকেন।

পাশ্চাত্যের জানালা

জাহাজের কাপ্তান ঘোষণা করল যে, আপনাদেরকে লেনিনগ্রাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দেওয়া হবে। এই শহরে একশত আশ্চর্যের ঘর রয়েছে। এতে ভূগর্ভস্থ রেলগাড়ীর প্রযুক্তি রয়েছে, যা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম প্রযুক্তি। একটি পারমাণবিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভূ-গর্ভস্থ এক শহর তৈরী করা হয়েছে। এই শহরকে পাশ্চাত্যের জানালা বলা হয়। এ কারণেই বলা হয় যে, যদি কয়েক ঘণ্টা এই সমুদ্রে জাহাজ চলে তাহলে একেবারেই সামনেই স্টকহ্যাম, সুইডেনের বন্দর নগরী। আবু উসমান আমাকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি কি স্টকহ্যাম দেখেছেন, আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ। কয়েকবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তাজউদ্দিন মুচকি হেসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাতে লাগল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? সে বলল, হযরত! আপনি শায়খুল আলম, আপনি পাকিস্তান থেকে পাশ্চাত্যের দিকে সফর করে সুইডেন পর্যন্ত পৌঁছেছেন। যখন প্রাচ্যের দিকে সফর করেছেন তখন লেনিনগ্রাদ পৌঁছেছেন আর দু'রাষ্ট্র পরস্পর মুখোমুখি,

কেমন যেন আপনি দীনের খাতিরে গোটা দুনিয়া সফর করেছেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ একথা শুনে জোরে জোরে আল্লাহ আকবার বললেন।

লেনিনের মূলনীতি

জাহাজের কাপ্তান ঘোষণা করল, আমাদের ডান পাশে লেনিনের প্রাসাদ অবস্থিত। তখন সকল যাত্রীরা সেদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করল। আমি তাকিয়ে দেখি সমুদ্রের তীরে এত সুন্দর, প্রশান্ত ও জৌলসপূর্ণ এক আলীশান প্রাসাদ যে কোন মানুষতো অবলোকন করে হতভম্ব হয়ে যাবে।

মাওলানা বললেন, প্রাসাদের ভিতরের দৃশ্য আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয়। প্রাসাদের খুঁটি ও ছাদ স্বর্ণের পানি দিয়ে কারুকার্য করা। অভিশপ্ত লেনিন নিজের আরাম আয়েশের জন্য নির্মাণ করেছিল। আমি বললাম, মাওলানা! এখানকার সাধারণ লোকজন তো এক কামরা এবং দু'কামরার মধ্যে জীবন-যাপন করে। পক্ষান্তরে সাম্যের শ্লোগানদাতা এমন আলীশান প্রাসাদে বসবাস করে আনন্দ উপভোগ করেছে। এটাই কি মূলত সমান অধিকার? মাওলানা বললেন, কষ্মিনকালেও এর নাম সমান অধিকার নয়। আমি বললাম, দুনিয়ার কেউ যদি সমান অধিকারের দীক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাহলে তাকে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর চৌকাঠে আসা অপরিহার্য।

বিপদগ্রস্ত মানবতা রাসূল সা.-এর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে

খন্দক যুদ্ধে এক সাহাবী ক্ষুধার তাড়নায় পেটে একটি পাথর বেঁধেছিল, পক্ষান্তরে রাসূল সা. একই কারণে তার পেট মোবারকে দু'টি পাথর বেঁধে ছিলেন। মুসলমান মুজাহিদরা খন্দক খননে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একটি পাথর তাদের দ্বারা ভাঙ্গা সম্ভব হচ্ছিল না, কিন্তু রাসূল সা.–তাঁর কোদাল দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. যখন খলীফা ছিলেন, তখন তিনি বায়তুল মাল থেকে এই পরিমাণে ভাতা নিতেন, যতটুকু ভাতা প্রত্যেক মুসলমানকে দেওয়া হত।

হযরত উমর রা. কে একবার পান করার জন্য শরবত দেওয়া হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যেক মুসলমান কি শরবত পান করেছে? লোকজন বলল, না। তখন তিনি তা পান করতে অস্বীকার করলেন।

কমিউনিস্টদের সমানাধিকার এমন এক হাস্যকর ব্যাপার যে, হে লোকজন! তোমরা সর্বদা শাসিত। আর আমরা সর্বদা শাসক।

এ ধরনের বেইনসাফীর কারণেই আজ সত্তর বৎসর পর এক সময় এসেছে যে, লেনিনগ্রাদ শহরের অধিবাসীরা লেনিনের ভাস্কর্য রশি দিয়ে বেঁধে রাস্তায় টেনে

হেঁচড়ে ফেলে দিয়েছে। অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করলে এভাবে ধ্বংস হতে হয়।

কয়েকদিন লেলিনগ্রাদ অবস্থান করার পর আমরা পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

কাটসামাকশার দিনগুলো

কাটসামাকশা লেনিনগ্রাদ থেকে সামনে। রাশিয়ার সীমান্তের শেষ শহর। কোন এককালে এটা ফিনল্যান্ডের অংশ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া এর উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে এবং নিজের সীমান্ত সামনে বাড়িয়ে নিজের করে নেয়। এখানকার লোকজন ফিনল্যান্ড বংশদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে রাশিয়ার অধিবাসী বলা হয়। এই শহরে কোন মুসলমান নেই। এখানে কিছু নারী-পুরুষ মিলে একটা ক্লাব তৈরি করেছে। তারা সপ্তাহে একদিন একত্রিত হয়ে পানাহার ও খোশ গল্পের পর যার যার কাজে চলে যায়। তাদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত। এদের নূরিয়া নামী এক মহিলা স্বপ্নে দেখে যে, এক বুযুর্গ লোক তাকে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা কর। সে এই স্বপ্ন তার ক্লাবের সকল সদস্যদের শোনাল। তারা সবাই পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, আমরা সবাই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করব। দু'জন মহিলা সদস্য ছিল তারা ইসলামের নাম গন্ধও শুনতে পারত না, তারা উভয়ে সকলের প্রস্তাবের বিপক্ষে কঠোর বিরোধিতা করে।

যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার প্রবল আগ্রহ ছিল তাই তারা সিদ্ধান্ত করল যে, আমরা কোন মুসলমানকে দাওয়াত করে আনব। তিনি আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান দান করবেন।

এই ক্লাবের এক লোক তার ব্যক্তিগত কাজে মস্কো এসেছিল, তখন তাজউদ্দিনের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে তাজউদ্দিনকে দাওয়াত দিয়েছিল যে, আপনি কাটসামাকশা, এনে আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন।

তাজউদ্দিন আমাকে এই অবস্থা জানিয়ে ছিলেন। তখনই আমি নিয়ত করে ফেলি।

অতঃপর লেনিনগ্রাদ থেকে ৮ ঘন্টা ট্রেনে সফর করে কাটসামাকশা পৌঁছি।

রাত হয়ে গিয়েছিল, আমরা সেখানেই ইশার নামায আদায় করি। আমরা পানাহারের যথেষ্ট পরিমাণ সরঞ্জাম সাথে নিয়েছিলাম। তদুপরি মেজবান পাকানো সবজি নিয়ে এল, সবাই পেট ভরে খেয়ে দ্রুত ঘুমিয়ে যাই।

পরের দিন স্থানীয় হোটেলের এক হলে মাহফিল সংঘটিত হয়। আমরা সেখানে পৌঁছে ক্লাবের সকল সদস্যদের অপেক্ষারত দেখতে পাই। নূরিয়া যেহেতু ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিল, সেহেতু সে আমার পরিচয় প্রদান করল এবং বলল আমরা

সম্মানিত মেহমানের কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। আমি এক ঘন্টা ইসলাম সম্পর্কে আলোকপাত করি। অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্ব এক ঘন্টা চলল। নূরিয়া স্টেজে এসে বলল, সম্মানিত মেহমানের আলোচনা আমাদের হৃদয়রাজ্যের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে। সুতরাং আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করতে চাই।

তাজউদ্দিন উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। আমি তাদেরকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়িয়ে তাদের নাম পরিবর্তন করে নতুন করে ইসলামী নাম রেখে দেই। অতঃপর দু'ঘন্টা দীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করি। নূরিয়া বলল, আপনারা যখন নামায পড়বেন, তখন আমরা আপনাদের ছবি উঠিয়ে রাখব, যেন আপনারা চলে যাওয়ার পরও রুকু-সেজদা ইত্যাদি বুঝতে আমাদের জন্য সহজ হয়।

যখন তারা ফটোগ্রাফার নিয়ে এল, সে দরজার দিয়ে প্রবেশ করামাত্রই আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠল এবং বলতে লাগল আজ রাতে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। হুবহু এই কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। নূরিয়া বলল, তিনি আমাদের শায়খ। সে বলল, সর্বপ্রথম আমাকে মুসলমান বানান। অতঃপর আমি কাজ করব। অতঃপর তাকে আমি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করালাম। এই দিন আমাদের ফিরে আসার কথা ছিল। বিকাল চারটার সময় ক্লাবের সকল সদস্য আমাদের বিদায় দিতে রেলস্টেশনে আসল। যখন ট্রেন ছাড়ার সময় হল তখন তারা সবাই কাঁদতে লাগল। তাজউদ্দিন ও মাওলানার চোখ দিয়েও অশ্রু ঝরছিল। নূরিয়া আমার কাছে এসে বলল শায়খ! আপনি আমাদের অন্তরগুলো আপনার সাথে নিয়ে যাচ্ছেন, আজ পর্যন্ত এই প্লাটফর্মে কেউ তার প্রিয়জনকে বিদায় দিতে এসে এত কান্না করেনি। যেভাবে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি।

আপনার সাথে আমাদের এত মহব্বত কীভাবে সৃষ্টি হল? আমি বললাম, এটা ইসলামের আকর্ষণ, যা পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বললেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

(নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকাজ সম্পাদন করে, নিশ্চয়ই রাহমান তাদের জন্য মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন।)

ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট পূর্বে দু'আ করি এবং উপস্থিত সবাইকে বলি যে, আমাদের মাশায়েখগণ একে অপরের থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সূরায়ে আসর তেলাওয়াত করতেন। আমি তাদের অনুসরণার্থে এই সূরা তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছি। অতঃপর এই সূরা তরজমা শুনালাম এবং বললাম যে, যদি আমরা জীবিত থাকি তাহলে পরস্পরে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর

সান্নিধ্যে যাওয়ার সময় এসে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিবসে আমাদের মুলাকাত হবে। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি।

فَاللّٰهُ خير حافِظًا وهُوا رحَمُ الرَّاحمين ـ

(অতএব আল্লাহ তাআলা উত্তম রক্ষাকারী এবং অতিশয় দয়ালু)

আমার এই কথা তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করল। তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছিল। আমার মধ্যে এক ভাবের সৃষ্টি হল। অতঃপর ভারাক্রান্ত হৃদয় ও অশ্রুসিক্ত নয়নে একে অপর থেকে বিদায় গ্রহণ করে গাড়ীতে উঠে মস্কোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। ক্লাবের সদস্যরা সালাম জানিয়ে চলে গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইউক্রেন সফর

২৪ জুলাই, শুক্রবার রাত ১১টায় মস্কো থেকে কায়ফ রওয়ানা করি। ইউক্রেইন প্রথমত রাশিয়ার একটি অংশ ছিল। বর্তমানে সার্বভৌম এক স্বাধীন রাষ্ট্র। রাশিয়ার পরপরই সবচেয়ে বেশি সামরিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র। রাশিয়ার অধিকাংশ রিচার্স ল্যাবরেটরি এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে নির্মিত ছিল। কয়েকশত বছর পূর্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছিল। এক খৃস্টান বাদশাহ তার কর্তৃত্ব বিস্তার করার ফলে তাদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টান বানায় এবং নাম পরিবর্তন করে। যে ব্যক্তি খৃস্টান হতে অস্বীকার করত তাকে হত্যা করে ফেলত। এক পর্যায়ে এটা খৃস্টান রাজ্যে পরিণত হয়ে যায়। পরবর্তীতে কমিউনিজমের আগ্রাসন তাদেরকে নাস্তিক বানিয়ে দেয়। কিন্তু কমিউনিজমের যাদু ভাঙ্গতেই তারা খৃস্টান ধর্মের প্রতি পুনরায় ঝুঁকে পড়ে। এখানে মুসলমান জনবসতি খুব অল্প। ইউক্রেইন এর রাজধানী কায়ফ বিরাট বড় শহর। কিন্তু এতে কোন মসজিদ নেই। আমরা দিনের এগারটার সময় কায়ফ শহরে পৌঁছি। এই অঞ্চল শস্য-শ্যামলতার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব অঞ্চল। প্রশস্ত সড়ক, আলীশান প্রাসাদ রাস্তার উভয় পাশে ফল ভর্তি গাছ এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের সমাহার। কিছু কিছু স্থানে গাছ থেকে এত আপেল ও খুবানী ঝরে পড়ে রয়েছে যে, ফলে রাস্তার উপর চাদর বিছানো আছে বলে অনুভব হয়। গাড়ী এর উপর দিয়েই অতিক্রম করে চলে যায়। ইব্রাহিম আদহাম বললেন, ফলের প্রাচুর্যতার ফলে লোকজন তা নষ্ট হওয়ার দরুণ কোন আফসোস করে না।

'কায়ফ' শহরে আমাদের পরিচিতি কেউ ছিল না। কোন মসজিদও ছিল না, সেখানে গিয়ে উঠব। এক আলেম হযরত তামীম সাহেবের সাথে ইব্রাহিম আদহামের পরিচয় ছিল।

তার ঠিকানা সংগ্রহ করে আমরা সেখানে পৌঁছি। হযরত তামীম সাহেব আমাদেরকে দেখে শুরুতে হয়রান হয়ে গেলেন যে, এই লোক কোত্থেকে এল। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আরবী ভাষা বলতে পারেন কি? আমি বললাম, মোটামুটিভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারি। সুতরাং কথোপকথন চলতে লাগল। হযরত তামীম সাহেব এক ঘন্টায় আমার সম্পর্কে সব কিছু জেনে নিলেন।

এখানে কেন এসেছেন? কোন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত, শিক্ষা-দীক্ষা কোথায় অর্জন করেছি? কোন বুযুর্গ থেকে ইযাযত লাভ করেছি, সিলসিলা কীভাবে রাসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছেছে? কোন বেদআতী দলের সাথে সম্পৃক্ত কি না ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। এভাবে চিত্তাকর্ষক আলোচনা চলছিল। সময়ে সময়ে চা পানও চলছিল।

এরপর হযরত তামীম সাহেব যখন আমার সব ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে গেলেন, তখন তিনি ফোন করে তার দুই ভাইকে ডাকলেন। যোহরের পর আমরা কায়লুলা করি। মাগরিবের নামায আদায় করার পর দ্বিতীয় মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। হযরত তামীম সাহেব আমাকে বললেন, হযরত! আত্মশুদ্ধির সম্পর্কে কিছু আলোচনা করুন। আমার জন্য এর চেয়ে উত্তম বিষয় আর কী হতে পারে? অতঃপর আয়াতে কুরআনী ও হাদীসে নববী থেকে যা কিছু আমাদের মাশায়েখদের থেকে শুনেছিলাম, তা বয়ান করি। শ্রোতাদের মধ্যে এক ভাবের উদয় হল।

বয়ান শেষে হযরত তামীম সাহেব বললেন, আমাদের পরিবারের সবাইকে বায়আত করুন। সুতরাং হযরত তামীম তার দুই ভাইসহ পরিবারের সবাইকে বায়আত করি। ইব্রাহিম আদহাম খুশী হয়ে বলতে লাগলেন, হযরত! আপনি এই রাষ্ট্রে নকশবন্দীয়া খান্দানের এক ঝর্ণা জারী করে দিয়েছেন। হযরত তামীম সাহেবের দুই ভাই উভয়ে আলেম ছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে দরসে কুরআনের দরসে মাহফিল করতেন। তাঁরা অনুরোধে করলেন, হযরত! আপনি ছাত্রদেরকেও বায়আত করে যিকির ও মুরাকাবা শিখিয়ে দিন। আমি তাদেরকে পরামর্শ দিলাম, আমাদের হাতে মাত্র দু'দিন সময় আছে। তাই আপনারা আগামীকাল সব লোককে এক স্থানে একত্রিত করুন। ইনশাআল্লাহ! আমি বয়ান করব এবং যিকির ও মুরাকাবা করাব। হযরত তামীম সাহেব বললেন, হযরত! এখন আমাদেরকে মুরাকাবা করিয়ে দিন। আমি তাদের লতীফাসমূহ জারী করে দেই এবং মুরাকাবা করাই।

হযরত তামীম সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, হযরত এখনই যিকিরের এই অবস্থা! তাহলে পরবর্তীতে কী হবে?

আমি বললাম ঃ

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا

ফয়যানে হাবীব রহ.-এর কৃতিত্ব

যখন আমরা মস্কো থেকে ইউক্রেন রওয়ানা করি, তখন তাজউদ্দিনের আমাদের সাথে ইউক্রেন সফর করার প্রোগ্রাম ছিল। নির্ধারিত সময়ে গাড়ী ছেড়ে

দিল। কিন্তু তাজউদ্দিন এসে পৌছেনি। সে টিকেট ক্রয় করে রেজুলেশন করিয়ে ছিল। কিন্তু আসেনি কেন– তাই আমরা পেরেশান ছিলাম। তাছাড়া বিরাট সমস্যা হল আমরা ঠিকানা জানি না, সে না আসলে আমাদের কী হবে? গাড়ি ছাড়ার আধা ঘন্টা পর টিকেট চেকার আমার সামনে আসল এবং একটি কাগজ হাতে দিয়ে বলল, এটা আপনার জন্য পয়গাম, আমি পড়ে দেখি এটা তাজউদ্দিনের টেলিগ্রাম। এতে লেখা, আমি আসতে দেরী হওয়ার কারণে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। আমি দ্বিতীয় গাড়ীর টিকিট ক্রয় করে আপনাদের পিছনে আসছি। আপনারা 'কায়ফ' রেলস্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি আপনার পৌছার দু'ঘন্টা পর পৌছব।

এরপর আমি মাওলানা আব্দুল্লাহ ও ইব্রাহিম আদহামকে তাজউদ্দিনকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রদান করি। তারা তিন ঘন্টা অপেক্ষা করেছেন। যে গাড়ীতে তাজউদ্দিন আসার কথা সেই গাড়ী এসেছে যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে বাসায় চলে গেছে। কিন্তু রাবেল তাজউদ্দিনকে দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই তারা বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা রাবেল তাজউদ্দিনকে নিয়ে আসেননি? তারা বললেন, যথেষ্ট খোঁজাখুজির পরও তার সাক্ষাৎ পাইনি। আমার খুব অনুতাপ হল, বেচারা সফর করেছে কিন্তু আমাদের সাক্ষাৎ পেল না। রাতে তাহাজ্জুদের পর দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! আমাদেরকে দ্রুত পরস্পরের সাথে মুলাকাত করিয়ে দাও।

পরের দিন হযরত তামীম সাহেবের সাথে শহরে গিয়ে দেখি হল রুমে লোকে লোকারণ্য। যখন স্টেজের কাছে পৌছলাম, তখন রাবেল তাজউদ্দিন মুচকি হেঁসে বললেন, হযরত জী! আসসালামু আলাইকুম। আমি তাকে দেখে এমনভাবে মুলাকাত করলাম যেভাবে কয়েক বছর পর পুরনো বন্ধুর সাথে মুলাকাত করা হয়। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখানে কীভাবে পৌছলেন। তিনি বললেন হযরত! এখন বয়ান করুন, মাহফিল শেষে বিস্তারিত বলব। আমি এক ঘন্টা বয়ান করি এবং হযরত তামীম সাহেব তরজমা করলেন। অতঃপর কয়েকটি পাগড়ী একসাথে বেঁধে উপস্থিত সবাইকে বায়আত করি। মুরাকাবা ও দু'আ শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে লাগল। উপস্থিত সবাই চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন করল। এক তরুণী সাইন্সের স্টুডেন্ট ছিল। সে হযরত তামীম সাহেবকে বলল, আমি দুই বছর যাবত মেডিটেশন করছি। এখন আমি মুরাকাবা করার সময় আমার অনুভব হল যে, এক নূর (আলো) এই শায়খের সিনা থেকে বের হয়ে আমার সিনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। আপনি তাকে বলুন, আমি তার হাতে সোপর্দ হতে চাই। তিনি যেভাবে নির্দেশ দিবেন, সেভাবে জীবন যাপন করব।

আমি বললাম, তোমার বাহ্যিক অবস্থা রাসূল সা. এর সুন্নত দ্বারা সুসজ্জিত কর এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ তাআলার স্মরণে ব্যস্ত রাখ, যেন এক মুহূর্তও তার স্মরণ থেকে বিমুখ না হয়।

হযরত থানভী রহ. কে আল্লামা সুলাইমান নদভী রহ. জিজ্ঞেস করছিলেন, হযরত! তাসাউফের উদ্দেশ্যে কি? তিনি বলেছিলেন যে, এত অধিক যিকির করা যেন দেহের প্রতি রগ-রেশা থেকে গোনাহের নাপাকী বের হয়ে যায়। হযরত তামীম সাহেব এই উত্তর শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। উপস্থিত সবাই হযরত তামীম সাহেবের শুকরিয়া আদায় করল যে, আপনি আমাদেরকে এক কামেল শায়খের সাথে মুলাকাত করিয়েছেন।

রাবেলের ভাষ্যে তার কাহিনী

যখন মুরাকাবা থেকে অবসর হয়ে লোকদের সাথে মুলাকাত করছি, তখন রাবেল তাজউদ্দিন আমার কাছে এসে বসলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখানে কীভাবে আসলেন? তিনি বললেন, আপনার ওসীলায় দু'আ করার ফলে কবুল হয়েছে। আপনার সাথে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে আসতে দেরী হয়ে যায়। আমি প্লাটফর্মে আসামাত্রই গাড়ী ছেড়ে দেয়। আমি কয়েক মিটার পিছনে ছিলাম এবং গাড়ী রওয়ানা হতে দেখছিলাম। আমার অনুতাপের অন্ত ছিল না। আমি অনুসন্ধান কক্ষে যোগাযোগ করে জানতে পারি যে, দু'ঘন্টা পর দ্বিতীয় গাড়ী মস্কো থেকে কায়ফ যাবে। আমি সেই গাড়ীতে সিট বুকিং করি এবং টেলিগ্রামের মাধ্যমে আপনাকে অবগত করি। যখন কায়ফ স্টেশনে অবতরণ করি তখন আপনাদের কাউকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

প্রায় এক ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে যাই যে, আপনার সাথে সফর করার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। কায়ফ রেল স্টেশন এত বড় যে, সাধারন লোক উদভ্রান্ত হয়ে যাবে। ভাবছিলাম হয়ত আপনারা এক প্লাটফর্মে খুঁজছেন আর আমি অন্য প্লাটফর্মে খুঁজে ক্লান্ত হচ্ছি। ক্লান্ত হয়ে এক হোটেলে এক রুম ভাড়া করি। রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের পর খুব অনুনয় বিনয় করে আপনার ওসীলা দিয়ে দু'আ করি।

সকালে নাশতা করে মস্কো ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করি। এক বাসে উঠে বসি। যখন টিকেট নিতে গেলাম, তখন ড্রাইভার বলল, এই বাস রেল স্টেশনে যাবে না। আমি আমার ভুল বুঝতে পারি, ভাবলাম সামনে স্টপিজে নেমে যাব। যখন গাড়ী থামল তখন মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব গাড়ীতে উঠলেন, আমরা পরস্পরে মিলিত হয়ে পেরেশান হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখানে কীভাবে এলেন?

তিনি বললেন, হযরতের সাথে মুলাকাত করতে এসেছি। কিন্তু কোন খোঁজ পাচ্ছি না, তিনি কোথায় আছেন? আমি বললাম, আমিও তো হযরতের সাথে মুলাকাত করতে এসেছি কিন্তু আমিও তার ব্যাপারে কিছু জানি না। আমরা উভয়ে সামনের স্টপিজে নেমে সঠিক বাসে উঠে রেলস্টেশনে যাওয়ার পরামর্শ করি।

সামনে স্টপিজে নেমে দেখি মাথায় টুপি পরিহিত এক লোক যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? সে বলল, একটু কাছেই এক ভবনে এক মুসলমান আলেমের বয়ান হবে। আমি সেই মাহফিলে শরীক হওয়ার জন্য যাচ্ছি। আমরা ভাবলাম, এই বয়ান হয়ত আপনরাই হবে। এখানে পৌঁছে জানতে পারলাম, বাস্তবেই আপনি এসেছেন। আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। আপনাকে দেখে অন্তর বলল যে, এই শায়খের ওসীলা দিয়ে দু'আ করার রেজাল্ট আল্লাহ তাআলা তার সাথে মুলাকাত করিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, মূলত এটা আপনার ইখলাস, যা আপনাকে এই পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

'মসজিদে কায়ফ'-এর ভিত্তি

রাবেল তাজউদ্দিন তার কথা শেষ করার পর হযরত তামীম সাহেব বললেন, হযরত! এই শহরে মুসলমানদের কোন মসজিদ নেই। আমরা ভাড়া করা জায়গা নিয়ে তালীম শুরু করি। কিন্তু যখন খৃষ্টানরা জানতে পারে যে, আমরা এখানে দীনের তালীম দিচ্ছি, তখন তারা আমাদেরকে বের করে দেয়। আমরা এই পর্যন্ত তিন চারটি স্থান পরিবর্তন করেছি। এখন আমরা মসজিদ নির্মাণের জন্য সরকার থেকে জমি ক্রয় করে নিয়েছি। আপনি দু'আ করুন যেন, আমাদের জন্য নির্মাণ কাজ সহজ হয়ে যায়। আমি বললাম, চলুন মসজিদের স্থান দেখব এবং দু'আ করব। একথা শুনে সব সাথীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

আমরা কয়েকটি গাড়ীতে আরোহন করে সেই স্থানে পৌঁছি। পথিমধ্যে ইব্রাহিম আদহাম বললেন, হযরত! গতকাল যখন আমরা এই শহরে প্রবেশ করি তখন একজন লোকও আমাদের পরিচিত ছিল না। আর এখন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমাদের কাফেলা এমনভাবে যাচ্ছে যেন কোন বরযাত্রীর কাফেলা যাচ্ছে। মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, 'ঠিক বলেছ।' আমাদের শায়খকে তো সবসময় বরের মত সজ্জিত দেখা যায়। আমি বললাম, মাওলানা! রাখুন এমন কথা বলবেন না। মাওলানা বললেন, হযরত! আপনি তো হলেন–

اَلَّذِيْنَ اِذَا رُؤُا ذُكِرَ اللّٰه

(যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়) এদের অন্তর্ভুক্ত। আমি আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললাম, 'আমরা এখানে খতমে খাজেগান এবং মুরাকাবার মাহফিল করব, যেন এই স্থান দ্রুত আবাদ হয়ে যায়।'

মসজিদের জায়গা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানেব বসে গোটা শহর দেখা যায়। আমি মুরাকাবায় বসে গোটা শহরের লোকদের উপর তাওয়াজ্জুহ দেই। মাহফিল শেষে উপস্থিত সবাই মসজিদের ভিত্তির জন্য কেঁদে কেঁদে দু'আ করল। হযরত তামীম সাহেব বললেন, হযরত! আমার অন্তরে প্রশান্তি অর্জন হয়ে গেছে

যে, এই মসজিদ দ্রুত নির্মিত হয়ে যাবে। আমার ইচ্ছা ছিল আগামী বছর এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করব। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আপনি তো আজই এর কাজ শুরু করিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম হযরত! আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, মসজিদের নির্মাণ কাজ এবং মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি কাজ পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই তারিখ নির্ধারণ করে ফেল, তাহলে আল্লাহ পাক উত্তম পন্থায় এই কাজ আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দান করবেন।

এই দুই কাজে কখনও কাউকে লজ্জিত হতে হবে না। এই কথা শুনে হযরত তামীম সাহেব দেওয়ানা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ইব্রাহিম আদহাম বললেন, আপনি আমাদের হযরতকে বেশি জোরে চাপ দিবেন না। তামীম সাহেব বললেন মিয়া! তিনি শুধু তোমাদের শায়খ নন, আমাদেরও শায়খ।

খরকুফ রওয়ানা

ইউক্রেনের দ্বিতীয় শহর খরকুফ। এই শহরের চারপাশে সামরিক সরঞ্জামাদি তৈরীর ফ্যাক্টরী রয়েছে। রাশিয়ার প্রথম এটমবোমা ও ট্যাংক এই শহরেই তৈরী করা হয়। এই শহরে রফিক তাতার এর বাসা। তার সাথে রাবেল তাজউদ্দিনের ছোটবেলা হতে বন্ধুত্ব রয়েছে। রাবেল পরামর্শ দিল, আমরা একদিনের জন্য রফিকের বাসায় যাব।

আমরা রাতের ১২টায় কায়ফ থেকে রওয়ানা হয়ে পরের দিন সকাল এগারটায় খরকুফ পৌঁছি। মুহাম্মদ রফিক সাহেব আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে রেলস্টেশনে আসেন। স্টেশন থেকে সোজা তার বাসায় পৌঁছে যাই। একাধারে সফর করার কারণে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, ফলে খাবার না খেয়েই গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাই। যোহরের নামায আখেরী ওয়াক্তে আদায় করি। কিছুক্ষণ রফিক সাহেবের সাথে আলোচনা করি। পরক্ষণেই আসরের নামাযের সময় হয়ে যায়। তাই আসরের নামায আদায় করি। আসরের নামাযের পর সবাই খাবার খাই। খাবার শেষে রফিক তাতার বায়আত হওয়ার আবেদন করলেন। তাকে বায়আত করে সংক্ষিপ্ত মুরাকাবা করাই। রফিক সাহেব আমাদের সাথে সফর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি বললাম, খুব ভাল।

আমরা সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং মাগরিবের পর স্টেশনে পৌঁছি। আমরা এখান থেকে মস্কো যাব, কিন্তু সিটের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই সাথীরা উদ্বিগ্ন হয়ে গেল যে, হয়ত সিটে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি পেরেশান হইনি। স্টেশনে মোজাফফর ওমর আফগানীর সাথে মোলাকাত হল। তিনি বললেন যে, আমি আপনার পরিচয় জানি না। আর আমার পরিচয় জানার তো আপনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি আপনার আপাদমস্তক দেখেই চিনতে পেরেছি যে, আপনি কোন শায়খ হবেন। আমার জন্য দু'আ করুন এবং আমার বাসায় হালাল গোশতের খাবার তৈরী আছে। আপনারা আসুন। আমি তার কাছে সময় অনেক অল্প বিধায় ওজর পেশ

করলাম। বললাম, আমাদের আজ রাত এখান থেকে সফর করে মস্কো পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে সামনে সফর করতে হবে। ইশার নামাযের সময় হয়ে গেল। তাই রেল স্টেশনে জামাতে নামায আদায় করি।

পাহারাদার মিলে গেল

নামায শেষে রাবেল তাজ উদ্দিন বললেন-হয়রত! রেলগাড়ী প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বললাম-চলুন! আমি আর আপনি গিয়ে কন্ট্রাকটর গার্ডের সাথে কথা বলব যে, আমাদের মস্কো যাওয়ার জন্য সিট দিন। কন্ট্রাকটর গার্ড এক বৃদ্ধা রুশ মহিলা ছিল। রাবেল তাকে বললেন, আমাদের সিটের প্রয়োজন। সে সরাসরি জবাব দিল, একটি সিটও খালি নেই। রাবেল আমার দিকে তাকালে তাকে বললাম, মহিলাকে বলুন, আমার সাথে এক মেহমান রয়েছেন। আমাদের যাওয়া জরুরী। এই মহিলা পুনরায় অস্বীকার করল। পাশেই এক রুশ তরুণী দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচনা শুনছিল। সে সামনে এসে কন্ট্রাকটার গার্ডকে বলল, আপনি তাদেরকে সিট দিতে অস্বীকার করবেন না। মহিলা বলল, আমার কাছে একটি সিটও নেই। তরুণী জিজ্ঞাসা করল, তাহলে বলুন তাদের যাওয়ার কী ব্যবস্থা হতে পারে? গার্ড বলল, গাড়ীর প্রথম ডাব্বায় আমার সিনিয়র অফিসার রয়েছেন, তার কাছে সিট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তরুণী বলল, আপনি একটি কাগজে দস্তখত করে দিন, আমি গিয়ে তার সাথে কথা বলব। কন্ট্রাকটর গার্ড তাকে একটি ছোট কাগজে দস্তখত করে দিল। সে এই কাগজ নিয়ে দৌড়ে প্রথমে ডাব্বায় গিয়ে থামল। রাবেল বললেন, হযরত! যেহেতু এই গাড়ীতে সিট খালি নেই। তাই আমরা পরের গাড়ীতে যাব। আমি বললাম, আমাদের কাজ দু'আ করা। আল্লাহ তাআলা রাস্তা বের করে দিবেন অবশ্যই। ইতোমধ্যে সেই তরুণী দৌড়ে আসল এবং রাবেল তাজউদ্দিনের হাতে একটি কাগজ দিয়ে বলল, আপনাদের জন্য চার সিটের ব্যবস্থা করেছি। সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। প্রথম কন্ট্রাকটার গার্ড জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাদের জন্য এমন করেছ কেন? সে বলল, এই মেহমান থেকে দু'আ নেওয়ার জন্য।

আমি রাবেলকে বললাম, তাকে মূল কারণ জিজ্ঞেস করুন। তরুণী বলল, আমি গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখি, আমি এক স্টেশনে দাঁড়ানো আর আপনি দাঁড়িয়ে আমার জন্য বিশেষ দু'আ করছেন। আমি এখান থেকে ৬০ কি.মি. দূর থেকে এসেছি। পুরো স্টেশনে আপনাকেই স্বপ্নের সাথে সম্পূর্ণ মিল পেয়েছি। আমি আপনার কাছে দু'আর আবেদন করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু ভয় হচ্ছিল। যখন কন্ট্রাকটর গার্ড আপনাদেরকে সিট দিতে অস্বীকার করল, তখন ভাবলাম, উত্তম সুযোগ হয়েছে, আপনাদেরকে সহযোগিতা করব, যেন আমার জন্য দু'আ করেন। এখন আমি আপনাদেরকে চারটি সিট এনে দিয়েছি। আমার জন্য দু'আ করবেন। আমি তার হেদায়াতের জন্য এবং সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দু'আ করি। সে আমাকে ধন্যবাদ জানাল।

ইতোমধ্যে গাড়ী প্রথম সতর্ক সংকেত বাজাল। মাওলানা বললেন, হযরত! আপনি গাড়ীতে চলে যান, আমরা পরের গাড়ীতে আসব। আমি বললাম মাওলানা! আমার তো পরেও সিট মিলবে। আপনারা যান। যদি আমাকে বিদায় করে দেন তাহলে আপনারা আগামী কাল পর্যন্ত সিট নাও পেতে পারেন।

রাবেল তাজউদ্দিন বললেন, হযরত! আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা চার সাথীকে গাড়ীতে বসিয়ে দিলাম। আমি, মাওলানা রাবেলসহ তিনজন থেকে গেলাম পরের গাড়ীতে আসব বলে। গাড়ীর দ্বিতীয় বাঁশি বাজানোর পর আমাদের সাথীরা ওঠে গেল এবং এই রুশ তরুণী গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়েছিল। তৃতীয় বাঁশি বাজানোর পর গাড়ী চলতে শুরু করল। রাবেল বললেন, এই তরুণী বহু দূর পর্যন্ত হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল।

আমি রাবেল তাজউদ্দিনবে বললাম যে, আপনাদের কোন কাজে অপরিচিত অমুসলিম লোক কি কোন সময় এভাবে সাহায্য করেছে। তিনি বললেন 'না'। আমি বললাম 'আল্লাহ তাআলার নামের বরকত যে, সময় সুযোগমতে কাজ করনে ওয়ালা মিলে যায়।

দু'ঘন্টা পর দ্বিতীয় গাড়ী আসল। রাবেল দৌড়ে গিয়ে কন্ট্রাকটর গার্ডকে বললেন, আমাদের তিনটি সিট প্রয়োজন। সে বলল, আমার কাছে সীট নেই। আমি বললাম আজ আমাদের যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। আপনি সিট দেখেন তারপর জবাব দিন। ইতোমধ্যে বগীর ভিতর থেকে দুই মহিলা নেমে এসে বলল, আমরা নেমে গিয়েছি দু'সিটে আপনারা যেতে পারেন। রাবেল বলল দু'সীটতো পাওয়া গেল, তৃতীয় সিটের কী হবে? সে বলল, তৃতীয়জন কে? রাবেল আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন। কন্ট্রাকটর গার্ড কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তাকে আমার রুমে শুইয়ে দিব। আমরা গাড়ীতে আরোহণ করি। কন্ট্রাকটর গার্ড আমাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিল এবং সে চেয়ারে বসে পুরো রাত কাটিয়ে দিল। পরের দিন ১০টায় মস্কো পৌছি। খবর নিয়ে জানা গেল আমাদের পূর্বের গাড়ী বিভিন্ন স্থানে থামার কারণে দেরী হয়েছে। তাই ১০ মিনিট পর এই প্লাটফর্মে এসে পৌছবে। আমরা তিনজন নিজেদের মালসামান এক স্থানে রেখে দ্বিতীয় গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি। যখন গাড়ী আসল এবং ইব্রাহীম আদহাম ও অন্যান্যরা আমাদেরকে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনারা বিমানযোগে এসেছেন? আমি বললাম না, গাড়ীযোগেই এসেছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দ্রুত পৌছিয়ে দিয়েছেন। আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করি, যিনি অল্প সময়ে এত লম্বা সফর করিয়েছেন।

মস্কোতে ট্রানজিট

খরকুফ থেকে ফিরে এসে দিনের নয়টায় মস্কো রেলওয়ে স্টেশনে পৌছি। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে বললাম, তাতারিস্তান সফরের জন্য আজ রাতেই রওয়ানা

করা উত্তম হবে। তাই ঐতিহাসিক মসজিদে যাওয়ার পূর্বে আমাদের টিকেট এখান থেকে ক্রয় করে নিতে হবে। মাওলানা ও রাবেল তাজউদ্দিন টিকেট খরীদ করার জন্য চলে গেল। আমি সাথীদেরকে নিয়ে একপাশে মালসামানের কাছে দাঁড়ালাম। দুই রুশ বংশোদ্ভুত তরুণী আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুরাকাবা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর আমীরে তৈমুরের হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে চোখ খুলে তাকালাম, জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে? আমীরে তৈমুর তরুণীদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এরা প্রথমত আপনাকে দেখছিল, পরস্পরে ঠেলাঠেলি করছিল। একজন বলল এই ব্যক্তি কতই না সুন্দর! তার চেহারাই কতই না আকর্ষণ রয়েছে। তাকে বল, আমাদের দু'জনের একজনকে বিয়ে করবে কি না? আমি বললাম, উভয়কে বলে দাও যে, মূল আকর্ষণ হল ইসলামে ধর্ম এবং আমার মাহবুব (সা)-এর সুন্নতের মধ্যে তোমরা দু'জন মুসলমান হয়ে যাও। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন, তোমাদের জীবন আলোকিত হয়ে যাবে। তারা উভয়ে উত্তরে বলল আমরা দীনের ব্যাপারে এই প্রথম শুনলাম। আমি বললাম, তোনরা সবাই ঐতিহাসিক মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করে নিও। তারা বলল, আমরা প্রভাবিত হয়েছি এবং মুসলমান হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নেই। আমি বললাম, কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে নাও। তারা বলল, পড়িয়ে দিন। আমি কালিমা শাহাদাত পড়াতেই রেলগাড়ী বাঁশি বাজাল। তারা বলল, আমাদের গাড়ী অল্প সময়ের মধ্যে ছেড়ে যাবে। আমরা ইমাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করব, তবে আপনার সাথে কীভাবে যোগাযোগ করতে পারি? আমি রাবেল তাজউদ্দিনের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, তাদের কোন নাম্বার নিয়ে নিন। তারা মস্কোতেই অবস্থান করে। আমীরে তৈমুর দ্রুত একটি কাগজে ফোন নম্বর লিখে দিলেন এবং দুই তরুণী দৌড়ে অন্য প্লাটফর্মে চলে গেল। আমীরে তৈমুর আমার কাছে এসে বললেন, হযরত! এমন রূপসী তরুণীদের পিছনে এখানকার যুবকরা পাগল হয়ে ঘুরে। আশ্চর্যের কথা হল, যা আমি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি যে, তারা আপনারা পায়ে এসে পড়েছে।

মওলানা ও রাবেল আসার পর আমরা ঐতিহাসিক মসজিদে আসি। আমীরে তৈমুর খুব মজা করে তাদেরকে দুই তরুণীর কাহিনী শোনাল। ইব্রাহিম আদহাম এক ঘটনা শোনাল যে, আমরা যখন লেনিনগ্রাদে রুশ সম্রাটের আলীশান প্রাসাদ দেখছিলাম তখন এক মহিলা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এই লোককে কোন রাষ্ট্রের সম্রাট মনে হচ্ছে। আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ তিনি রূহানী জগতের সম্রাট। তার স্বামী বলল, তার হেফাজতের জন্য কী রয়েছে? আমি বললাম, আমরা ছয় জন রয়েছি। সে বলল ঠিক আছে। এমন লোক আমাদের রাষ্ট্রের জন্য নিয়ামত। তাদের মূল্যায়ন করা উচিত।

সপ্তম অধ্যায়

তাতারিস্তান সফর

রাত দশটায় মস্কো থেকে রেলযোগে গোর্কির উদ্দেশ্যে সফর শুরু করি। রাশিয়ার এই অঞ্চল অধিকাংশ তাতার বংশোদ্ভূত লোকদের আবাসভূমি। এই অঞ্চল কোন এককালে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন অধিকাংশ যুবকদেরকে নাস্তিকে পরিণত করে ফেলে এবং প্রবৃত্তির দাস বানিয়ে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাতারিস্তানের প্রথম বড় শহর গোর্কি প্রায় দশ ঘন্টা সফর করার পর গন্তব্যস্থলে পৌছি।

গোর্কি সফর

রেলগাড়ী থেকে নেমে পড়াকালে পরামর্শ করি, কীভাবে যেতে পারি? এই শহরে কোন লোকের পরিচয় আমাদের জানা নেই। রাবেল তাজউদ্দিন ও মাওলানা আব্দুল্লাহ আমার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি বললাম, 'বলুন! আমরা কার মেহমান? তারা বললেন, আল্লাহর মেহমান। আমি বললাম, কোন ইতস্তত না করে সোজা মসজিদে চলে যাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের মেজবানী করবেন। এই কথা সাথীদের অন্তরে খুব লেগে যায় এবং সবাই খুশীর সাথে মসজিদে যেতে তৈরী হয়ে যায়। মাওলানা বললেন হযরত আমি তো কোন মসজিদ চিনি না। আমি বললাম, কোন কথা নেই। আপনি গিয়ে কোন এক ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে জেনে নিন। কেউ না কেউ অবশ্যই আমাদেরকে মসজিদ পর্যন্ত পৌছে দিবে। কয়েক মিনিট পর রাবেল তাজউদ্দিন এক ড্রাইভার খুঁজে নিয়ে আসলেন যে আমাদেরকে আধা ঘণ্টার মধ্যে এক আজীমুশ্শান মসজিদের গেটের সামনে নামিয়ে দিল। ইব্রাহিম আদহাম দ্রুত মালসামান উঠিয়ে মসজিদের দরজার সামনে পৌছে দরজা তালাবদ্ধ অবস্থায় পেলেন। তখন সবাই আমার দিকে তাকাতে শুরু করলেন। আমি বললাম, দেখুন এবং কল্পনা করুন যে, আমরা এক শাহানশাহর প্রাসাদের গেটের সামনে ভিক্ষুকের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি। আমরা মনে মনে দু'আ করি। আল্লাহ তাআলা মসজিদ খোলার ব্যবস্থা করে দিবেন।

গোর্কি শহর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। তখন এত প্রবল বেগে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল যে, কয়েক মিনিট বাইরে দাঁড়ানোর ফলে দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হতে লাগল। সাইবেরিয়া থেকে প্রবাহিত ঠাণ্ডা বাতাসে বুক ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ

পর এক লোক মসজিদের ভিতর থেকে দরজার সামনে এসে বলতে লাগল, আপনারা কারা? কী চান? মাওলানা বললেন, আমাদের প্রাণ চলে যাচ্ছে, কয়েক ঘণ্টার জন্য এখানে এসেছি; যেন কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে মুলাকাত হয়ে যায়। সে দরজা খুলে বলল, আপনারা ভিতরে আসুন। আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করি তখন কামরার ভিতরের গরমের মধ্যে আমাদের শান্তি অনুভব হচ্ছিল, যেমন শান্তি অনুভব হয় পানির মধ্যে মাছের। কিছু সময় কথাবার্তার পর আমরা ঘুমিয়ে যাই এবং দিনের বারটার সময় ঘুম থেকে জাগি। ওযু করে অবসর হতেই মসজিদের ইমাম খতীব মাওলানা মুহাম্মদ ওমর আগমন করলেন। তিনি মাদরাসা মীরে আরব, বুখারা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেছেন। তাই উজবেকিস্তানের উলামা-ছুলাহাদের সম্পর্কে অবগত আছেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ যখন বললেন, মুফতিয়ে আযম সমরকন্দ, মুফতিয়ে আযম নামগান, মুফতিয়ে আযম কাওকান এবং মুফতিয়ে আযম জাম্বুল তারা বায়আত হয়েছেন, তখন মাওলানা ওমর অজান্তেই বলে উঠলেন, হযরত! আমাকেও বায়আত করে নিন।

আমি বললাম, যোহরের নামাযের পর অল্প বয়ান করব এবং বায়আত করাব। মাওলানা মুহাম্মদ ওমর নওজোয়ান আলেমে দীন। অন্তরের নূর তার চেহারায় প্রজ্বলিত হচ্ছিল। কয়েক মিনিটের পরিচয়ের পর তিনি তার বাসায় গিয়ে সদ্য পাকানো গরম গরম খাবার নিয়ে এলেন। আমরা খাবারের উপর এমনভাবে হামলা করি, যেভাবে কোন মুজাহিদ শত্রুর উপর হামলা করে। খানা খাওয়ার পর মসজিদ আযান হল। মাওলানা ওমর বললেন, এই মসজিদ ১৯০৫ খৃ. নির্মিত হয়। এর মিনার খুব সুন্দর ও উঁচু ছিল। কমিউনিস্টরা এই মিনারকে ভেঙ্গে দেয় এবং মসজিদকে গুদাম ঘরে পরিণত করে। এখন আজাদী অর্জনের পর নতুন করে মিনার নির্মাণ করা হয়েছে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদ খুলে দেওয়া হয়েছে। মাওলানা ওমর মসজিদ সংলগ্ন জমিতে দীনী শিক্ষার জন্য মাদরাসা চালু করার ইচ্ছা করেছেন।

যোহরের নামাযের পর আমি দীন প্রচার-প্রসার ও দীনী মাদরাসা স্থাপনের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে বয়ান করি। মাওলানার অবস্থা লক্ষ্যণীয় ছিল। খুশীর আতিশয্যে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়ছিল। নামাযীরা খুব প্রভাবিত হলেন। বয়ান শেষে মাওলানা ওমর নিজেই ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি বায়আত হতে ইচ্ছুক তিনি এই পাগড়ীতে ধরুন। মসজিদের সকল মুসল্লীও মাওলানা ওমর বায়আত হলেন। আমি মাওলানা আব্দুল্লাহকে ছয়টি আমলের বিস্তারিত বলে দেওয়ার দায়িত্ব দেই। মাওলানা যখন তার আলোচনা শেষ করলেন তখন এক স্থানীয় লোক ইব্রাহিম আদহামকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমাকে রুশ বংশোদ্ভুত মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, আমি হযরতের এক নগণ্য মুরীদ। এই লোক অনুরোধ করল,

আপনি আপনার বায়আত হওয়ার ঘটনা ও শায়খের সাথে মুলাকাত হওয়ার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

ইব্রাহিম আদহাম তার বায়আত হওয়ায় ও আমার সাথে মুলাকাতের ঘটনা এমন চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপন করল যে, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে গেল। মাহফিল শেষে সকল মুসল্লী ইব্রাহিম আদহামের কপালে চুমু দিল। আমার ব্যাপারে তাদের ধারণা হচ্ছিল যে, আমি আউলিয়ায়ে নকশবন্দীয়ার এক সঠিক প্রতিনিধি। যার হাতে রুশ বংশোদ্ভুত লোক ইসলাম কবুল করেছে। ইব্রাহিম আদহাম যখন বললেন যে, আমার মুলাকাত ঐ সময় শুরু হয়েছিল। যখন হযরত ক্রীমলেনের ক্ষমতাবানদের অন্তরে তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ ওমর একথা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে যান এবং আরয করেন যে, আপনাকে আমি আমরা গাড়ীতে করে শহরে নিয়ে যাব। আপনি আমাদের নেতৃস্থানীয়দের অন্তরে তাওয়াজ্জুহ দিবেন। আমাদের স্টেশনে যাওয়ার আরও তিন ঘণ্টা সময় বাকী ছিল তাই মাওলানার সাথে শহরে চলে যাই। মাওলানা বললেন গোর্কি শহরে অস্ত্র তৈরীর ফ্যাক্টরী রয়েছে। এখানে তোপ, ট্যাংক এবং বিমান তৈরীর কারখানাও রয়েছে। তাতার লোকদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, গোর্কিতে পয়সা উৎপাদন হয় এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাদে খরচ হয়। আমি অস্ত্র তৈরির এক আশ্চর্য ফ্যাক্টরী দেখি। গোর্কি শহর অত্যন্ত সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এই শহরের প্রশাসক ইয়াহুদী ছিল কিন্তু খৃস্টান মিশনারীগণ খুব কাজ করছে। মাওলানা আব্দুল্লাহ পরামর্শ দিলেন যে, আমরা শহরে পৌঁছেছি। সুতরাং রাতের সফরের খাবার এখান থেকে খরীদ করে নিতে হবে। আমি মাওলানা ওমর ও মাওলানা আব্দুল্লাহকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি। কিছুক্ষণের মধ্যে পথিকরা আমার চারপাশে সমবেত হয়ে গেল। এক মহিলা ইব্রাহিম আদহামকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কে? তিনি বললেন, 'আমাদের শায়খ! মহিলা বলল, আমার কিছু প্রশ্ন আছে, এর উত্তর জানতে চাই। আমি বললাম, খুব ভাল কথা। মহিলা বলল, মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঈসা আ. আকাশে এবং হযরত মুহাম্মদ সা. কবরে সমাধিস্থ। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা আ. শ্রেষ্ঠ নবী। আমি বললাম, প্রথমতঃ দুটি কথা ভাল করে বুঝে নাও।

প্রথম কথা হল, সর্বদা উপরের বস্তু শ্রেষ্ঠ বা উত্তম হয় না। কত কত পাখী গাছের উপর বাস করে কিন্তু মূলত মানুষ শ্রেষ্ঠ। তাছাড়াও সমুদ্রের পানির উপর ফেনা হয় এবং নিচে হীরক ও মোতি হয়। সুতরাং আকাশের উপর হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়। দ্বিতীয় কথা হল, খৃস্টানরা তো দাবী করে ঈসা আ.-কে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাকে জীবিত আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এটা

তো মুসলমানদের আকীদা। যদি তুমি মুসলমানদের কথা বিশ্বাস কর; তাহলে একথাও বিশ্বাস করে নাও যে, তিনি কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ সা.-এর উম্মত হিসাবে জীবন যাপন করবেন। একথা শুনে এই মহিলা লা জওয়াব হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, আপনি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। ফিরে আসার পর মাওলানা ওমর আমাদেরকে মসজিদের মিনারের উপরে গিয়ে গেলেন, আমরা পুরো শহরের দৃশ্য অবলোকন করি। শহরের পাশ ঘেষে এক সমুদ্র প্রবাহিত হয়েছে। মাওলানা ওমর বললেন, যে ঠাণ্ডার সময় সমুদ্রের পানিতে বরফ জমে যায়। সাঁতার প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারিত স্থানে সাঁতারুরা দূর দূরান্ত থেকে এসে সাঁতার কাটে।

মাগরিব নামাযের পর আমাদের গাড়ী রওয়ানা হওয়ার কথা। তাই আমরা আসরের নামাযের পর মাল-সামান নিয়ে রেলস্টেশনে এসে পৌছি।

কাযানে অবস্থান

মাগরিবের সময় প্লাটফর্মে জামাআত পড়ি। তখন লোকজন উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদেরকে দেখতে লাগল। নির্ধারিত সময়ে আমরা গাড়ীতে আরোহন করি। এদিকে ইব্রাহিম আদহাম ঠাণ্ডা পানির জন্য বাইরে গিয়ে আসতে অনেক দেরী করেন। দেরী করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করতে লাগল যে, তোমাদের সাথে এই লাঠিওয়ালা লোকটি কে? আমি বললাম, তিনি আমাদের শায়খ। সে বলল, তোমরা তার সাথে কেন? আমি বললাম, আমি তার দোভাষী। ইহুদী বলতে লাগল, আমি ও তুমি রুশ বংশোদ্ভূত লোক। এই মুসলমান লোক এখানে এসে তার দীনী প্রচার করছে। তোমার উচিত তাকে ভ্রান্ত পরামর্শ দিয়ে তার সময়ও মালের ক্ষতি করা। আমি বিতর্ক এড়িয়ে চুপচাপ চলে এসেছি। আমি বললাম, ইয়াহুদী ও হিন্দু-সম্প্রদায় মুসলমানদের বড় শত্রু। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করি–

أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ـ

(ঈমানদারদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ইয়াহুদী ও মুশরিকরা।)

ইব্রাহিম আদহাম বললেন, হযরত! তাদের সাথে মিলে-মিশে থাকার এমন কোন পথ আছে কি? আমি বললাম, এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা তাদের অনুগত হয়ে যাবো।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَنْ تَرضٰى عَنكَ الْيَهُودُ ولا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ـ

(ইয়াহুদী খৃস্টানরা তোমাদের উপর কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের ধর্মের অনুসরণ কর।)

মাওলানা আব্দুল্লাহ বললেন, হযরত! এর চেয়ে বড় দলীল আর কী হতে পারে?

কাযান শহর অতীতকালে ইসলামের বড় কেন্দ্র ছিল। এই শহর এত ওলামায়ে কেরাম বাস করতেন যে, প্রতি বছর ইসলাম সম্পর্কীয় তেইশ হাজার নতুন কিতাব ছাপানো হত। এই শহরের এক আলেম হামযা লেনিনগাদে কুরআন শরীফের ছাপাখানায় তৈরী করেছে। এখানকার অধিবাসীরা স্বভাবগতভাবে দীনদার। তারা তাতারী হওয়ায় গর্ববোধ করে থাকে। এই শহরে তুর্কী আলেমগণ অধিকসংখ্যক মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করছে। সউদি আরব থেকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য আসছে। আমরা এখানকার কেন্দ্রীয় মসজিদে পৌঁছলে মসজিদের ইমামও খতীব সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি অপরিচিত লোকের ন্যায় আচরণ করেন। হয়ত তিনি ধারণা করেছেন, আমরা বিদআত বিস্তার করার জন্য এখানে এসেছি। মাওলানা আব্দুল্লাহর বলার দ্বারা খতীব সাহেব বললেন, 'মাত্র পনের মিনিট বয়ান করার অনুমতি দিচ্ছি। আর বয়ানের অনুবাদ আমি নিজে করব। বয়ান শেষ হওয়ার পর শ্রোতাগণ উঠে চলে গেল। আমি পেরেশান হয়ে গেলাম যে, পুরো সফরে এই প্রথম কোন লোক সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। খতীব সাহেব আমার সাথে মুসাফাহ করে চলে গেলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ আমার কাছে এসে বললেন, হযরত! খতীব সাহেব বয়ান করার সময় তার পক্ষ থেকে বলেছেন যে, বায়আত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ হতে চান, তাহলে স্বদেশের কোন শায়খের কাছে হয়ে যাবেন। বিদেশী শায়খ তো আজ আছে কাল নেই। এ কারণেই লোকজন দু'আ শেষে চলে গেছে। আমি মাওলানাকে বললাম, 'আল্লাহ তাআলা যদি সিলসিলার প্রচার-প্রসার মঞ্জুর করেন, তাহলে কোন লোক ঠেকাতে পারবে না। আমরা যখন কথা বলছি তখন এক যুবক আসল এবং মাওলানাকে বলল যে, আমি এখানের মাদরাসার ছাত্র। আমরা পাঁচজন ছাত্র এই শায়খের কাছে বায়আত হতে চাই। আমার সিঁড়িবিশিষ্ট কামরায় অপেক্ষারত আছি। অতঃপর ছাত্রদের কামরায় গিয়ে তাদেরকে বায়আত করি।

যুলুমের উপর যুলুম

আমরা মাগরিবের নামাযের পর উফা যাওয়ার কথা। কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসা করেছি যে, ভাই! উফা কীভাবে যেতে হয়? সবাই বলেছে, বিমানযোগে যেতে হয়। রেলগাড়ী দিয়ে যাওয়া যায় কি না জিজ্ঞেস করলে সবাই উত্তর দেয় জানি না বলে।

আমার কাছে রাশিয়ার মানচিত্র ছিল। এর মধ্যে যখন কাযান ও উফা শহর দেখি তখন মনে হয় কাছাকাছি। কিন্তু লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলে মনে হয়

এক শহর থেকে অন্য শহর অনেক দূর। আমি বললাম, আমরা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে সেখান থেকে বেশি কিছু জানতে পারব। আমরা ট্যাক্সিযোগে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। আমি ম্যানেজারের কক্ষে গিয়ে জানতে চাইলাম, আমরা উফা যেতে চাই, কীভাবে যেতে হবে? তিনি উত্তর দিলেন, বিমানযোগে যেতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি অন্য কোন রাস্তা আছে কিনা? তিনি বললেন, আমার অন্য কোন রাস্তা জানা নেই। আমি বললাম, আপনি আমাকে রেলওয়ে একটি ম্যাপ দিন। তিনি একটি ফাইল থেকে ম্যাপ বের করে দিলেন।

দেখে বোধগম্য হল যে, শহর এতটুকু নিকটবর্তী যে, উভয়ের মাঝে তিনশত কি.মি. এর দূরত্ব বিদ্যমান। কিন্তু কমিউনিস্টরা চিন্তা করল যে, যদি উভয় শহরের লোকজন একে অপরের সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারে, তাহলে তারা তাদের নিজস্ব রীতি-নীতির উপর অটল থাকবে। তাদের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই তারা দুই শহরে মাঝে কোন রাস্তা বা রেল লাইন তৈরী করেনি। বিমানযোগে যাতায়াত করা সবার জন্য এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং সত্তর বছরের মধ্যে দুই শহরের অধিবাসীরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমি রেললাইনের ম্যাপ দেখে হিসাব করলাম যে, যদি আমরা রেলগাড়ী দিয়ে যাই, তাহলে কীভাবে সম্ভব! বুঝতে পারি যে রাস্তায় দুইবার গাড়ী পরিবর্তন করে উফা যেতে হবে। অতঃপর এক হাজার কি.মি. এর দীর্ঘ সফর করে আমরা উফা পৌঁছি।

উফায় অবস্থান

উফা খুব সুন্দর শহর, তাতারিস্তানের রাজধানী এর পাশেই। এত সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হল যে, দেখামাত্রই মুখ থেকে নিজের অজান্তেই এই আয়াত বের হয়ে গেল–

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ

(অতঃপর বরকতময় আল্লাহ্ উত্তম সৃষ্টিকর্তা)

হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, রাসূল সা. এর কাছে সবুজ-শ্যামল এবং নদী-নালার স্থানসমূহ অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। ফুলের মধ্যে গোলাপ ফুল খুব প্রিয় ছিল। এ কারণেই হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুভী রহ. গোলাপ বেশি পছন্দ করতেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের বাগানে গোলাপফুলের গাছ অত্যন্ত যত্নের সাথে লাগানো হত। একটি গাছ 'কেকর' (বাবলা) লাগানো হয়েছিল। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, বায়আতে রেদোয়ান যে গাছের নিচে হয়েছিল তা এই কেকর গাছ ছিল। বরকত অর্জন করার নিমিত্তে দারুল উলূম দেওবন্দে লাগানো হয়েছে।

কিতাবের মধ্যে লিখেছে যে, ফার্সী ভাষায় গোলাপ ফুলকে 'গুলেসরখ' হিন্দি ভাষায় 'গোলাপ কা ফুল' ইংরেজী ভাষায় 'রুয' সংস্কৃত ভাষায় 'সাতা পাথরী' আরবী ভাষায় 'ওরদে আহমার' বলা হয়। ইতিহাস ঘাটলে জানা যায় যে, এর বংশ হযরত আদম আ. অবতরণের পূর্ব থেকে এই দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিল।

রোমান সম্রাট সবচেয়ে বাহাদুর জেনারেলকে গোলাপ ফুল হাদিয়া দিতেন।

মার্ক এন্টনী আত্মহত্যা করার পূর্বে ক্লিওপেট্রাকে তার কবরকে গোলাপ ফুল দিয়ে ঢেকে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে দিয়েছিল। যখন ক্লিওপেট্রা সর্বপ্রথম মার্ক এন্টনী তার মহলে দাওয়াত করেছিল, তখন পুরো রাস্তা গোলাপ ফুলের পাপড়ী দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহলের যেই কামরায় দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানকার প্রতিটি গোলাপের পাপড়ীর বিছানা ছিল।

প্রসিদ্ধ ইরানী কবি ওমর খৈয়ামও গোলাপ ফুলের প্রেমিক ছিলেন। ওমর খৈয়ামের চতুস্পদী কবিতার ইংরেজী সাঁচে রূপ প্রদানকারী প্রসিদ্ধ অনুবাদক এডওয়ার্ড ১৮৮৩ ইং যখন মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন তার সমাধিতে ওমর খৈয়ামের কবর থেকে গোলাপের কলম আনিয়ে লাগানো হয়েছিল। শেক্সপিয়ার কয়েক স্থানে এই ফুলের প্রশংসা করেছেন। খলীফা মামুনুর রশীদের নারিস্তান থেকে যে খারাজ আসত এর মধ্যে গোলাপজলের তিন হাজার বোতল অন্তর্ভুক্ত থাকত। বাদশাহ বাবর আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ বাগানবাগে ওফাতে গোলাপের দশ হাজার চারা লাগানো হয়েছিল। বাবর তার মেয়েদের নাম গুলবদন, গুল চেহারা, গুল রঙ ইত্যাদি রেখেছিল।

নূরজাহান গোলাপের আশেক ছিল। গোলাপের আতর সর্বপ্রথম লাহার তৈরী করা হয়। পাকিস্তানের চুঁআসিদন শাহ-এর গোলাপ প্রসিদ্ধ। ভারতে আকবরাবাদী গোলাপ প্রসিদ্ধ। অনেকে গোলাপ ফুলের নামে নাম রাখে। যেমন মহারাজা গোলাপ সিং, গোলাপ দীন, গোলাপ রায় ইত্যাদি। লাহোরের এক হাসপাতাল গোলাপ দেবীর নামে প্রসিদ্ধ। এ সমস্ত আলোচনা ইতিহাসের পাড়া থেকে করা হল। কিন্তু মুসলমানদের তো গোলাপ এই জন্য প্রিয় যে, আমাদের মহানবী সা.-এর কাছে গোলাপ প্রিয় ছিল।

কেন্দ্রীয় মসজিদে পৌছে জানা গেল যে, 'মুফতিয়ে আযম তাতাকিস্তানের কার্যালয় এখানেই অবস্থিত। কিন্তু তিনি কোন এক কাজের জন্য শহরের বাইরে গিয়েছেন। তার সহকারীর সাথে আমার মুলাকাত হয়। সহকারী মুফতী আমাকে জুমআর খুতবা দেওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। আমি রাজী হয়ে যাই। অতঃপর বয়ান করি এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ তরজমা করলেন। উপস্থিত সবাই অন্তর খুলে আনন্দ প্রকাশ করল। আমার কোন সফরে এত নারা কখনও দেওয়া হয়নি। আমার

আশ্চর্য লাগছিল। নামায শেষে মাওলানা বলল, হযরত! আজকের বয়ান ঐতিহাসিক বয়ানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উফাবাসী দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ বয়ান স্মরণ করবে। আপনি এই লোকদেরকে মূল্য ছাড়া খরীদ করে নিয়েছেন। অনেক লোক বায়আত হল এবং আমাকে চুমু দিতে দিতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আধামরা করে ফেলে।

বৃদ্ধ মহিলার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ

জুমআর নামাযের পর রাবেল তাজউদ্দিন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, আমাদের আগামীকাল উফা থেকে বিমানে তাশখন্দ যেতে হবে। সুতরাং আজই টিকিট ক্রয় করতে হবে। খাবার শেষে আমরা চারজন এয়ারপোর্ট গেলাম। রাবেল তাজউদ্দিনের ধারণা ছিল, আমার টিকিট ডলারে অনেক মূল্য হবে। অথচ অন্যান্য টিকিট কম মূল্যে ক্রয় করা যাবে। কিন্তু টিকিট বিক্রিকারী মহিলা আমাদের সবার টিকিট রুবল দিয়ে তৈরী করেছিল। আমি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে জবাব দিল, নিয়ম হল বিদেশী লোকদের টিকিট ডলারে বিক্রি করা যা স্থানীয় লোকদের টিকিট থেকে দু'গুণ বেশি। কিন্তু যেহেতু আপনার টিকিট তৈরী করে দিয়েছি সেহেতু আপনি এর দ্বারাই সফর করুন।

স্টেশনে ম্যানেজার আমার বন্ধু। আমি তার থেকে বিশেষ সুবিধা নিয়ে নিব। আমি আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করি। হিসাব করে দেখা গেল যে এই টিকিট ডলার দিয়ে খরীদ করলে এত টাকা লাগত, যা দিয়ে রাশিয়ার বিভিন্ন শহর সফর করা সম্ভব। আমরা চারজন দাঁড়িয়ে কথা বলছি এই মুহূর্তে এক বৃদ্ধ মহিলা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। মাওলানা আব্দুল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করল, কী বলতে চান? সে জবাবে বলল, তোমরা চারজন আর আমিসহ পাঁচজন। সবাই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হাসিতে ফেটে পড়ল। রাবেল বলল এই মহিলা অত্যন্ত প্রিয় শব্দ দিয়ে তার ভালবাসা প্রকাশ করেছে। আমি বললাম তার জন্য হেদায়েতের দু'আ করা আমাদের কর্তব্য। অসম্ভব কিছু নয়, হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাকে মুসলমান বানিয়ে দিতে পারেন। কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের কাতারে শামিল করে দিতে পারেন।

মনের জানালা দিয়ে

ফেরার সময় সাথীদের লতীফাসমূহ তাজা করে দেই। আমীরে তৈমুরের কলব জারী হয়ে গিয়েছিল। সে দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা মুরাকাবা করত। রাবেল তাজউদ্দিন জুমআর দিন আরবী জুব্বা পরিধান করলেন এবং পাগড়ী বাঁধলেন। তখন তাকে খুব সুন্দর লাগছিল। ইব্রাহিম আদহাম আমার দৃষ্টিতে খুব মেধাবী ছিল। সুন্নতী লেবাসের সাথে তার এত ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে যে, সে এর উপর পাগলপারা হয়ে গেল। লোকদের শরীর থেকে ইংরেজী পোশাক খুলবে এবং সুন্নতী লেবাসে

পরিধান করাবে এই তার নেশা। সফরের সময় কয়েকজন ওলামায়ে কেরাম এই কথা শুনে সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হল। আবু উসমানের চুপচাপ থাকার স্বভাব। কিন্তু ওকুফে কালবীর খেয়াল রাখার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে।

অতঃপর যখন আমরা এয়ারপোর্টে পৌছি, বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার জন্য লাউঞ্জে প্রবেশ করি। এর কিছুক্ষণ পর এক বিমানবালা এসে আমার হাতে চুম খেতে লাগল। আমি দ্রুত পিছনে গিয়ে রাবেল তাজউদ্দিনকে ডেকে বললাম, তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কী চায়? বিমানবালা বলল, আমি এই ব্যক্তির হাতে চুমু দিতে চাই। রাবেল জিজ্ঞেস করল, এর কারণ কী? সে বলতে লাগল, আমার পিতা-মাতা অত্যন্ত সৎ ছিলেন। কিন্তু আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছি। আমি মদ ও তারুণ্যের জীবনের স্বাদ লুটছি। এখন আমার পিতা-মাতা মরে গেছে। এই শায়খকে দেখে আমার পিতার কথা স্মরণ হয়েছে। আমি আমার মনের জানালা দিয়ে দেখছি যেন পিতা আমাকে বলছে যে, তুমি এই শায়খের বান্দী-দাসী হয়ে যাও এবং তার উপদেশ অনুযায়ী জীবনযাপন কর। এই কথা বলে সে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। আমি পিছনে সরে গেলাম আর সে সেজদারত অবস্থা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। আমাদের সবার জন্য এটা ছিল একটি বিস্ময়কর অবস্থা। গায়রে মাহরাম হওয়ার কারণে কেউ তাকে উঠাচ্ছেও না। দীর্ঘক্ষণ এই অবস্থা বিরাজ করল।

আমি রাবেল তাজউদ্দিনকে বললাম, তাকে উঠতে বলুন এবং আমার কথা শুনতে বলুন। অতঃপর সে মাথা উঠাল। আমি তাকে পাশের সিটে বসিয়ে তওবা করিয়ে বায়আত করাই। রাবেল তাকে আমল ও অজীফা বিস্তারিত বুঝিয়ে দিল। সে রাবেলকে বলল, এই শায়খকে আমার একটি ছোট তামান্না পুরো করার সুযোগ দিতে বলব আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী তামান্না? সে বলল, আমি যদি তার শরীর স্পর্শ না করতে পারি, তাহলে তার কাপড়ে চুমু দিতে ও চোখে লাগাতে অনুমতি চাই। হতে পারে এর ফলে আমার গোনাহ মাফ হবে। মাওলানা বলল, হযরত! শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা না থাকলে এই মহিলার তামান্না পুরো করার সুযোগ দিন। তাকে নিষেধ করবেন না। আমি চুপ রইলাম। এই মহিলার ভালবাসা ও বিশ্বাস দেখে আমীরে তৈমুর উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত সবাই কাঁদলেন। এই সময় বিমান ছাড়ার ঘোষণা হয়ে গেল। তাই আমরা ক্রন্দনরত অবস্থাতে বিমানে আরোহন করি এবং তাশখন্দের সিয়াহত হোটেলে পৌছে ক্ষান্ত হই। তিনদিনের মধ্যে পরবর্তী সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং বিমানযোগে দাগিস্তান পৌছি।

অষ্টম অধ্যায়

কুহেকাফের দেশে

দাগিস্তান অঞ্চল রাশিয়ার অন্তর্গত ঐ সমস্ত মুজাহিদদের আবাসভূমি, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন কঠোরহস্তে প্রতিহত করেছিল এবং নতুন কৃষ্টি কালচার নিজেদের থেকে দূরে রেখেছিল। এখানকার অধিকাংশ এলাকা খুব সুন্দর ও সবুজ-শ্যামল পাহাড়ী এলাকা। অধিবাসীরা বর্ণনাতীত সুন্দর। কাজল কালো চোখ মিচমিচে কালো চুল, লাল ও ফর্সা চাঁদের মত চেহারা। দেখে অনুভব হয়, যেন কোন কবির কাল্পনিক প্রেমাস্পদ এখানে বসবাস করছে।

এখানকার মহিলাদের এরূপ সৌন্দর্যের ফলে এদের কোহেকাফের পরী বলা হয়। ছোট ছোট বাচ্চারা এত সুদর্শন, নরম ও তুলতুলে যে, তাদেরকে দেখল হযরত ইউসুফ আ. এর সৌন্দর্য ও জামালের কথা স্মরণ হয়ে যায়। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, তাদের বাহ্যিক রূপ যেমন সুন্দর, আভ্যন্তরীণ অবস্থা এর চেয়ে অধিক সুন্দর। এখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। ফলের আধিক্যের কারণে খাবারের ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তা নেই। পশু চড়ানোর ফলে গোশত ও দুধের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। দাগিস্তানের প্রত্যেক বস্তিতে মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসা রয়েছে। জনসাধারণ অনায়াসে আরবী ভাষা বলতে পারে। উলাম ছুলাফা অনেক রয়েছেন। প্রতিটি সন্তানের জন্য দীনী শিক্ষা অর্জন করা অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্যের অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে হাজার মাইল দূরের অধিবাসী এই সমস্ত লোকেরা পরহেজগারী ও আল্লাহ ভীতিপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত।

খোদাদ্রোহিতার নৃত্য যাদের সামনে

রাশিয়াতে যখন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এল এবং সমাজতন্ত্র লেনিনগ্রাদ থেকে দরিয়ায়ে আমুর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেল, তখন দাগিস্তানে ওলামায়ে কেরাম জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করলেন। নকশবন্দী মাশায়েখদের দু'আ তাদের জিহাদী তৎপরতার মধ্যে আরও শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। রুশ সৈন্যরা চল্লিশ বছর যাবত সংগ্রাম চালিয়ে গেল। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে সফল হতে পারেনি। ইমাম শামিলের নেতৃত্বে মুসলমান মুজাহিদগণ এমন বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন যে, আজ তাদের বিজয়গাঁথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খচিত হয়ে আছে। স্বল্প উপকরণ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সত্ত্বেও মুজাহিদরা তাদের কথা ও কাজে সঠিক প্রমাণিত

হয়েছে। রাশিয়ান নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ বন্ধ করার প্রস্তাব দিল। তারা বলল, আপনাদেরকে ইজ্জত সম্মানের সাথে আপন স্থানে থাকতে দেওয়া হবে। আপনারা স্বধর্ম পালনে স্বাধীন হবেন। রাজত্ব আপনাদের এবং আপনাদের লোকদেরই শাসন হবে। শুধু তিনটি বিষয় এক হবে। সেগুলো হলো–

(১) সৈন্য কেন্দ্রীয় হবে (২) মুদ্রা এক হবে।

(৩) যোগাযোগের জন্য রুশ ভাষা গ্রহণ করতে হবে।

কাফেররা গোস্বায় দাঁত কড়মড় করতে থাকে এবং মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে কাফেরদের বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও দীন ইসলামের উপর অটুট থাকে। বর্তমান সময়ে এটাকে ইসলামের মুযেজা বলা যেতে পারে।

আসলাফদের স্মরণ বৃদ্ধি

আমি মাওলানা আব্দুল্লাহ, ইব্রাহিম আদহাম এবং রাবেল তাজউদ্দিন একসাথে দাগিস্তানের বিমানবন্দরে অবতরণ করি। সেখানে মাওলানা মুহাম্মদ রাসূলকে অভ্যর্থনার জন্য বিদ্যমান পাই। বৃহস্পতিবার স্থানীয় লোকদের সাথে মুলাকাত করতে অতিবাহিত হয়ে যায়। জুমআর খুতবার জন্য লোকদের পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ইশকে ইলাহী সম্পর্কে বয়ান করি, যা সবাই অত্যন্ত পছন্দ করেছে। অনেক লোক সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হল। জুমআর নামাযের পর খানা থেকে অবসর হলে মাওলানা মুহাম্মদ রাসূলের এলাকার যাওয়ার জন্য রওয়ানা করি। তিন ঘন্টাব্যাপী পাহাড়ী এলাকায় সফর খুবই আনন্দদায়ক হয়। স্থানে স্থানে ঝর্ণা, তৃণভূমি, মাঠ প্রত্যক্ষ করি। এলাকাটি পাহাড়ী উপত্যকায় অবস্থিত। লোকদের চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছু প্রাচীন আরবী লোকদের ন্যায়। হায়াতে সাহাবা পাঠ করে যা কল্পনা হয়, স্থানীয় লোকদের জীবন-যাপন হুবহু তাদের ন্যায়।

প্রত্যেকটি লোক নিয়মিত নামাযী, সবদিকে শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী। তারা স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষায় কথা-বার্তা বলা অধিক পছন্দ করে। অধিকাংশ বাড়ি বড় ও প্রশস্ত। প্রত্যেক বাড়িতে উট এবং বকরীর জন্য আস্তাবল রয়েছে। ঘোড়া-গাধার সওয়ারী ব্যাপক। খাবারের জন্য পুরো জানোয়ারের চামড়া উঠিয়ে আগুনে ভুনা করা হয়। মহিলারা পর্দানিশীন জীবন-যাপন করে। আযান হওয়া মাত্রই লোকজন মসজিদ ভরে যায়। মনে হয় যেন লোকজন ঈদের নামায আদায় করার জন্য বের হয়ে আসছে। চারদিকের নীরবতা ও সুন্নতের পরিবেশ দেখে অনুভব হচ্ছিল কোন খানকায় বসে আছি। মাওলানা মুহাম্মদ রাসূলের ঘরে পৌঁছে চা পান করি এবং বলি আমাকে স্থানীয় মাশায়েখদের সম্পর্কে বলুন। মাওলানা মুহাম্মদ রাসূল বললেন সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়ার মাত্র একজন শায়খ আছেন।

তিনিও শয্যাশায়িত। অনেকদিন যাবত লোকদেরকে বায়আত করা থেকে অপারগ। আমি বললাম, চলুন তাকে দেখে আমি। তাঁর ঘরে পৌছলে তিনি আমার সাথে মুআলাকা করলেন আমি তার লতীফাসমূহে তাওয়াজ্জুহ দেই। সাথে সাথে তার মধ্যে জযবা সৃষ্টি হয়। মাওলানা মুহাম্মদ রাসূল এবং অন্যান্য সাথীরা পেরেশান হয়ে বললেন কী হল? আমি বললাম, আপনারা চুপ থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার হাতে চুমু দিলেন এবং বললেন, হযরত! আমি আপনার অবস্থা বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শুরুতেই আমার মুয়ামালা পরিষ্কার করে দিলেন। আমি আপনার শাগরিদ হতে চাই। আপনার সন্তান মনে করে আমাকে সুলূক শিক্ষা দিন।

উপস্থিত সবার জন্য এটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল। যখন লোকজন জানতে পারল যে, আমাদের শায়খ বায়আত হয়েছেন, তখন গ্রামবাসী অবস্থা লক্ষ্য করার মত ছিল। মাগরিবের নামাযের পর বয়ান হল। মাওলানা মুহাম্মদ রাসূল তরজমা করলেন। বয়ান শেষে উপস্থিত সবাই বায়আত হল। মাওলানা মুহাম্মদ রাসূল শায়খের বায়আত হওয়া ঘটনা শোনালেন। মসজিদ সংলগ্ন হলরুমে মহিলাদের বয়ান শোনার ব্যবস্থা ছিল। তারা চিরকুট লিখে পাঠাল যে, আমাদেরকে বায়আত করুন এবং আমাদেরকে অজীফা ও আমল কীভাবে করতে হবে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিন–

মা'মুলাত বলে দেওয়ার পর তাদেরকে মুরাকাবা করাই এবং মন ভরে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করি। আমার মন এত প্রশান্ত হয়ে গেল যে, মন চাচ্ছিল, তাদের অন্তরে নিসবতকে চালু করে দিয়ে যাই।

জীবনে খুবই কমই এই অবস্থা অনুভব হয়েছে। মাহফিল শেষে আমি সবাইকে অনুরোধ করলাম যে, শুধু মুসাফাহাই করুন। কিন্তু কিছু যুবক মুসাফাহ করল তারপর বৃদ্ধদের পালা আসল। তাঁরা আমার হাত ও কপালে চুমু দিতে দিতে ক্লান্ত করে ফেলে। বৃদ্ধ লোকেরা আমাকে জড়িয়ে এমন জোরে চাপ দিতে লাগল, মনে হচ্ছিল জোয়ান লোকেরা চাপ দিচ্ছে। জীবনে এই প্রথম অনুভব হল যে, পাজর আরও শক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ আল্লাহ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়িতে চলে আসি। আধা ঘণ্টা পর্যন্ত আমার গায়ে শক্তি ছিল না। মেজবান বারবার দস্তরখানায় খাবার আনার কথা বলছিলেন কিন্তু নিষেধ করছিলাম। ভাবলাম, অন্যান্য লোকদের হয়ত ক্ষুধা লেগেছে, আমার জন্য দেরী হচ্ছে। তাই মাওলানা আব্দুল্লাহ ও রাবেল তাজউদ্দিনের সহযোগিতা নিয়ে উঠে বসলাম এবং খাবার খেয়ে নিলাম। খাবার শেষে মাওলানা মুহাম্মাদ রসূল বললেন, ঘরের বড় কামরায় এলাকার যুবতীরা সমবেত হয়েছে। তারা আপনার বিশেষ বয়ান শুনতে আগ্রহী। আমি হিম্মত করে বয়ান শুরু করলাম, অতঃপর এক আজব অবস্থা বিরাজ করছিল।

মাওলানা মুহাম্মদে রাসূলের স্ত্রী বললেন, যুবতীরা এত ক্রন্দন করেছে যে, কান্নার কারণে তাদের ওড়না চোখের পানিতে ভিজে গিয়েছে। দাগিস্তানের ইতিহাসে এই রাত এক স্মরণীয় রাত হয়ে স্মৃতিপটে রয়ে গেছে।

ফেরত সফর

পরের দিন এগারোটার সময় বিমানযোগে তাশখন্দ ফিরে আসি। আব্বাস খান বললেন, শনিবারের টিকেট ক্রয় করা হয়েছে। আমি তিনদিনের অবসরকে গনীমত মনে করে তিন রোযার তারবিয়াত প্রোগ্রাম শুরু করি। আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইতেকাফের ন্যায় অতিবাহিত করি। পুরো দিন মাকতুবাত শরীফের তালীম হয়। রাতে তাহাজ্জুদের নামায গুরুত্বের সাথে আদায় করা হয়। আমি বেশি বেশি ইস্তেগফার করি। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কোন আমল কবুল হওয়ার জন্য আমল শেষে বেশি বেশি ইস্তেগফার করা জরুরী।

হয়ত এ কারণেই প্রত্যেক ফরজ নামাযের সালাম ফিরানোর পর একবার উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলা এবং তিনবার ইস্তেগফার করা সুন্নত। রাসূল সা.-কে ইরশাদ করেন–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ

(অতএব, আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা করুন এবং ইস্তেগফার করুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।)

কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আম্বিয়া কেরামের আলোচনা এই ধরনের শব্দাবলী দিয়ে করেছেন–

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ـ

"তারা রাতে অল্প ঘুমায় এবং সেহরীর সময় ইস্তেগফার করে।"

শনিবার দিন আটটার সময় তাবলীগ অফিসে পৌছি। ডাঃ মানছুর দুটি গাড়ি নিয়ে আসেন। এয়ারপোর্ট পৌছে দেখি স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য এসেছেন।

এয়ারপোর্টের কর্মচারীরা উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, কাযাকিস্তান, মস্কো এবং ইউক্রেন ইত্যাদি রাষ্ট্রের লোকজনকে আমার সাথে দেখে হয়রান হয়ে যায়। আমি দু'আ করি। দু'আর মধ্যে কর্মচারীদের অনেকেই শরীক হয়। এক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের এসব লোক আপনার সাথে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন? আমি বললাম, ইসলাম ধর্মের মধ্যে এত আকর্ষণ রয়েছে যে, মানুষের অন্তরগুলোকে বেঁধে দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا ـ

(নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে বন্ধু বানিয়ে দেন।)

যখনই মাল-সামান বুক করিয়ে লাউঞ্জের দিকে যাচ্ছি। তখন সাথীরা অশ্রুসিক্ত নয়ন ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাকে বিদায় জানাল। আমার সম্বলহীনতা ও আমলহীনতার উপর ভয় হচ্ছিল যে, ডাক বাহকের যে দায়িত্ব ছিল তা আমি সঠিকভাবে আদায় করতে পারিনি।

ঘরে ফিরে এসেছি

পি.আইএ বিমান তাশখন্দ থেকে করাচী পৌঁছলে জামাআতের সাথীরা এয়ারপোর্টে মিলিত হওয়ার জন্য তাশরীফ এনেছিলেন। করাচী অবস্থান করার পর আমি আমার বাড়িতে পৌঁছি। শান্ত-শিষ্ট হয়ে যখন বসি তখন নিজের সফরের পুরো অবস্থা চিন্তা করি। তখন অনুভব হচ্ছিল যে, যেমন কোন বাদশাহর দরবারে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলে, বাঁদীকে ঝাঁড়ু দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঝাড়ু দেওয়ার সময় এই বাঁদী বাদশাহর তখতের উপরেও উঠে। খাস খাস চেয়ারে হাত লাগায়। প্রত্যেকটি বস্তুকে কাছ থেকে দেখতে পারে, কিন্তু ঝাঁড়ু দেওয়ার পর তার স্থান সেই সাধারণ কামরার মধ্যেই হয়ে থাকে। বাঁদীর উচিৎ তার সময়গুলোকে কখনও যেন না ভুলে। অনুরূপভাবে আমার মধ্য এশিয়া সফর করার নির্দেশ হয়। এই সফরে মাশায়েখদের মাজারসমূহ দেখেছি। আল্লাহ তাআলার রহমতসমূহ খুব কাছে থেকে অবলোকন করেছি। কিন্তু ফিরে এসে আমাকে পূর্বের মতই পেয়েছি। আমারও উচিত যেন আমি আমার সময়সমূহ কখনও না ভুলি, আল্লাহ তাআলা আমার এই সফরকে কবুল করুন। আমীন।

হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী-এর বহুমুখী খেদমত

শিক্ষা

১। মেট্রিক, ফার্স্ট ক্লাশ ১৯৬৭ ইং; ২। বিএসসি পাঞ্জাব, প্রথম বিভাগ ১৯৭১ইং

৩। রুল অব অনারের সম্মান লাভ ১৯৭১ইং; ৪। বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্স্ট ডিভিশন ১৯৭৬ইং; ৫। কম্পিউটার প্রজেক্ট-এ বিশেষ সম্মান ৪০০/৪০০; ৬। ম্যানেজমেন্ট কোর্স ১৯৭৬ ইং; ৭। ম্যানেজমেন্ট কোর্স, এম.এপি ১৯৯০ ইং; ৮। স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স, (LUMS) ১৯৯০ ইং; ৯। শর্টকোর্স ইন লাইব্রেরী সায়েন্স, (LUMS) ১৯৯০ ইং; ১০। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স সুইডেন, ১৯৯০ ইং; ১১। হিউম্যান রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট কোর্স (LUMS) ১৯৯১ ইং

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা

১। ইশকে ইলাহী; ২। ইশকে রাসূল সা.; ৩। হায়াতে হাবীব; ৪। তাসাউফ ও সুলূক; ৫। বা আদব বা নসীব; ৬। মাকতুবাতে ফক্বীর; ৭। খুতুবাতে ফক্বীর; ৮। মউত কি তৈয়ারী; ৯। লাহোর সে তা খাকে বুখারা ওয়া সমরকন্দ; ১০। কেতনে বড়ে হ্যাঁ হাওছেলে পরওয়ারদেগারকে

নন একাডেমিক যোগ্যতা

১। ডায়লগ বেস্ট পারফরম্যান্স ১৯৬৩ ইং; ২। উন্নত স্কুল স্কাউট ১৯৬৫ ইং; ৩। জিমনাস্টিক পারফরম্যান্স ১৯৬৬ ইং; ৪। স্কুল ক্রিকেট টীমের অধিনায়ক ১৯৬৭ইং ৫। ফুটবল জেলা দলের অধিনায়ক ১৯৬৮ ইং; ৬। কলেজ সুইমিং টীম-এ চ্যাম্পিয়ন ১৯৭১ ইং

সামাজিক অবদান

১। অপারেন্টস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৭৬ ইং

২। পাকিস্তান সোসাইটি অব শোগার টেকনোলোজিস্ট-এর মেম্বার ১৯৭৭ ইং

৩। এসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৭৮ ইং

৪। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৭৯ ইং

৫। মেম্বার, পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কাউন্সিল ১৯৭৯ ইং

৬। চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ১৯৮২ ইং

৭। গোল্ড মেডেল (PSTT) (সমৃদ্ধ প্রবন্ধের জন্য) ১৯৮৪ ইং
৮। সিনিয়র মেম্বার অব ইনস্ট্রুম্যান্ট সোসাইটি আমেরিকা, ১৯৮৪ ইং
৯। জেনারেল ম্যানেজার প্ল্যানিং ১৯৯১ ইং
১০। এশিয়াভিত্তিক কেমিক্যাল ইনস্ট্রুম্যান্ট কনফারেন্স সিঙ্গাপুর-এ অংশগ্রহণ ১৯৯১ ইং

ধর্মীয় তৎপরতা

১। হিফজুল কুরআন
২। দীনী শিক্ষাগ্রহণ ও পাঠদান ১৯৬২-১৯৮২ ইং
৩। দাওরায়ে হাদীস, (সম্মানপূর্বক সনদ) জামিআ রাহমানিয়া জাহানামান্দি
৪। দাওরায়ে হাদীস (ইজাজী সনদ) জামেয়া কাসেমূল উলূম মুলতান
৫। সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়ায় বায়আত গ্রহণ ১৯৭১ ইং
৬। হযরত মুর্শিদে আলম খাজা গোলাম হাবীব থেকে খেলাফত লাভ ১৯৮৩ ইং
৭। দারুল উলূম জঙ্গ-এর মুহতামিম ১৯৮৪ইং
৮। ওয়াশিংটন সিমার স্কুলে পাঠদান ১৯৮৬ ইং
৯। জামিয়া আয়েশা মহিলা মাদরাসার পরিচালক ১৯৮৯ ইং
১০। গালফ ক্লাবে লেকচার ১৯৮৯ ইং
১১। ইসলাম বিষয়ে সুইডেনে বিভিন্ন লেকচার ১৯৯০ ইং
১২। রোটারী ক্লাবে লেকচার ১৯৯০ ইং
১৩। বিভিন্ন মাদরাসা, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার
১৪। জামিআতুল হাবীব ফয়সালাবাদ-এর পরিচালক
১৫। জামিয়াতুস সালিহা ফয়সালাবাদ-এর প্রধান
১৬। মাদরাসা তা'লীমুল ইসলাম ফয়সালাবাদ-এর প্রধান
১৭। মাহাদুল ফক্বীহ ইকবাল টাউন-এর পরিচালক
১৮। জামি'আ যয়নব ইসলামাবাদ-এর প্রধান
১৯। জামিআতুস সালিহাত রাওয়ালপিন্ডি-এর পরিচালক
২০। জামিআ ইহয়াউল উলূম করাচী-এর পরিচালক

দাওয়াতী সফর

সৌদী আরব, মিসর, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আমেরিকা (২২ প্রদেশ), রাশিয়া (৯ প্রদেশ), আফগানিস্তান, হাঙ্গেরী, ব্রিটেন, জার্মান ও নরওয়ে।

ঐতিহাসিক বুখারা নগরী

মাদরাসা উলগবেগের সামনের দৃশ্য

মাদরাসা তেল্লাকারীর সামনের দৃশ্য

C M Y K

মাদরাসা মীর আরব এর সামনের দৃশ্য

ইমাম বুখারী র. এর মসজিদের মিনার ও বারান্দা
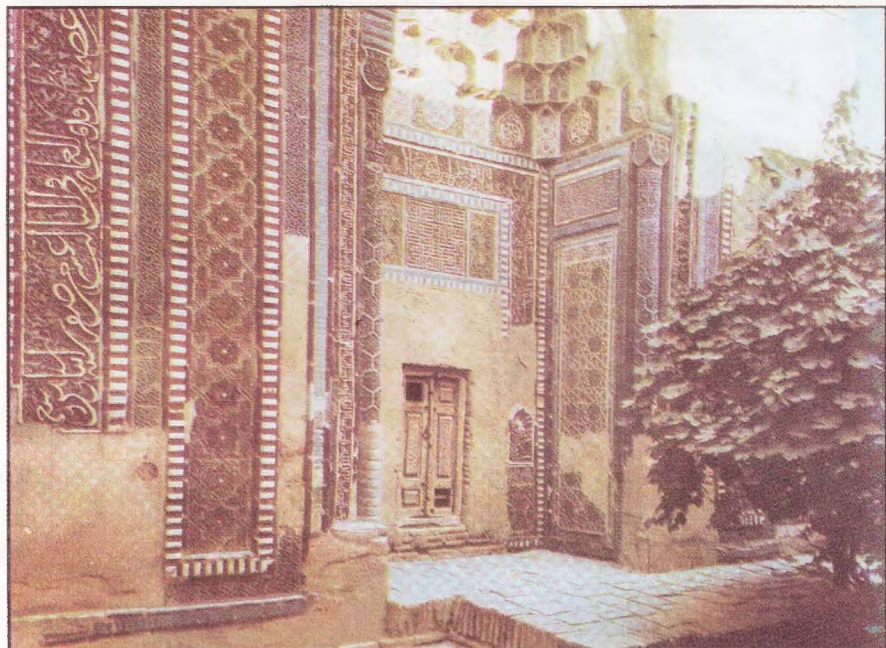
হযরত শাহ যিন্দাহ র.এর কবর

হযরত কাসম বিন আব্বাস রা. এর কবর

রেগিস্তান এর মাদরাসা

কায়ফ শহর (ইউক্রেন)

আল ইরফান পাবলিকেশন্স
১২/ধ, বাড়ী নং-৮৯, মিরপুর, ঢাকা।